দ্বিতীয় সংস্করণের আরজ

‘রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িকতা’ গ্রন্থটির বর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হলো। এতে চারটি নতুন প্রবন্ধ যোগ করা হয়েছে এবং পূর্বতন প্রবন্ধগুলোকে সংস্কারপূর্বক নতুন তথ্য-উপাত্ত সংযোজন করে পুরনো বক্তব্যের সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

আমাদের পর্যালোচনায় যেটি প্রাধান্য পেয়েছে তা হলো রবীন্দ্র রাজনীতি আর রবীন্দ্র সাহিত্য এক জিনিস নয়। শিল্পী রবীন্দ্রনাথ অসম্ভব শক্তিশালী কিন্তু তার রাজনীতি চিন্তা অখণ্ড ভারতীয় জাতীয়তাবাদ কিংবা ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদের সাথে গভীরভাবে যুক্ত; যা এ উপমহাদেশে অপরাপর জাতিগোষ্ঠীর আত্মনিয়ন্ত্রণ কখনো স্বীকার করে নি। সেদিক দিয়ে রবীন্দ্র চিন্তাপ্রবাহ জাতিরাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের জন্য আরো বিশেষ করে বললে বাঙালি মুসলমানের জন্য বিপজ্জনকই বটে। এদেশে যারা রাজনীতি ও সংস্কৃতিতে রবীন্দ্র চিন্তাকে আত্মস্থ করে ফেলেছেন তারা প্রকারান্তরে ঐ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের স্বার্থ রক্ষা করে চলেছেন। রবীন্দ্রনাথের নান্দনিক কবিতাগুচ্ছ কিংবা গানের আড়ালে তার এই রূপ প্রায়শই ঢাকা পড়ে থাকে বলে সবার পক্ষে রবীন্দ্র চিন্তার এ বিপজ্জনক বা সাম্প্রদায়িক দিকটি বোঝা কঠিন হয়ে পড়ে।

বর্তমান গ্রন্থের প্রবন্ধগুলো বিভিন্ন সময়ে লেখা। তাই এর মধ্যে ধারাবাহিকতা সবসময় পাওয়া না-ও যেতে পারে এবং হয়তো কিছু পুনরুক্তি আছে। তবু কিছু খবর রইল যা বাঙলাভাষী পাঠকদের কাজে লাগতে পারে।

ফাহমিদ-উর-রহমান
২৫ বৈশাখ ১৪২৪

আরজ

বাংলাদেশকে বুঝতে হলে রবীন্দ্র পর্যালোচনা দরকার। কারণ গত এক শতাব্দী ধরে যে রাজনৈতিক ইতিহাসের বিবর্তন ঘটেছে আমাদের দেশে, তার গতি-প্রকৃতির সাথে রবীন্দ্রনাথ কোনো না কোনো ভাবে জড়িয়ে আছেন। জাতিরাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের উদ্ভব ও বিকাশকে ভালো করে বুঝতে হলে রবীন্দ্র চিন্তার নির্মোহ মূল্যায়ন প্রয়োজন। কিন্তু বাংলাদেশের রাজনৈতিক- সাংস্কৃতিক আবহাওয়ায় এই মূল্যায়ন প্রায় দুরূহ হয়ে উঠেছে। কারণ প্রতিভাধর রবীন্দ্রনাথের শিল্পী সত্ত্বার মূল্যায়নের চেয়ে রাজনীতির প্রয়োজনে এদেশে তাকে নিয়ে তৈরি করা হয়েছে এক বিস্ময়, অভিভূতি ও অন্ধভক্তির ভাবাবেগ। তিনি কবির চেয়েও হয়ে উঠেছেন ঋষি কিংবা দেবতা। রবীন্দ্রনাথ তার জীবদ্দশায় যেসব চিন্তাভাবনা করেছেন, সমাজ ও রাষ্ট্র সম্বন্ধে যেসব মতামত প্রকাশ করেছেন কিংবা আধুনিক কালে উপনিষদের ঋষিদের মতো তপোবন ফিরিয়ে আনবার কথা ভেবেছেন তার অনেক কিছুর সাথেই একমত হওয়া সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ বাঙালিদের জন্য কোনো রাষ্ট্র চান নি। তিনি ছিলেন সর্বান্তকরণে সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদী। তারপরও তাকে নিয়ে এদেশের প্রগতিশীল সেকুলার বলে পরিচিত একটি বিশেষ শ্রেণি, যাদেরকে বাঙালি জাতীয়তাবাদী বলে শ্রেণিবদ্ধ করা যায়, তাদের এই আতিশয্য কেন? শুধু কি এই কারণে যে পাকিস্তান আমলে রবীন্দ্র বিরোধিতা করা হয়েছিল এবং সরকারি মিডিয়ায় রবীন্দ্র সংগীত নিষিদ্ধের চেষ্টা হয়েছিল। ব্যাপারটা তা নয় অবশ্যই। আসল কারণ হচ্ছে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আকাঙ্ক্ষার সাথে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আকাঙ্ক্ষার ভিতর কোনো মৌলিক তফাৎ নেই। এই কারণেই ভারতীয় জাতীয়তাবাদী রবীন্দ্রনাথ বাঙালি জাতীয়তাবাদের আইডল হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন। কিন্তু জাতিরাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের জন্য রবীন্দ্রনাথের এই বিশেষ রূপটি কতটুকু স্বাতন্ত্র্য নির্দেশক তা নিয়ে ভাবুক জনদের অবশ্যই ভাবতে হবে। শিল্পী রবীন্দ্রনাথ অসামান্য, কিন্তু তার রাজনীতি ও রাষ্ট্রচিন্তা প্রভৃত বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। কতকক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার বিষফলও রোপণ করেছে। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ বাঙালি মুসলমানের কাছে পুরোপুরি গৃহীত হন নি। যারা রাজনৈতিক বিশ্বাসের দিক দিয়ে মুসলিম জাতীয়তাবাদ ত্যাগ করে বাঙালি জাতীয়তাবাদকে গ্রহণ করেছেন এবং সেই রাজনীতির স্বার্থেই যারা ভারতের সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক আধিপত্যকে কবুল করে নিয়েছেন, মূলত তাদের কাছেই আজকাল রবীন্দ্রনাথ প্রবলভাবে গৃহীত। এরা রবীন্দ্রনাথকে তাদের রাজনীতির পক্ষে একটি শিল্পের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন।

এই বইটি রবীন্দ্র বিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধের সংকলন। বিভিন্ন সময়, বিভিন্ন উপলক্ষে এ লেখাগুলো লিখেছি। মূলত এখানে রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্র ও সমাজ চিন্তাকে বাংলাদেশের ইতিহাসের সাথে মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে এবং বাংলাদেশের জাতিসত্তা বিষয়ক ভাবনাগুলোর সাথে রবীন্দ্র চিন্তার একটা তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। শিল্পী রবীন্দ্রনাথ এ আলোচনার বিষয়বস্তু নন।

বইটি প্রকাশের ব্যাপারে অধ্যাপক আবদুস সামাদ, ড. নূরুল ইসলাম মঞ্জুর, মো. হাবিবুর রহমানসহ আরো যারা আমাকে অশেষ উৎসাহ দিয়েছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। আমার সহধর্মিণী ডাঃ মীরা মমতাজ সাবেকা ও পুত্র যাইয়ান মাসুদও বইটির ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ দেখিয়েছে- এদেরকে ধন্যবাদ। সবশেষে বইটি প্রকাশনার ক্ষেত্রে বুকমাস্টারের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই।

ফাহমিদ-উর-রহমান
জুলাই ২০১৫

শুনুন, রবীন্দ্রনাথ আপনার সমস্ত কবিতা
আমি যদি পুঁতে রেখে দিন রাত পানি ঢালতে থাকি
নিশ্চিত বিশ্বাস এই, একটিও উদ্ভিদ হবে না
আপনার বাংলাদেশ এরকম নিষ্ফলা, ঠাকুর।

-আল মাহমুদ

সূচীপত্র

রবীন্দ্রনাথ, বাংলাদেশ, সাম্প্রদায়িকতা ৬

রবীন্দ্রনাথ, বঙ্গভঙ্গ ও হিন্দু জাতীয়তাবাদ ৪২

রবীন্দ্র বিতর্ক ৫৩

সেকুলারিজম, রবীন্দ্রনাথ ও রাখাল ছেলের দল.....৬১

রবীন্দ্রনাথের মার্কসবাদী ভক্তরা..... ৬৮

তপোবন বিশ্ববিদ্যালয়..... ৭৭

রবীন্দ্রনাথের ধর্ম..... ৯০

রবীন্দ্রনাথ ও মুসলমান সমাজ ৯৭

রবীন্দ্রনাথ : পুনর্বিবেচনা ১০৪

রবীন্দ্রনাথ ও বাঙালি সংস্কৃতি.....১১১

রবীন্দ্র রাজনীতি..... ১২৬

রবীন্দ্রনাথ, বাংলাদেশ, সাম্প্রদায়িকতা

এক

১৯৬০-এর দশক থেকে আমাদের এই বাংলাদেশে কবি রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এক ধরনের প্রমত্ত উচ্ছ্বাস তৈরি হয়েছে। এর কারণ যত না সাংস্কৃতিক, তার চেয়ে অনেক বেশি রাজনৈতিক। সংস্কৃতি ও সংস্কৃতি চর্চার পিছনে এক ধরনের রাজনীতি কাজ করে এবং সংস্কৃতি ঐ নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শকে অভিষ্ট মনজিলে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। এডওয়ার্ড সাঈদ আমাদের দেখিয়েছেন সাংস্কৃতিক কায়কারবার কীভাবে সাম্রাজ্যবাদ ও আধিপত্যবাদের বুদ্ধিবৃত্তিক হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে এবং সাম্রাজ্যবাদী লক্ষ্য অর্জনের নৈতিক বৈধতা দিয়ে থাকে।[১]

১৯৬০-এর দশক থেকে এ দেশের জনমানসের একাংশের মধ্যে বাঙালি জাতীয়তাবাদের রাজনৈতিক দর্শন দানা বাঁধতে থাকে। তখনকার পরিস্থিতিতে এই রাজনৈতিক বিশ্বাসের সহযোগী হিসেবে রবীন্দ্রনাথের ইমেজকে বিশেষভাবে উচ্চকিত করার প্রতিযোগিতা শুরু হয়। সেই প্রতিযোগিতার প্রবল হুলস্থুলের মধ্যে রীতিমতো একটি রবীন্দ্রকাল্ট গড়ে তোলা হয়েছে বা এক ধরনের রাবীন্দ্রিক মনোগঠনের চেষ্টা চলছে।

রবীন্দ্রনাথ একজন খুবই শক্তিশালী কবি এবং তার সৃষ্টিশীলতার বিস্তার নিয়েও কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তারপরও শেষপর্যন্ত তিনি একজন মানুষ। যত বিস্ময়কর তিনি হন না কেন, তিনি অলৌকিক নন মোটেই। তবুও আমাদের রবীন্দ্রকাল্টের মহিমা এমনই যে রবীন্দ্র বন্দনাকারীরা তার সংগীত শ্রবণকে রীতিমতো ইবাদতের সাথে তুলনা করেছেন[২] অথবা এমনও কালাপাহাড়ী দাবী শুরু করেছেন যে তাকে প্রতিদিনের জীবনযাপনের সঙ্গী বানাতে পারলেই নাকি আমাদের মুক্তি।[৩] আমাদের দেশের এই শ্রেণির রবীন্দ্র মূল্যায়ন অন্ধভক্তির ভাবাবেগ দ্বারা চালিত। ভক্তির আতিশয্যে তারা রবীন্দ্রনাথকে রীতিমতো দেবতার কাছাকাছি নিয়ে গেছেন এবং সেই 'দেবতার' কেউ নির্মোহ মূল্যায়ন করতে গেলে অতিভক্তদের আক্রমণে তাকে হতে হয় জর্জরিত।

---

১. Edward W Said, Orientalism, New York: Pantheon Books, 1978

২. "রবীন্দ্র সঙ্গীত আমার কাছে উপাসনার মতো।" তিনি আরো বলেছেন, রবীন্দ্রনাথকে কোনো ভৌগলিক সীমারেখায় আবদ্ধ করা যাবে না। তিনি মহীরূহ। আমরা তার আশ্রয়ে আছি, আমাদের সব কবির প্রেরণা তিনি। সুফিয়া কামাল আরো বলেছেন, বর্তমানের গ্লানিকর অবস্থা থেকে রবীন্দ্রনাথের সুরই আমাদের মুক্তি দিতে পারে। ১৯৯১ সালে ৩ দিন ব্যাপী জাতীয় রবীন্দ্র সঙ্গীত সম্মেলনে কবি সুফিয়া কামালের ভাষণ। দৈনিক সংবাদ, ঢাকা, ২৭ এপ্রিল, ১৯৯১

৩. হায়াৎ মামুদ, দিন যাপনের ভূগোলে রবীন্দ্রনাথ। ঢাকা: অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ১৯৯৮

মানুষ যতই অসাধারণ হোক, শেষ পর্যন্ত সে সীমাবদ্ধও। রবীন্দ্রনাথ তার সময় ও পরিবেশের সন্তানও বটে। সময়ের সীমাবদ্ধতাকে উপেক্ষা করা তার পক্ষেও সম্ভব হয় নি। রবীন্দ্রনাথের সবকিছুকে গ্রহণ করতে হবে, মডেল বানাতে হবে এটা কাম্য নয় মোটেই। এটা রীতিমতো ফ্যাসিবাদী মনোভাবের পরিচায়ক। তার চিন্তা ও মত সম্পর্কে দ্বিমত থাকতেই পারে। তিনি অত্যন্ত শক্তিশালী কবি। কিন্তু তার সব কবিতাই একই রকম আবেদন সৃষ্টি করে না বা কালোত্তীর্ণ নয়। তিনি গীতিকার ও সুরকার। কিন্তু তার সব গানই একই রকমভাবে কানের ভিতরে যেয়ে মরমে পশে না। তিনি যত বড় কবি, গীতিকার ও কথাশিল্পী, চিন্তানায়ক হিসেবে তিনি তত উঁচুমাপের নন। তাছাড়া তার চিন্তাভাবনার মধ্যে প্রচুর অসংগতি ও স্ববিরোধিতা বিদ্যমান।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় তিনি কিছুদিন ইংরেজ বিরোধী রাজনীতি করেছেন। সেই তিনিই কিছুদিন পর এই রাজনীতির ত্রুটিবিচ্যুতি সন্ধানে গলদঘর্ম হন এবং ইংরেজের স্তব-স্তুতিতে বিভোর হন। তিনি একদিকে ধর্ম কারার প্রাচীরে আঘাত হানার কথা বলেছেন এবং লিখেছেন: 'ধর্মের বেশে মোহ যারে এসে ধরে/ অন্ধ সে জন মারে আর শুধু মরে।' আবার সেই তিনিই প্রাচীন ভারতীয় ঔপনিষদিক ঋষিদের মতো তপোবনের স্বপ্ন ফেরি করেছেন। রবীন্দ্র জীবনের এ এক বিচিত্র প্রহেলিকা ছাড়া আর কি!

শিল্পী রবীন্দ্রনাথের পাশে তিনি একই সাথে রক্তে-মাংসে গড়া ও পঞ্চেন্দ্রিয় চালিত মানুষও বটে। তিনি বিচরণ করেছেন মোহের স্বর্গে। তিনি দান করতেন না। স্বার্থবুদ্ধি সম্পন্ন বৈষয়িক ছিলেন। তিনি একই সাথে প্রজাপীড়ক জমিদার ও জমিদারী উচ্ছেদের ঘোর বিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তাহলে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কী এসব প্রশ্ন তোলা যাবে না, প্রত্যাখ্যান করা যাবে না তার কোনো মত ও সিদ্ধান্তকে। আলবৎ যাবে। তিনি কোনো প্রেরিত পুরষ ছিলেন না। তার গ্রন্থরাশি কোনো ঐশী গ্রন্থ নয়। ওপার বাংলার একজন লেখক লিখেছেন:

> রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সব রকম 'দোষ'-এর উর্ধ্বে, তিনি ধরণীর অন্যান্য কবিদের মতো কোনওভাবে, কোনও দিক থেকেই 'পাপবিদ্ধ' নন- এ কথা বাঙালির মজ্জা মেনে নিয়েছে। কোথাও কোনও প্রশ্ন নেই, নেই সংশয়ের ঠোক্কর, চোরা খটকা। পরদা ফেলে দিয়েছি অন্বেষার উপর।[৪]

রবীন্দ্রনাথের ভক্ত, পূজারী ও রাজনৈতিক স্বার্থবুদ্ধি চালিত ব্যক্তিরা এসব কথা ভাবতেই পারেন না। তাই মানুষ ও বাস্তব রবীন্দ্রনাথ, রক্তে-মাংসে গড়া রবীন্দ্রনাথ ও কবি রবীন্দ্রনাথ এদের দৃষ্টিতে অভিন্ন হয়ে ওঠেন- হয়ে ওঠেন অতিমানব। এই অতি ভক্তি ও রাজনৈতিক মতলববাজির আয়নায় রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত স্বরূপ বোঝা এক অসম্ভব কাজ।

---

৪. রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, নতুন বউঠান। কলকাতা: দীপ প্রকাশন, ২০১১

আমাদের দেশের এক শ্রেণির বামপন্থী বুদ্ধিজীবী আছেন যারা মূলত বুর্জোয়া প্রতিরোধী শ্রেণি সংগ্রামের কথা বললেও রবীন্দ্রনাথের ব্যাপারে অন্ধ। এরা রবীন্দ্রচর্চা করেন মূলত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যচালিত হয়ে। এখানে বুর্জোয়া, কম্প্রাডর (মুৎসুদ্দি) বুদ্ধিজীবী রবীন্দ্রনাথের শ্রেণি চরিত্র নিয়ে তাদের মনে কোনো সংশয় তৈরি হয় না।

আরেক জাতের বুদ্ধিজীবী আছেন আমাদের দেশে যারা মনে-মননে, চিন্তায় ও গঠনে নিজেদেরকে খুবই আধুনিক ও সেকুলার দাবি করেন। তারাও রবীন্দ্রনাথের ব্যাপারে যুক্তিচালিত না হয়ে অন্ধভক্তির আতিশয্য দেখান। রবীন্দ্রনাথ যখন 'নাথ' বা 'প্রভু' বলে কোনো অদৃশ্য পরম কিংবা চূড়ান্তকে সম্বোধন করেন, উপনিষদের নানা শ্লোকে মানুষের মুক্তির প্রশ্রয় খোঁজেন, বা 'এবার ফিরাও মোরে' বলে ফিরে চলে যেতে চান তার জীবনদেবতার কাছে তখন ইউরোপীয় আলোকায়ন বা আধুনিকতার কোন সূত্র দিয়ে এসবের চরিত্র বিচার করা চলে? তখন আমাদের দেশের এসব বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতিসেবীদের বোধ ও মননের স্তরকে নিতান্তই কাঁচা ও অপরিণত বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক।

রবীন্দ্রনাথের নামকে বাঙালিদের একাংশ সহজভাবে উচ্চারণ করতে পারেন না। তাকে বলা হয় বিশ্বকবি, গুরুদেব, কখনো কবিগুরু। কেউ কেউ তো তাকে শ্রদ্ধায়-ভক্তিতে ঋষি করে তোলেন। স্বার্থবুদ্ধি সম্পন্ন রাজনীতির প্রচার মাহাত্ম্যে তিনি যা ছিলেন না, সেই গৌরবও এখন তাকে সহজে অবলীলায় দিয়ে দেয়া হচ্ছে। এ আলোচনার উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ আদতে যা ছিলেন সেই আদি অকৃত্রিম রবীন্দ্রনাথকে ফিরে পাওয়া।

রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় বাঙালি মুসলমানের কাছে তিনি তেমন একটা গৃহীত হন নি। কাজী আবদুল ওদুদ কিংবা রেজাউল করিমের মতো কংগ্রেসী বুদ্ধিজীবীরা তার পক্ষে প্রচার-প্রপাগান্ডা চালালেও তা তেমন একটা হালে পানি পায় নি। এর কারণ হচ্ছে তখনকার বাঙালি মুসলমানের রাজনৈতিক- সাংস্কৃতিক চেতনার সাথে রবীন্দ্রচেতনার একটা দূরত্ব ছিল। আর রবীন্দ্রনাথও বৃহত্তর বাঙলাভাষী মুসলমানদের সাথে কোনো রকমের আত্মিক সংযোগ গড়ে তুলতে চান নি। এর প্রমাণ হচ্ছে তার বিপুল কলেবর সৃষ্টির মধ্যে বাঙালি মুসলমানের প্রতিনিধিত্ব একেবারে নেই বললেই চলে। রবীন্দ্রনাথের বরাত খুলে যায় এদেশে বাঙালি জাতীয়তাবাদী রাজনীতির বাড়-বাড়ন্তের ফলে। রবীন্দ্রনাথ যদি আজ অবধি বেঁচে থাকতেন তবে তিনি নিজে যা ভাবেন নি তা দেখে যারপরনাই বিস্মিত হতেন বৈকি। এদেশের বাঙালি জাতীয়তাবাদী রাজনীতির কালপুরুষরা তাকে তাদের সাংস্কৃতিক পূরোহিত হিসেবে মাথায় তুলে নিয়েছেন।

আমাদের এখানে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আচমকা এই প্রমত্ত উচ্ছ্বাস দেখে ওপার বাংলায় রীতিমতো কৌতুহল সৃষ্টি হয়েছিল বৈকি। বাংলাদেশের জন্মের পর নয়াদিল্লি থেকে রেবতী

ঘোষ রবীন্দ্রনাথের প্রিয় শিষ্যা শ্রীমতি মৈত্রেয়ী দেবীর নিকট একটি চিঠি লিখেছিলেন। এটি কলকাতার নবজাতক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। চিঠির কয়েক ছত্র এরকম:

> আপনার গুরুদেব যে এত বড় ঋষি উত্তরকালের ইতিহাসে কে তা জানতো? আমাদের মাতৃভাষায় কি জাদু তিনি সঞ্চারিত করে গেছেন যার শক্তিতে একটা জাতি উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠল জীবন বাজি রেখে। অমন যে ইসলামী তমদ্দুনের ভ্রুকুটি তাও তুচ্ছ হয়ে গেল। আমরা কলকাত্তিয়া সাহিত্যিকেরা তাঁকে হয় ভুলতে চেষ্টা করেছি না হয় শিকেয় তুলতে তৎপর হয়েছিলাম। নেথান সঙ্গীত (তাও স্বরলিপি সর্বস্ব তোতা বুলির মত) ধারা দিয়েই রবীন্দ্র চিন্তা প্রবাহিত হচ্ছিল। কিন্তু ওরা কাব্য-সঙ্গীত দর্শন সব মিলিয়ে গোটা রবীন্দ্রনাথকেই মনে হয় আত্মসাৎ করে নিল।[৫]

রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিরাশি বাঙলা ভাষায় রচিত হলেও তিনি ঠিক বাঙালি জাতীয়তাবাদী রাজনীতির ভাবনায় কখনো উজ্জীবিত হন নি। তিনি বাঙলাভাষীদের নিয়ে কখনো পৃথক রাষ্ট্র তৈরির কথা ঘূণাক্ষরেও চিন্তা করেন নি। তিনি বরাবর অখণ্ড ভারতীয় জাতীয়তাবাদের আয়নায় বাংলাকে অবলোকন করার চেষ্টা করেছেন। ঔপনিষদিক বিশ্বাসের কারণেই তার রাষ্ট্রভাবনা বাংলা ছাপিয়ে ভারতবর্ষকে আশ্রয় করে স্বস্তি পেয়েছে। বাংলার বাইরে ভারতীয় ইতিহাস তার দূরের কিছু মনে হয় নি। এই কারণেই তিনি ২৮ জানুয়ারি ১৯১৮-তে মহাত্মা গান্ধীকে হিন্দি ভাষার ভবিষ্যত সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তরে লেখেন:

> Hindi is the only possible national language for inter- provincial intercourse in India. But about its introduction at the Congress, I think, we can not enforce it for long time to come... Hindi will have to remain optional in our national proceedings until a new generation of politicians, fully alive to its importance, pave the way toward its general issue by constant practice as a voluntary acceptance of a national obligation.[৬]

রবীন্দ্রনাথ এখন আমাদের দেশের একটি বিশেষ শ্রেণির মধ্যে প্রবল ও প্রমত্তভাবে গৃহীত। তার সম্পর্কে আমজনতার প্রতিক্রিয়া যাই হোক না কেন তিনি আবার একটু বেশি গৃহীত হয়েছেন আমাদের রাষ্ট্র ও সমাজে প্রাধান্য বিস্তারকারী একটি শ্রেণির মধ্যে। এরা সামাজিক-রাষ্ট্রিকভাবে খুবই শক্তিশালী। এরা একই সাথে বাঙালি জাতীয়তাবাদী ও অখণ্ড ভারতীয় রাজনীতির পক্ষের লোকজনের দ্বারা প্রশ্রয়পুষ্ট। রবীন্দ্রনাথ অখণ্ড ভারতীয় জাতীয়তাবাদী হওয়া সত্ত্বেও কেন তিনি

---

৫. নবজাতক, কলকাতা: স্বাধীন বাংলাদেশ সংখ্যা, অষ্টম বর্ষ, তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা, বাংলা ১৩৭৮

৬. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র জীবনী ও রবীন্দ্র সাহিত্য প্রবেশক। তৃতীয় খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ, কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, বাংলা ১৪২০, পৃ: ১৫১-৫২

এ দেশের বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের সাংস্কৃতিক পূরোহিত হওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন তার বিচার জরুরি।

এ দেশের বাঙালি জাতীয়তাবাদ মাথা তুলে মূলত পাকিস্তান আমলের মুসলিম জাতীয়তাবাদকে চ্যালেঞ্জ করে। এই মুসলিম জাতীয়তাবাদ হচ্ছে ভারতবর্ষের শত শত বছরের মুসলিম ইতিহাস, সমাজ, সংস্কৃতির সম্মিলিত আকাঙ্ক্ষার যৌথ প্রকাশ এবং অখণ্ড ভারতে তাবৎ ভারতীয় মুসলমানরা এর ভিতর দিয়ে তাদের আত্মপরিচয়কে সংহত করার চেষ্টা করেছিলেন। অখণ্ড ভারতে কংগ্রেসের অখণ্ড ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা মুসলমানদের ন্যায্য দাবি- দাওয়াগুলোকে সহানুভূতির সাথে বিচার করেন নি। যার ফলাফল দেশ ভাগ। এ দেশের বাঙালি জাতীয়তাবাদীরা মুসলিম জাতীয়তাবাদকে চ্যালেঞ্জ করতে যেয়ে সেই সব যুক্তিকে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন যা কিনা কংগ্রেস নেতারা এক সময় মুসলিম লিগের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতেন। এইভাবে এ দেশের বাঙালি জাতীয়তাবাদীরা তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক সম্পদ আহরণ করেন অখণ্ড ভারতপন্থীদের কাছ থেকে আর রাজনৈতিকভাবে তারা যেয়ে পড়েন ঐ বিশেষ শ্রেণির আশ্রয়ে। এ দেশের বাঙালি জাতীয়তাবাদ অখণ্ড ভারতীয় জাতীয়তাবাদের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্প্রসারণ মাত্র। বাঙালি জাতীয়তাবাদ কথাটা বলা হয় রাজনৈতিক কৌশলের কারণে। আসলে এর এখন বাস্তব ভিত্তি বলে কিছু নেই। ভারতীয় আধিপত্যবাদীরা এ দেশে এই রাজনীতিকে টিকিয়ে রাখতে চায় কারণ এটি তাদের সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষা করে। এই রাজনীতির প্রতিপক্ষ এ দেশের ইসলামপ্রধান জনগোষ্ঠী ও তাদের ভিতরকার প্রবহমান মুসলিম জাতীয়তাবাদ। ভারতের কৌশল হচ্ছে শিল্পী রবীন্দ্রনাথের নান্দনিকতাকে সামনে রেখে এ দেশের মুসলিম জাতীয়তাবাদী মানসগঠনকে পরিবর্তন করে তাদের পক্ষে নিয়ে আসা। ভারতীয় সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের কৌশল হিসেবেই রবীন্দ্রনাথকে এখানে খাড়া করা হয়েছে এবং রবীন্দ্রনাথ হচ্ছেন এই রাজনীতির এক শক্তিশালী শিল্পের হাতিয়ার বিশেষ।

দুই

রবীন্দ্রনাথ সবচেয়ে বেশি বিতর্কিত হয়ে পড়েন বঙ্গভঙ্গের রাজনীতির ভিতর দিয়ে। বঙ্গভঙ্গের রাজনীতি নিয়ে এযাবৎকাল বিস্তর ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক, সমাজতাত্ত্বিক ও আর্থ-সামাজিক আলোচনা হয়েছে। এসব আলোচনায় আলোচকদের আদর্শিক দৃষ্টিকোণের প্রভাব পড়েছে অবশ্যই। তবে একটি জিনিস স্পষ্ট হয়েছে ১৯০৫ সালের বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তা কোনোভাবেই ধর্ম নির্বিশেষে সেকুলার আন্দোলন ছিল না। এ আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন প্রধানত কলকাতা কেন্দ্রিক হিন্দু বুদ্ধিজীবী, শিক্ষিত মধ্যশ্রেণি, বুর্জোয়া শ্রেণি ও জমিদারকুল। বঙ্গভঙ্গের ফলে এদের শ্রেণিস্বার্থ বিপন্ন হওয়ায় এ আন্দোলনের

ভিতর দিয়ে তারা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু যে কোনো আন্দোলনের জন্য একটি আদর্শিক ছাতা (Ideological Umbrella) দরকার। এই কারণেই এটিকে তখন বাঙালির সাংস্কৃতিক ও ভাষিক ঐক্য রক্ষার আন্দোলন বলে চালানো হয়েছিল। প্রধানত হিন্দুদের আন্দোলন ছিল বলেই এর ভিতর দিয়ে প্রবল এক হিন্দুধর্মীয় ভাবাবেগ সেদিন তৈরি হয়েছিল। বাঙালি হিন্দুরা সেদিন হিন্দু ধর্ম থেকে প্রেরণা পেয়ে বিদেশি ইংরেজদের বিরুদ্ধে স্বদেশী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। স্বদেশী আন্দোলন ছিল মূলত হিন্দু জাতীয়তাবাদ ভিত্তিক সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন। এটি ছিল একই সাথে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও সাম্প্রদায়িক। ঐতিহাসিকরা আজ মোটামুটি একমত- এ আন্দোলনের পরিণতিতে ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতারই বাড়বাড়ন্ত হয়েছিল মাত্র। পশ্চিম বঙ্গের একজন বুদ্ধিজীবী নেপাল মজুমদার এ আন্দোলনের মূল্যায়ন করেছেন এভাবে:

- বাংলাদেশে স্বদেশী আন্দোলন মূলত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম হইলেও উহার নেতৃবর্গ তখনও ইউরোপের জড়বাদী দর্শন কিংবা গণতান্ত্রিক বিপ্লবের রাজনৈতিক দর্শন গ্রহণ করিতে পারে নাই। পক্ষান্তরে উহা প্রধানত হিন্দু জাতীয়তাবাদী আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া প্রায় সমগ্র দেশের শিক্ষিত সমাজে এক সুতীব্র স্বাদেশিকতা ও স্বাজাত্যাভিমানের প্লাবন আনিয়াছিল।[৭]

নেপাল মজুমদার ঠিকই বলেছেন, এই সাম্প্রদায়িক আন্দোলন হিন্দুদের মধ্যে এক ধরনের আলোড়ন তুলেছিল। কিন্তু সেদিন এই আন্দোলন বাঙালি মুসলমানদের অন্তরকে তেমন স্পর্শ করে নি। কারণ এতে তারা তাদের কোনো স্বার্থ ও সুবিধাই দেখতে পায় নি। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সাথে প্রথম দিকে রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত জমিদারী স্বার্থেই সর্বস্ব পণ করে নেমেছিলেন। বঙ্গভঙ্গ রদ করার জন্য তিনি মিছিল করেছিলেন, সমাবেশ করেছিলেন, গঙ্গাস্নান করে কলকাতায় হিন্দু বাঙালিদের হাতে রাখী পরিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, এই আন্দোলনের পক্ষে তিনি প্রচুর গান ও প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। সে সময় লেখা তার একটি প্রবন্ধের কিয়দংশ উদ্ধৃত করছি:

- কৃত্রিম বিচ্ছেদ যখন মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইবে তখনই আন্তরিক ঐক্য উদবেল হইয়া উঠিবে- তখনই আমরা যথার্থভাবে অনুভব করিব যে, বাংলার পূর্ব-পশ্চিমকে চিরকাল একই জাহ্নবী তাঁহার বহু বাহুপাশে বাঁধিয়াছেন, একই ব্রহ্মপুত্র তাহার প্রসারিত ক্রোড়ে ধারণ করিয়াছেন; এই পূর্বপশ্চিম, হৃদপিন্ডের দক্ষিণ বাম অংশের

[৭]. নেপাল মজুমদার, ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ, প্রথম খণ্ড। কলকাতা: দেজ পাবলিশিং, ১৯৯১, পৃষ্ঠা ৫৯৮

> ন্যায় একই সনাতন রক্তস্রোতে সমস্ত বঙ্গদেশের শিরা-উপশিরায় প্রাণ বিধান করিয়া আসিয়াছে।[৮]

রবীন্দ্রনাথের এই কবিসুলভ আবেগ অবশ্য বেশিদিন টেকে নি। বাঙলা ভাষাভাষীদের বিচ্ছেদটাই যে বাস্তব ছিল, কৃত্রিম ছিল না বরং ঐক্যের দাবিটাই ছিল কৃত্রিম সেটা রবীন্দ্রনাথ আরো কিছুদিন পরে এসে বোধহয় বুঝতে পেরেছিলেন। আন্দোলন চলাকালে হঠাৎই একদিন রবীন্দ্রনাথ লড়াইয়ের ময়দান থেকে সরে পড়েন এবং পিতার গড়া শান্তি নিকেতনে যেয়ে আশ্রয় নেন। তার এই গোত্রান্তর ও ইউটার্নে স্বদেশী বিপ্লবীরা দারুণভাবে বিস্মিত হন। তার সেদিনের আন্দোলনের এক সতীর্থ রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী লিখেছেন:

- দু বৎসর ধরিয়া মাতামাতির পর কতকটা স্নায়বিক অবসাদে, কতকটা ইংরেজের ভ্রুকুটি দর্শনে আমরা এখন ঠাণ্ডা হইয়া পড়িতেছি। রবিবাবুও সময় বুঝিয়া আমাদিগকে বলিতেছেন, মাতামাতিতে বিশেষ কিছু হইবে না, এখন কাজ করো।
- আজ যিনি আমাদিগকে আস্ফালনে ক্ষান্ত হইবার জন্য উপদেশ দিতেছেন, বাংলার ইতিহাসে এই নতুন অধ্যায়ের আরম্ভে আমি তাঁহারই কৃতিত্ব দেখিতে পাইতেছি। ইংরেজের নিকট 'আবেদন নিবেদন' করিয়া তাহার প্রসাদ গ্রহণ করিলে কিছুই স্থায়ী লাভ হইবে না, ইংরেজের মুখাপেক্ষা না করিয়া আপনার বলে ও আপনার চেষ্টায় যেটুকু পাওয়া যায়, তাহাই স্থায়ী লাভ, বঙ্গ বিভাগের কিছুদিন পূর্ব হইতে তাঁহার কণ্ঠস্বর অত্যন্ত উচ্চ এবং অত্যন্ত তীব্র হইয়া মুহুর্মুহু ঐ কথা আমাদের কানে প্রবেশ করাইতেছিল। .....
- স্বদেশীর আগুন যখন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তখন রবীন্দ্রনাথের লেখনী তাহাতে বাতাস দিতে ত্রুটি করে নাই। বেশ মনে আছে, ৩০ শে আশ্বিনের পূর্ব হইতে হপ্তায় তাহার একটা নতুন গান বা কবিতা বাহির হইত। আর আমাদের স্নায়ুতন্ত্র কাঁপিয়া আর নাচিয়া উঠিত। নিষ্ফল ও অনাবশ্যক আন্দোলনে তিনি কখনোই উপদেশ দেন নাই; কিন্তু সে সময়টায় যে উত্তেজনা ও উন্মাদনা ঘটিয়াছিল, তাহার জন্য রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব নিতান্ত অল্প ছিল না।[৯]

রবীন্দ্রনাথ শুধু আন্দোলন থেকে সরেই আসেন নি, আন্দোলনের বিরুদ্ধে নতুন পরিস্থিতিতে তিনি প্রচুর কলম চালিয়েছেন। প্রবন্ধ ও উপন্যাস লিখেছেন। এসব লেখালেখিতে তিনি আন্দোলনের সৈনিকদের চরিত্র হনন করতেও ছাড়েন নি। তার ঘরে বাইরে উপন্যাসের সন্দীপ

---

৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বঙ্গবিভাগ', রবীন্দ্র রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড, সুলভ সংস্করণ, কলকাতা: বিশ্বভারতী, পৌষ ১৪১০, পৃষ্ঠা ৭৭৫

৯. রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এই প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যাধি ও প্রতিকার প্রবন্ধের প্রত্যুত্তরে লেখেন। উদ্ধৃত: রবীন্দ্র রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড, সুলভ সংস্করণ, কলকাতা: বিশ্বভারতী, পৌষ ১৪১০, পৃষ্ঠা ৮১৯

স্বদেশী এজিটেটর, মানুষ হিসেবে সৎ নয় মোটেই। চার অধ্যায়ের সন্ত্রাসবাদীরা কেউ খুঁজছে ব্যক্তিগত ব্যর্থতার ক্ষতিপূরণ। কেউ চালিত রিপুর তোড়ে। উল্লেখ্য স্বদেশী আন্দোলনের বিরোধিতা করেই রবীন্দ্রনাথ ঘরে বাইরে ও চার অধ্যায় উপন্যাস লেখেন। অনেকের ধারণা এর পিছনে ইংরেজের সুস্পষ্ট প্ররোচণা ছিল।

সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের বিরোধিতা করায় স্বদেশী বিপ্লবীরা তাকে খুন করারও চেষ্টা করেছিল। এ খুনের হুমকি সুদূর মার্কিন মুল্লুক পর্যন্ত তাকে তাড়া করে ফিরেছিল। একটি মার্কিন পত্রিকার রিপোর্ট:

> Word of a plot to assasinate Rabindranath Tagore, Hindu poet and Nobel prize winner, reached to police yesterday and led to extraordinary precautions to guard him in the apartment at the Palace Hotel and at the Columbia Theatre where he lectured in the afternoon.[১০]

এ হামলা চালায় সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল গদর পার্টির যুক্তরাষ্ট্রীয় কর্মী জীবন সিং ও এইচ সিং হাতেশি। এরা জন্মসূত্রে পাঞ্জাবী ছিলেন। সেখানকার গদর পার্টির নেতা রামচন্দ্র ১৯১৬ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর সানফ্রানসিসকোর San Francisco Examiner পত্রিকায় একটি চিঠি লিখে অভিযোগ করেন:

- রবীন্দ্রনাথের আসল উদ্দেশ্য হলো ব্রিটিশ ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিপক্ষে প্রচার করা। ... রবীন্দ্রনাথ তার দুই ইউরোপীয় বন্ধু, শান্তি নিকেতনে তার সহযোগী সি এফ অ্যান্ড্রুজ ও উইলিয়াম পিয়ারসন আদতে ব্রিটিশ এজেন্ট এবং তাদের দ্বারা চালিত হয়েই রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়ান।[১১]

রামচন্দ্রের কথায় একেবারে কোনো যুক্তি ছিল না এমন বলা সম্ভব নয়।অরবিন্দ পোদ্দার তার ‘রবীন্দ্রনাথ, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব’ বইয়ের উপসংহারে এসে লিখেছেন যে রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মতে নানা রকমের স্ববিরোধিতা ছিল।[১২] তার এ বক্তব্যের বিরোধিতা করা সম্ভব নয়, কেননা রবীন্দ্র চিন্তাপ্রবাহের কোনো ধারাবাহিকতা ছিল না। যে রবীন্দ্রনাথ মাত্র কিছুদিন আগে বঙ্গ বিচ্ছেদকে বলছেন কৃত্রিম, আর ইংরেজ বিরোধী লড়াইকে করে তুলছেন ন্যায্য সেই তিনি গোত্রান্তরের পর লিখছেন বিচ্ছেদের বাস্তবতা ও ইংরেজ শাসন তার ভাষায় ঈশ্বরের শাসন।

---

[১০]. San Francisco Examiner, October 6, 1916

[১১]. প্রশান্ত কুমার পাল, রবি জীবনী, সপ্তম খণ্ড। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৭

[১২]. অরবিন্দ পোদ্দার, রবীন্দ্রনাথ- রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। কলকাতা: প্রত্যয়, ১৯৯৯।

রবীন্দ্রনাথের এই গোত্রান্তর নিয়ে তার স্তুতিকাররা এতদিন বলেছেন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের অন্তর্নিহিত সংকীর্ণ জাতীয়তায় আহত হয়ে তিনি ধীরে ধীরে আন্তর্জাতিকতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তারই বাণী প্রচারে মনোনিবেশ করেন। তখন থেকে তিনি শুরু করেন বিশ্ব মৈত্রীর সাধনা। এর প্রথম প্রমাণ দেখতে পাওয়া যায় গোরা উপন্যাসে। আর নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর থেকে তো এ দিকে তার ভাবের বন্যা দুকুলপ্লাবী হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের এই গোত্রান্তর নিয়ে পশ্চিম বঙ্গের নারায়ণ চৌধুরী লিখেছেন:

- অস্বীকার করবনা সরল বিশ্বাসে এ তথ্যে আমরা আস্থা স্থাপন করেছিলাম এবং তদনুযায়ী আমাদের প্রবন্ধে-নিবন্ধে বক্তৃতা-দিতে সে তথ্য প্রচার করতেও আমরা কুণ্ঠিত হইনি। এখন দেখছি প্রকৃত তথ্য অন্যরূপ। সম্প্রতি উদ্‌ঘাটিত একটি নয়া বিবরণে জানা গেল, রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের আবর্তের ভিতর খুব বেশি জড়িয়ে পড়েছিলেন বলে পুলিশ থেকে তাঁকে সতর্ক করে দেওয়া হয় ও তাঁর উপর নজরদারী চলতে থাকে। এই বিরূপ অভিজ্ঞতার প্রতিক্রিয়াতেই নাকি রবীন্দ্রনাথ আস্তে আস্তে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ক্ষেত্র থেকে নিজেকে সরিয়ে আনেন এবং শান্তি নিকেতন ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ডের উপর তাঁর পূর্ণ মনোযোগ ন্যস্ত করেন। তখন থেকেই সংকীর্ণ জাতীয়তার বিরুদ্ধে তাঁর জেহাদ ঘোষণা এবং আন্তর্জাতিক ভাবাদর্শের তীরে তাঁর বিশ্বাসের নোঙ্গর স্থাপন। সেই সঙ্গে আরও একটি কাজে তাঁকে অবতীর্ণ হতে দেখা যায়- বিপ্লবীদের ক্রিয়াকলাপের প্রকাশ্য সমালোচনা।
- সরল বিশ্বাসের বশে আমরা কী ভুলই না করেছিলাম। ভুল করে ভেবেছিলাম এর পিছনে যথার্থ বিশ্বাস-বদলের ভূমিকা রয়েছে- জাতীয়তার সংকীর্ণতা থেকে আন্তর্জাতিকতার ভূমিতে উত্তরণে কবি চিত্তে নবচেতনার স্ফূরণ হয়েছে। গণ্ডীবদ্ধ ভৌগলিক জাতীয়তার কৃত্রিম বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে কবি এতদিনে সত্যিকারের মহৎ বিচরণের ক্ষেত্র খুঁজে পেয়েছেন- উদার-নির্বন্ধন বৃহৎ-নির্বন্ধন আন্তর্জাতিকতায় নিঃশ্বাস নিয়ে তিনি বেঁচেছেন। কিন্তু কী ভ্রান্তি! এই ক্ষেত্রবদলের পিছনে যে একটা সাংসারিক হিসাব ছিল তাকে জানতো।[১৩]

বস্তুত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বদৌলতে ও ইংরেজের প্রশ্রয়ে যুক্ত বাংলার সবচেয়ে প্রভাবশালী ঠাকুর জমিদার পরিবারের সন্তান রবীন্দ্রনাথের পক্ষে দীর্ঘদিন ইংরেজ বিরোধিতা সম্ভব ছিল না। কারণ এটা ছিল তার পারিবারিক ঐতিহ্য ও সিলসিলার বিরোধী। তার ধমণীতে বিপ্লবের বীজ অনুপস্থিত ছিল। সামন্ত চেতনা ও ইংরেজ আনুগত্যের দ্বন্দ্ব তিনি কখনো অতিক্রম করতে পারেন নি। তাৎক্ষণিক কবিসুলভ আবেগ বা উন্মাদনা কিংবা জমিদারী শ্রেণি চেতনা থেকে

---

[১৩]. নারায়ণ চৌধুরী, 'রবীন্দ্রনাথ: আমাদের সংস্কৃতি জগতে একটি অমীমাংসিত সত্তা', মুগ্ধ ও মুক্ত দৃষ্টির রবীন্দ্র বিতর্ক, (হুমায়ুন আজাদ সম্পাদিত), ঢাকা: ডানা প্রকাশনী, ১৯৮৭

আন্দোলনে নিজের নাম লেখালেও একই সাথে বিষয়বুদ্ধি সম্পন্ন রবীন্দ্রনাথের বুঝতে বাকি ছিল না প্রবল ইংরেজের বিরোধিতায় আখেরে তার অবক্ষয়ের সম্ভাবনাই বেশি। এ কারণেই তিনি আন্দোলন ছেড়ে দেন এবং ইংরেজের পক্ষপুটে পুনরায় আশ্রয় নেন। ধূর্ত ইংরেজ অলক্ষ্যে স্বদেশী আন্দোলনে ভাঙ্গন ধরায় এবং রবীন্দ্রনাথের আশু ক্ষতির সম্ভাবনাকে নাকচ করে দিয়ে বহুগুণে তা পুষিয়ে দেয়। বিজ্ঞজনের বিশ্বাস সেটিই নোবেল পুরস্কার।

তিন

নোবেল প্রাইজ পাওয়ার প্রাক্কালে পশ্চিমা দুনিয়ায় রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এক ধরনের media craze তৈরি হয় এবং এর পিছনে ব্রিটিশের শক্তি ও সমর্থন পুরোটাই থাকে। ডব্লিউ বি ইয়েটস, এজরা পাউন্ডের মতো কবি, উইলিয়াম রোদেনস্টাইনের মতো শিল্পী, থমাস স্টারজ মুরের (ইনি সুইডিস একাডেমির কাছে রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজের পক্ষে সুপারিশ করেছিলেন) মতো লেখকেরা রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন এবং পশ্চিমা দুনিয়ায় রবীন্দ্রনাথের ভাবমূর্তিকে স্ফীত করে তোলেন। রবীন্দ্রনাথকে সেখানে প্রাচ্যের আধ্যাত্মিক পুরুষ হিসেবে তুলে ধরা হয়। ডারউইনের পৌত্র ফ্রানসিস কনফোর্ড তাকে gentle christ হিসেবে আখ্যায়িত করেন।[১৪] প্রাথমিকভাবে রবীন্দ্রনাথের এই সন্ন্যাসী চেহারা দিয়ে পশ্চিমী দুনিয়ায় তাকে আধ্যাত্মিক কবি হিসেবে বাজারজাত করতে বেশ সুবিধা হয়।[১৫] অবশ্য সাম্রাজ্যবাদের সমর্থনে গড়ে ওঠা রবীন্দ্র ভাবমূর্তির এই আতিশয্য পশ্চিমে বেশি দিন টেকে নি। এই ব্যাপারটি অমর্ত্য সেনও হাল জামানায় লক্ষ করে লিখেছেন:

> In contrast, in the rest of the world, especially in Europe and America, the excitement that Tagore's writings created in the early years of the twentieth century has largely vanished.[১৬]

কারণ সাম্রাজ্যবাদের রবীন্দ্রনাথকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা তখন ফুরিয়ে গিয়েছিল। এই কারণেই ইয়েটসের মতো কবি যিনি গীতাঞ্জলির ইংরেজি তরজমার ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন তিনি ১৯৩৫ সালে রোদেনস্টাইনের কাছে লেখা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথকে তিরস্কার করে বলেছেন Damn Tagore এবং তার লেখা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন

[১৪]. উদ্ধৃত: Amartya Sen, Tagore and His India. Countercurrents.org

[১৫]. প্রাগুক্ত

[১৬]. প্রাগুক্ত

sentimental rubbish বলে।[১৭] রবীন্দ্রনাথের যে আধ্যাত্মিকতা নিয়ে ইয়েটস একসময় উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছিলেন পরবর্তীকালে তিনি তার সমালোচনায় মুখর হন:

- He speaks too much about God. My mind resents the vagueness of such references I have fed upon the philosophy of the Upanishads all my life, but there is an aspect of Tagore's mysticism that I dislike.[১৮]

শুধু তা-ই নয়, ইয়েটস রবীন্দ্রের নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তির পিছনে সাম্রাজ্যবাদী অভিসন্ধির কথাও ফাঁস করে দিয়েছেন। তিনি মনে করতেন ভারতে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মনোভাবকে দুর্বল করে দেবার জন্য রবীন্দ্রনাথকে নোবেল প্রাইজ দেয়া হয়েছিল। তার ভাষায়:

- a piece of wise imperialism from the English point of view.[১৯]

এটা সত্য, রবীন্দ্রনাথের দুর্বোধ্য আধ্যাত্মিকতা পশ্চিমের যুক্তিবাদী মননের কাছে খুব একটা পাত্তা পায় নি। এ কথাটা ইংরেজ ঔপন্যাসিক ডি এইচ লরেন্স ১৯৩৫ সালে লেডি ওটোলিন মোরেলের (Lady Ottoline Morrell) কাছে লেখা চিঠিতে বেশ খোলামেলা আলোচনা করেছেন:

- One is glad to realize how these Hindus are horribly decadent and reverting to all forms of barbarism in all sorts of ugly ways. We feel surer on our feet, then. But this fraud of looking upto them this wretched worship of Tagor attitude - is disgusting.[২০]

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এরকম অনুভূতি বার্ট্রান্ড রাসেলেরও হয়েছিল। রাসেল তার এক চিঠিতে এ কথাটা বলেছেন যার উদ্ধৃতি পরবর্তীকালে অমর্ত্য সেন দিয়েছেন:

- I regret I cannot agree with Tagore. His talk about the infinite is vague nonsense. The sort of language that is admired by many Indians unfortunately does not, in fact, mean anything at all.[২১]

---

[১৭]. উদ্ধৃত: Nirad C. Chaudhury, Autobiography of an Unknown Indian. Part-II. Mumbai: Jaico Publishing House, 2008

[১৮]. Malcolm Sen, Literature: Mythologising a 'mystic': W. B. Yeats on the poetry of Rabindranath Tagore. History Ireland: Irelands History Magazine. Issue 4 (July/August 2010), Volume 18

[১৯]. প্রাগুক্ত

[২০]. উদ্ধৃত: Nirad C. Chaudhury, Autobiography of an Unknown Indian. Part-II

[২১]. উদ্ধৃত: Seamus Perry, Rabindranath Tagore revived. The Times Literary Supplement. Sept 16, 2011

রবীন্দ্রনাথ আজ পশ্চিমা দুনিয়ায় আদৌ তেমন পঠিত নন এবং সেই ১৯৩৭ সালেই গ্রাহাম গ্রিনের ভাষায়:

- As for Rabindranath Tagore, I can not believe that anyone but Mr. Yeats can still take his poems very seirously.[২২]

রবীন্দ্রনাথ এখন বেঁচে আছেন বাংলাদেশ ও ভারতের পূর্বাঞ্চলের একশ্রেণির বাংলাভাষীর কাছে। এর পিছনেও নিছক শিল্পভোগের চেয়ে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উদ্দেশ্যই অনেক ক্ষেত্রে কার্যকরী। সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাভাষীর কাছে রবীন্দ্র সংস্কৃতি এখনো তাৎপর্যহীন, তাদের দৈনন্দিন জীবনের সংস্কৃতিতে রবীন্দ্রনাথ এখনো প্রাসংগিক নন মোটেই। গুটিকয়েক শহুরে প্রভাবশালী বাঙালি মধ্যবিত্ত যারা এখনও সেই কলকাতার 'ভদ্রলোকদের' ইজ্জত করে চলেন তারাই রবীন্দ্র চর্চায় একধরনের ভাবালুতায় দুলে ওঠেন।

চার

এ জগতে হায়, সেই বেশী চায় আছে যার ভূরি ভূরি-
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙ্গালের ধন চুরি।
অথবা
ওই মহামানব আসে
দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে
মর্তধূলির ঘাসে ঘাসে।

এ ধরনের কিছু কিছু জীবনঘনিষ্ঠ নজির উপস্থাপন করে কোনো কোনো রবীন্দ্র স্তুতিকার বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গভীর একাত্মতার কথা প্রমাণের চেষ্টা করেন। দরিদ্রদেরকে শোষণ করেই এক শ্রেণির মানুষ ধনী হয় কিংবা মহামানব আসলেই মানুষের মুক্তির সম্ভাবনা তৈরি হয়, এই সাধারণ বিবৃতির অতিরিক্ত এমন কোনো বক্তব্যই এসব কবিতার মধ্যে পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথ আত্মার সাধনায় সিদ্ধকাম হবার কথা সারা জীবনব্যাপী ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু উপেনদের মতো শোষিত মানুষের মুক্তির জন্য জমিদারীর শোষণমূলক ব্যবস্থা উৎখাতের প্রয়োজন এটা তিনি অত্যন্ত সুকৌশলে ও নানা বাক্যজাল বিস্তার করে এড়িয়ে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ দুই বিঘা জমি কবিতাটি রচনা করেছেন ১৮৯৫ সালে। তখন তিনি নিজেই একজন প্রতাপশালী জমিদার।

অবাক হবার মতো ব্যাপার উপেনের মতো শোষিত প্রজারা জমিদারের অবৈধ কার্যকলাপের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াক এটা রবীন্দ্রনাথ চান নি। মিথ্যা দেনার দায়ে জমিদার কর্তৃক

[২২]. প্রাগুক্ত

উপেন নিজের ভিটেমাটি থেকে বিতাড়িত হচ্ছে। কিন্তু তার মুখে প্রতিবাদের ভাষা নেই। গ্রিক দেশের স্টোয়িক দার্শনিকদের মতো জীবনের প্রতি নিরাসক্ত মনোভাব উপেনের- সর্বহারা হয়েও সে বিক্ষুব্ধ হতে পারে না জমিদারের বিরুদ্ধে। সেই কারণে নিজের ভিটেমাটি থেকে উৎপাটিত উপেন রবীন্দ্রনাথের স্বাভাবিক কৃপায় সন্ন্যাসী হয়ে গেছে। উল্লেখ্য, শিলাইদহে উপেনের জমি রবীন্দ্রের প্রতাপশালী পূর্বপুরুষরা গ্রাস করে নিয়েছিলেন।

জমিদারী দেখাশোনার কাজে রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘদিন পূর্ববঙ্গের গ্রাম-গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছেন। এই সূত্রেই তিনি এখানকার চাষী ও রায়তদের খুব কাছাকাছি আসবার সুযোগ পেয়েছিলেন। এই বৃহত্তর কৃষিজীবী জনগোষ্ঠীকে উপরে তুলে আনবার জন্য তিনি তার লেখালেখিতে বিভিন্ন রকম বক্তব্য ও পরামর্শ হাজির করেছেন। তাদেরকে শিক্ষিত করবার কথা ভেবেছেন। তাদেরকে স্বাবলম্বী হিসেবে গড়ে তুলবার বিভিন্ন পথ বাৎলেছেন এসব সত্য। তার গুণমুগ্ধরা বলে থাকেন তিনি তার নোবেল পুরষ্কারের টাকা কৃষি ব্যাংকের মাধ্যমে প্রজাদের ক্ষুদ্র ঋণ হিসেবে বিতরণ করেছেন। ১৯৩০ সালে লেখা রাশিয়ার চিঠিতে তিনি বলেছেন:

- কেবলই ভাবছি আমাদের দেশজোড়া চাষীদের দুঃখের কথা। আমার যৌবনের আরম্ভকাল থেকেই বাংলাদেশের পল্লীগ্রামের সঙ্গে আমার নিকট পরিচয় হয়েছে। তখন চাষীদের সঙ্গে আমার প্রত্যহ ছিল দেখা শোনা- ওদের সব নালিশ উঠেছে আমার কানে। আমি জানি ওদের মতো নিঃসহায় জীব অল্পই আছে, ওরা সমাজের যে তলায় তলিয়ে সেখানে জ্ঞানের আলো অল্পই পৌঁছয়। প্রাণের হাওয়া বয়না বললেই হয়। তখনকার দিনে দেশের পলিটিক্স নিয়ে যাঁরা আসর জমিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে একজনও ছিলেন না যারা পল্লীবাসীকে এদেশের লোক বলে অনুভব করতেন।[২৩]

শুধু তাই নয় আমাদের দেশের কৃষক সম্প্রদায়ের প্রতি সহানুভূতি জানাতে গিয়ে তিনি এ কথাও লিখেছেন:

- জমিদারী ব্যবসায়ে আমার লজ্জা বোধ হয়। আমার মন উপরের তলার গদি ছেড়ে নীচে এসে বসেছে।

অন্যত্র-আমাদের জমিদারী যেন প্রজাদেরই জমিদারী হয়-

- আমরা যেন ট্রাসটির মতো থাকি। কিন্তু সে ওদেরই অংশীদারের মতো।[২৪]

---

২৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'রাশিয়ার চিঠি', রবীন্দ্র রচনাবলী, দশম খণ্ড, সুলভ সংস্করণ, কলকাতা: বিশ্বভারতী। পৌষ ১৪১০, পৃষ্ঠা ৫৬২

২৪. প্রতীমা দেবীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র। উদ্ধৃতঃ রবীন্দ্র রচনাবলী। দশম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৮১

এসব লেখা পড়লে মন ছুঁয়ে যায়। মনে হয় এমন মহৎপ্রাণ যে কবি তার জমিদারীতে নিশ্চয় কৃষককুলের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের তিলমাত্র অভাব ছিল না। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি কি সেসব কথার সত্যতা প্রমাণ করে? বরং তখন রবীন্দ্রনাথের ঐ সমস্ত চিন্তাভাবনাকে একান্তই কবিসুলভ উচ্ছ্বাস, প্রগলভতা ও ফাঁপা আবেগ দ্বারা পরিচালিত বলে মনে হয়। এমন কথাও মনে হয় পূর্ব বাংলার প্রকৃতি তার মননের জগতে যেভাবে আলোড়ন তুলেছিল ঠিক একইভাবে এখানকার মানুষ ও সমাজ তার চিত্তে দোলা দিতে পারে নি। রবীন্দ্রনাথ কবির গজদন্ত মিনার ছেড়ে যখন বাস্তবতার জমিনে এসে দাঁড়িয়েছেন তখন তার ঐসব আবেগতাড়িত কথাবার্তার কৃত্রিমতা উন্মোচিত হয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথকে একসময় তার একান্ত সচিব কবি অমিয় চক্রবর্তী তার বিশাল জমিদারীর ক্ষুদ্র এক অংশ দরিদ্র প্রজাদের ভিতরে বন্টন করে দেয়ার অনুরোধ করলে তিনি তার পুত্র রথীন্দ্রনাথের ভবিষ্যতের দোহাই পেড়ে অমিয়র এমন দাবিকে বাতিল করে দেন এবং বলেন:

- বল কি হে অমিয়, আমার রথীন তাহলে খাবে কী?[২৫]

অথচ এই রবীন্দ্রনাথই বলছেন জমিদারী ব্যবসায়ে নাকি তার লজ্জাবোধ হয়। একদিকে রবীন্দ্রনাথ কৃষকদের কল্যাণের কথা ভাবছেন। নিজের জমিদারী তাদের জন্য ছেড়ে দেয়ার কথা চিন্তা করছেন। ঠিক পরমূহুর্তে তিনি তা বাতিল করে পূর্ব সিদ্ধান্তের স্থানে ফিরে যাচ্ছেন। তার চিন্তাভাবনায়, বক্তব্যের মধ্যে এই স্ববিরোধিতা চিরদিন ছিল। এই কারণেই তার বিশ্বাসের তেমন কোনো ঋজুতা বা স্পষ্টতা দেখা যায় না।

রবীন্দ্রনাথের চিন্তার মধ্যে ইউরোপীয় ভাবধারার একটা প্রভাব হয়তো পড়েছিল। কিন্তু মূলত তিনি ছিলেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে প্রাপ্ত সুবিধাভোগীদের উত্তরসূরী যারা নাকি ইংরেজ পোষিত সামন্তবাদী ব্যবস্থার পক্ষে দেশের ব্যাপক কৃষিজীবী জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা রেখে গেছেন। মহামানবতার বাণী প্রচার করেও শেষ বিচারে রবীন্দ্রনাথ এই প্রতিক্রিয়াশীল সুবিধাবাদী শ্রেণিরই অন্তর্ভূক্ত একজন মাত্র। এদের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে ছলে বলে কৌশলে নিজের সুবিধাকে নিরাপদ রাখা। সেবার দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা, প্রেমের দ্বারা দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কল্যাণ এদের বৈশিষ্ট্য নয়। যদিও এসব কথা রবীন্দ্রনাথের আজীবন প্রচার করতে কোনো দ্বিধা জাগে নি। একজন রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই তাই বলা সহজ:

- আমার জন্মগত পেশা জমিদারী, কিন্তু স্বভাবগত পেশা আসমানদারী।

বলা সহজ:

- জমিদারীর জমি আঁকড়ে থাকতে অন্তরের প্রবৃত্তি নেই।[২৬]

---

[২৫]. অন্নদাশঙ্কর রায়, 'রবীন্দ্রনাথ', প্রবন্ধ সমগ্র, চতুর্থ খণ্ড, কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স লিমিটেড, বাংলা ১৪০৪

[২৬]. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'রায়তের কথা, কালান্তর', রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, সুলভ সংস্করণ, কলকাতা: বিশ্বভারতী, পৌষ ১৪১০, পৃষ্ঠা ৬৫৪

এ কি কবিসুলভ মন্ত্রোচ্চারণ। বাস্তব ক্ষেত্রে যখন তাকে বিশাল জমিদারীর একাংশ সর্বহারাদের মধ্যে দান করতে বলা হলো তখন তিনি নারাজ হলেন।

জমিদার কিংবা মানুষ হিসেবে রবীন্দ্রনাথ কেমন ছিলেন? তিনি কি কার্যতই প্রজাবৎসল ছিলেন? এসব বিষয়ে ইতিহাসকার ও সমাজতাত্ত্বিকরা কী বলেন আর রবীন্দ্রপূজারীদের প্রচারণার ধরনটাই বা কেমন? এটা একটু মিলিয়ে দেখা যাক।

বাংলা একাডেমির উত্তরাধিকার পত্রিকায় বিশিষ্ট সমাজতন্ত্রী বুদ্ধিজীবী আহমদ শরীফ রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে 'রবীন্দ্রত্তোর তৃতীয় প্রজন্মে রবীন্দ্র মূল্যায়ন'[২৭] নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। এখানে তিনি মানুষ রবীন্দ্রনাথের কতকগুলো স্খলনকে লক্ষ্যভেদী তীরের মতো চিহ্নিত করেছেন- তিনি ব্রাহ্ম হয়েও হিন্দু পৌত্তলিকতাগ্রস্ত ছিলেন, উপনিষদের শ্লোক উদ্ধৃত করলেও কামে-প্রেমে তার অরুচি ছিল না, জমিদার নন্দন হয়েও অরণ্যে খোলেন ব্রহ্মচর্যাশ্রম কিন্তু ব্যবহার করেন আধুনিক উপকরণ, তিনি মুসলমানের কোনো কৃতি দ্বারা তেমন অনুপ্রাণিত হন নি, তিনি সাম্রাজ্যবাদে বিশ্বাসী ছিলেন, ইংরেজের অনুরক্ত ছিলেন তিনি, তিনি দান করতেন না, স্বার্থবুদ্ধি সম্পন্ন ছিলেন, তিনি জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের বিরোধী ছিলেন, ইত্যাদি। তার এসব অভিযোগ অখণ্ডনীয় এবং প্রামাণ্য ইতিহাস দ্বারা সমর্থিতও বটে।

অন্যদিকে কলকাতা থেকে দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মীয় সুভো ঠাকুরের 'বিস্মৃতিচারণা'[২৮] লেখাটি। সুভো ঠাকুরের কথা সত্য হলে বলতে হবে রবীন্দ্রনাথ উদার নয়, স্বার্থ প্রণোদিত মানুষই ছিলেন। সুভো ঠাকুরের মতে পতিসরের জমিদারী ছিল ঠাকুর এস্টেটের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মহার্ঘ্য। এখান থেকেই জমিদারী আয় সবচেয়ে বেশি হতো। আর রবীন্দ্রনাথ অন্য শরিকদের বঞ্চিত করে সেটি নিজের নামে বাগিয়ে নিয়েছিলেন। কেবল তাই নয়, রবীন্দ্রনাথের পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর উইল করে যান এই জমিদারীর আয় থেকে তার বিধবা কন্যা বর্ণকুমারীকে একটা নির্দিষ্ট হারে মাসোহারা প্রদান করতে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তা দিতে অস্বীকার করলে বর্ণকুমারী আদালতের শরণাপন্ন হন। যে ব্যক্তি আপন বিধবা বোনকে মাত্র কয়টা টাকা মাসোহারা দিতে চান নি, তার পক্ষে কতটুকু প্রজাহিতৈষী হওয়া সম্ভব সে প্রশ্ন উঠতেই পারে।

দেশ পত্রিকায় অমিতাভ চৌধুরীর লেখা 'জমিদার রবীন্দ্রনাথ'[২৯] প্রকাশিত হয়। এ লেখা থেকে জানা যায় শিলাইদহের জমিদারীতে প্রজাবিদ্রোহ ঘটেছিল। আর রবীন্দ্রনাথ তা দমন করেছিলেন শক্ত হাতে।

---

২৭. আহমদ শরীফ, রবীন্দ্রোত্তর তৃতীয় প্রজন্যে রবীন্দ্র মূল্যায়ন। উত্তরাধিকার, বাংলা একাডেমি, এপ্রিল-জুন, ১৯৮৬

২৮. সুভো ঠাকুর, বিস্মৃতিচারণা, শারদীয়া দেশ, বাংলা ১৩৯১

২৯. অমিতাভ চৌধুরী, জমিদার রবীন্দ্রনাথ, শারদীয়া দেশ, বাংলা ১৩৮২

কবি সমর সেন সম্পাদিত ইংরেজি পাক্ষিক Frontier-এ ঠাকুর জমিদারিতে প্রজা নির্যাতন নিয়ে একসময় প্রচুর লেখালেখি হয়েছিল। সেখানে বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছিল-

- সমসাময়িক সরকারি নথি-পত্রের সাক্ষ্য এই যে, ঠাকুর জমিদারিতে ঠাকুররা যে হারে কর বাড়াতেন, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অন্য কোনো জমিদার পারতেন না এবং এতে ইংরেজ সিভিলিয়ানরা পর্যন্ত বিরক্ত ও শঙ্কিত হতেন প্রজা বিদ্রোহের আশঙ্কায়।[৩০]

এসব লেখা আমাদের রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে সাহায্য করে। যদিও এসব লেখা নিয়ে রবীন্দ্র ব্যবসায়ীরা মৌচাকে ঢিল পড়ার মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছেন এবং তাদের আরাধ্য দেবতার মূর্তি ভঙ্গকারী হিসেবে এরা চিহ্নিত হয়েছেন। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে সস্তা আবেগ দিয়ে তো প্রামাণিক ইতিহাসের বিরুদ্ধে বন্দুকবাজী করা চলে না। রবীন্দ্রনাথ যে প্রজাপীড়ক জমিদার ছিলেন, অন্যায়ভাবে খাজনা বৃদ্ধি করেছেন, সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রজাবিদ্রোহ হলে তা নিষ্ঠুরভাবে দমন করেছেন- এসব তো মিথ্যা কথা নয়। এখন বলা হচ্ছে কৃষকদের উপকারের জন্য তিনি নাকি তার নোবেল পুরস্কারের টাকা দিয়ে কৃষি ব্যাংক চালু করেছিলেন। আসলেই কি ইতিহাস এসব প্রচারণাকে সমর্থন করে? বরং ইতিহাস কী বলে তার একটু সন্ধান নিই:

- রবীন্দ্রনাথ পতিসরে কৃষি ব্যাংক খুলেছিলেন। করেছেন সুদের কারবার। যতদিন সুদের ব্যবসা লাভজনক ছিল ততদিন চলেছিল এই ব্যাংক। তারপর রবীন্দ্রনাথ নিজেই তুলে দেন তাঁর ব্যাংক। প্রজাদের ভাল-মন্দের কথা না ভেবেই। ব্যাংকের মাধ্যমে প্রজাদের রক্ষা করাই যদি তাঁর লক্ষ্য হত, তবে তিনি কম সুদে টাকা খাটাবার পরিকল্পনা নিতেন। কিন্তু তিনি তা নেননি।[৩১]

যে রবীন্দ্রনাথের ছবি এতক্ষণ আমরা দেখলাম তা কিন্তু প্রচারণার অন্তরালে ঢাকা পড়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথের এই মুখশ্রী কয়জনা জানে। এই রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়ন করেছেন পশ্চিম বঙ্গের বুদ্ধিজীবী অরবিন্দ পোদ্দার:

- জমিদার জমিদারই। রাজস্ব আদায় ও বৃদ্ধি, প্রজা নির্যাতন ও যথেচ্ছ আচরণের যেসব অস্ত্র চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলার জমিদার শ্রেণীর হাতে তুলে দিয়েছিল, ঠাকুর পরিবার তা সদ্ব্যবহারে কোন দ্বিধা করেনি। এমনকি জাতীয়তাবাদী হৃদয়াবেগ ঔপনিষদিক ঋষিমন্ত্রের পুনরাবৃত্তি এবং হিন্দু মেলার উদাত্ত আহ্বানও জমিদার রবীন্দ্রনাথকে তার শ্রেণী স্বার্থ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি।[৩২]

এই রবীন্দ্রনাথকে কী আমরা প্রগতিশীলতা, আধুনিকতা প্রভৃতির ফ্রেমে বন্দী করতে পারি? প্রগতিশীলতার সংজ্ঞা ও তাৎপর্য দিয়ে কী এই রবীন্দ্রনাথকে মানানসই করে তোলা যায়?

---

৩০. শেখ দরবার আলম, সংস্কৃতি ও সহাবস্থান। ঢাকা: শাহীন পাবলিকেশন্স, ২০০৬

৩১. এবনে গোলাম সামাদ, বাংলাদেশকে বুঝতে হলে রবীন্দ্র-বিতর্ক দরকার। দেশ, ১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৯১

৩২. অরবিন্দ পোদ্দার, রবীন্দ্রনাথ- রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব

আমাদের প্রচারজীবী বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিকদের কল্যাণে রবীন্দ্রের যে শ্রী হয়েছে তার সাথে প্রকৃত রবীন্দ্রনাথের দুস্তর ব্যবধান। একজন লেখক লিখেছেন:

- উনিশ ও বিশ শতাব্দীতে কৃষক বিদ্রোহের মাধ্যমে ইংরেজ সরকারের বিরোধিতাকে যদি রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে চরম প্রগতিশীল লক্ষণ বলে ধরে নেওয়া যায়, তাহলে স্বীকার না করে উপায় থাকে না যে রবীন্দ্রনাথ তার পূর্বের বা সমকালীন যুগের সংগ্রামী কৃষকের তুলনায় বহুলাংশে প্রতিক্রিয়াশীল ছিলেন। কারণ রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমগ্র সাহিত্যের কোথাও ইংরেজ শাসনের অবসানকল্পে এমন একটি বাক্য পর্যন্ত রচনা করেন নি যা সংগ্রামী কৃষকের মতো বৈপ্লবিক হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ ইংরেজ শাসনকে প্রসন্নচিত্তেই মেনে নিয়েছিলেন। ইংরেজ শাসনের অবসান তিনি কোনো সময়েই কামনা করেন নি। সেই দিক থেকে রবীন্দ্রনাথকে প্রতিক্রিয়াশীল বলা যায় কিন্তু সেই দৃষ্টিকোণ থেকে ফকির মজনু শাহ, নূরুল উদ্দীন, তিতুমীর, বিশ্বনাথ সর্দার, দিগম্বর বিশ্বাস, বিষ্ণুচরণ প্রভৃতির মতো বহু আত্মত্যাগী কৃষক নেতাকে বলা যায় প্রগতিশীল।[৩৩]

একটা কথা এদেশের বাঙালিবাদীরা তারস্বরে প্রচার করেন- রবীন্দ্রনাথ তার জমিদারীর দরিদ্র প্রজাদের জন্য ভূমিদান করেছেন, স্কুল বানিয়েছেন, বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করেছেন এবং বিনামূল্যের ডিসপেনসারি চালু করেছেন। প্রচারণার এই ব্যাপ্তি দেখলে ধারণা হওয়া স্বাভাবিক তার জমিদারীতে গরীব প্রজাদের নানা দিক দিয়ে প্রচুর পরিমাণে সমৃদ্ধি ঘটেছিল। বাস্তব অবস্থা হলো ১৯৪৭-এর দেশভাগের সময়ও তার জমিদারীতে ৫-১০% এর বেশি শিক্ষিত মুসলমান প্রজা ছিল না, তাও আবার অধিকাংশ নামমাত্র দস্তখতধারী। অধিকাংশ প্রজা ছিল দারিদ্র্য সীমার নিচে অবস্থানকারী এবং অপুষ্টিতে আক্রান্ত। উদ্যোগী রবীন্দ্রনাথের প্রজাহিতৈষণার এই হচ্ছে বাস্তব ফলাফল। আসলে এ ছিল তার কতকটা কবি ও জমিদারসুলভ বিলাসিতার নজির।

সেকালের কলকাতা কেন্দ্রিক হিন্দু জমিদাররা নিজেদের জমিদারীতে প্রজাহিতৈষণার প্রমাণ স্বরূপ দু'একটি স্কুল বা রাস্তাঘাট নির্মাণ করতেন। কিছুটা নিজেদের জমিদারীকে প্রজাদের সামনে হালাল করে তোলার জন্য আর কিছুটা নিজেদের উদারনৈতিক ভাবমূর্তি গড়ে তোলার প্রয়োজনে। রবীন্দ্রনাথের এই উদ্যোগ এর অতিরিক্ত কিছু ছিল বলে মনে হয় না।

কুষ্টিয়ার কাঙাল হরিনাথ ঠাকুর জমিদারদের অত্যাচার ও প্রজা নির্যাতন নিয়ে সেই কালে নির্ভিকভাবে তার সম্পাদিত গ্রামবার্তা পত্রিকায় লেখালেখি করেছিলেন। তার লেখার কিয়দংশ উদ্ধৃত করছি-

- জমিদারদের দ্বারা যত বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে, রাজদ্বারে সম্মানলাভের ইচ্ছাই তার অধিকাংশের কারণ। মফস্বলের এক একজন জমিদার দাতব্য ডিসপেনসারি

৩৩. আবু জাফর, রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তাধারা। চট্টগ্রাম: বইঘর, ১৯৮৫

এবং বিদ্যালয়ে বরণ দিয়ে আমেরিকা দেশের ভ্যাম্পায়ার বাদুড়ের মতো প্রজার রক্তপান করেন। হাকিমরা মফস্বলে এসে স্কুল ও ডিসপেনসারি দেখে ভুলে যান। প্রজার কান্না কিছুই শোনেন না।[৩৪]

যে বোলপুরের ভূবনডাঙ্গায় তিনি শান্তি নিকেতন গড়েছিলেন তার অনতিদূরেই রসুলপুর ও নূরপুর নামের মুসলমান অধ্যুষিত গ্রামগুলো আজো আছে। এই গ্রামগুলোর দরিদ্র মুসলমানদের দিকে রবীন্দ্রনাথ কখনো তাকিয়েছেন বলে মনে হয় না। সেদিনের মতো আজো তারা অশিক্ষা, দারিদ্র্য ও অপুষ্টির হানায় আক্রান্ত। রবীন্দ্রনাথ তার জীবদ্দশায় যেমন এদেরকে শান্তি নিকেতনের ছায়াতলে নিয়ে আসার চেষ্টা করেন নি, পরবর্তীকালে তার উত্তরাধিকারীরাও সেটা করার কথা ভাবেন নি। যে শান্তি নিকেতনে বসে রবীন্দ্রনাথ জগতজুড়ে বিশ্বমানবতার বাণী প্রচার করলেন, সেই বাণী কিন্তু অনতিদূরের রসুলপুর ও নূরপুর গ্রামে পৌঁছালো না। ওখানে তার ভাষায় 'কালাপানির বেড়া' রয়ে গেল, সেটা তিনি নিজেও অতিক্রম করতে পারলেন না।

পাঁচ

"কল্যাণীয়েষু, তোমার 'পথের দাবী' পড়া শেষ করেছি। বইখানি উত্তেজক। অর্থাৎ ইংরেজের শাসনের বিরুদ্ধে পাঠকের মনকে অপ্রসন্ন করে তোলে। ... আমি নানা দেশ ঘুরে এলাম- আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে এই দেখলাম- একমাত্র ইংরেজ গভর্নমেন্ট ছাড়া স্বদেশী প্রচার বাক্যে বা ব্যবহারে বিরুদ্ধতা আর কোন গভর্নমেন্ট এতটা ধৈর্য্যের সঙ্গে সহ্য করে না।... ইতি- তোমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২৭ শে মার্চ, ১৯৩৩)।"

"সে কি উত্তেজনা! কি বিক্ষোভ! রবীন্দ্রনাথ নাকি 'পথের দাবী' পড়ে ইংরেজের সহিষ্ণুতার প্রশংসা করেছেন। এ বইয়েতে নাকি ইংরেজদের প্রতি বিদ্বেষের ভাব আছে বলে মত প্রকাশ করেছেন। আমার 'পথের দাবী' পড়ে আমার দেশের কবির কাছে যদি এই দিকটাই বড় হয়ে থাকে, তাহলে স্বাধীনতার জন্য আর আন্দোলন কেন? সবাই মিলে তো ইংরেজদের কাঁধে করে নেচে বেড়ান উচিত। হায় কবি। তুমি যদি জানতে তুমি আমাদের কত বড় আশা- কত বড় গর্ব, তাহলে নিশ্চয় এমন কথা বলতে পারতে না। কবির কাছে আমার পথের দাবীর যে এত বড় লাঞ্ছণা হবে, এ আমার স্বপ্নের অতীত ছিল। কি মন নিয়েই যে আমি বইখানা লিখেছিলুম, তা আমি কারুকে বুঝিয়ে বলতে পারব না।"[৩৫]

---

৩৪. উদ্ধৃত; পৃথ্বীরাজ সেন, কলঙ্কিত ঠাকুরবাড়ী। কলকাতা: প্রিয়া বুক হাউস, ২০১৫

৩৫. গোলাম আহমদ মোর্তজা, চেপে রাখা ইতিহাস। বর্ধমান: বিশ্ব বঙ্গীয় প্রকাশন, ১৯৯৮

প্রথমোক্ত চিঠিটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। অন্যটি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিক্রিয়া। স্বদেশী বিপ্লবীদের প্রতি শরৎচন্দ্রের নিজের মতো করে এক ধরনের সহানুভূতি ছিল। সেই সহানুভূতি থেকে তিনি লেখেন তার বিখ্যাত উপন্যাস 'পথের দাবী'। পথের দাবী পড়ে মানুষ ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে জেগে উঠবে এমনতর বিশ্বাস থেকেই ইংরেজরা ঐ উপন্যাস বাজেয়াপ্ত করে। নিরুপায় কথাশিল্পী তখন রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেন তার বিশেষ প্রভাব খাটিয়ে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়ার ব্যবস্থা করতে। কিন্তু পথের দাবী উপন্যাসের মর্মবস্তু রবীন্দ্রনাথকে আদৌ আকর্ষণ করে নি। কারণ ইংরেজের অসন্তুষ্টি তিনি অর্জন করতে চান নি। তাই তিনি তার চিঠিতে শরৎচন্দ্রকে কিছুটা তিরষ্কারই করেন। এর উত্তরে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে শরৎচন্দ্রের বুক ফাটা দীর্ঘশ্বাসই কেবল উচ্চারিত হতে পেরেছে।

শরৎচন্দ্রকে তিরষ্কারের ভিতর দিয়ে একজন বিশেষ রবীন্দ্রনাথকে আমরা দেখতে পাই। এই রবীন্দ্রনাথ ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিপক্ষ নন, বরং সহযোগী বলা চলে। সত্য বটে রবীন্দ্রনাথ জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পর স্যার উপাধি ত্যাগ করে ইংরেজের নিন্দা করেছিলেন। কিংবা হিজলী জেলে রাজবন্দীদের হত্যা করার পর ইংরেজের সমালোচনা করেছিলেন। কিন্তু এর অর্থ এই নয়, ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের তিনি অবসান কামনা করেছেন। তিনি তার 'আত্মশক্তি' নামক প্রবন্ধে লিখেছেন:

> আমি বলিতেছি, গভর্মেন্টের সঙ্গে আমাদের ভদ্ররূপ সম্বন্ধ স্থাপনেরই সদুপায় করা উচিত। ভদ্র সম্বন্ধ মাত্রেরই মাঝখানে একটা স্বাধীনতা আছে। যে সম্বন্ধ আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন অপেক্ষাই রাখেনা, তাহা দাসত্বের সম্বন্ধ। তাহা ক্রমশ ক্ষয় হইতে এবং ছিন্ন হইতে বাধ্য। কিন্তু স্বাধীন আদান-প্রদানের সম্বন্ধ ক্রমশই ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠে।[৩৬]

এখানে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজ সরকারের সঙ্গে একটা সহযোগিতার সম্পর্ক চেয়েছেন। এটাই তার ভাষায় ভদ্র সম্বন্ধ। এই ভদ্র সম্বন্ধের অর্থ ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কিংবা বিপ্লব নয়, বরং স্থূল ভাষায় বললে ইংরেজের হাত পা ধরে যতটুকু সুবিধা নেয়া যায়। ইংরেজ শাসনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ভিতর দিয়ে উঠে আসা জমিদারকূলের এই ছিল সেদিনের নীতি। এই নীতি থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও খুব একটা বেরিয়ে আসতে পারেন নি।

আত্মশক্তি প্রবন্ধ লেখার চার বছর আগে রানী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুতে আয়োজিত এক সমাবেশে বক্তৃতা দিতে যেয়ে রবীন্দ্রনাথ ব্রিটিশের ঔচিত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। রবীন্দ্র রচিত দুর্লভ সেই শোক প্রস্তাবের কিছুটা এরকম:

---

৩৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সফলতার সদুপায়, আত্মশক্তি', রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, সুলভ সংস্করণ, কলকাতা: বিশ্বভারতী, পৌষ ১৪১০, পৃষ্ঠা ৬৫৩-৬৫৪

- ভারত সম্রাজ্ঞী মহারানী ভিক্টোরিয়া- যিনি সুদীর্ঘকাল তাঁহার রাজশক্তিকে মাতৃস্নেহের দ্বারা সুধাসিক্ত করিয়া তাঁহার অগন্য প্রজাবৃন্দের নত মস্তকের উপরে প্রসারিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, ক্ষমা শান্তি এবং কল্যাণ সেই ভারতেশ্বরী মহারানী যে মহান পুরুষের নিয়োগে এই পার্থিব রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং যাঁহার প্রসাদে সূচিরকাল জীবিত থাকিয়া অনিন্দিতা রাজশ্রীকে দেশে কালে ও প্রজাপুঞ্জের হৃদয়ের মধ্যে সুদৃঢ়তর রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন...।[৩৭]

রানী ভিক্টোরিয়া ভারতবর্ষকে ক্ষমা শান্তি ও কল্যাণের দ্বারা পরিবেষ্টন করেছিলেন, তার মাতৃস্নেহের দ্বারা সুধাসিক্ত হয়েছিল ভারতবর্ষের মানুষ, রানী ভিক্টোরিয়া তার অনিন্দিতা রাজশ্রীকে দেশে কালে ও প্রজাপুঞ্জের হৃদয়ের মধ্যে সুদৃঢ়তররূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন- শোক প্রস্তাবের এসব বাক্যাংশ প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট, এতে রবীন্দ্রনাথের শোকোচ্ছ্বাস যত না প্রকাশিত হয়েছে, তার চেয়ে বেশি প্রকাশ পেয়েছে ইংরেজের শাসন ব্যবস্থার প্রতি তাঁর প্রীতি, অনুরাগ ও অকুণ্ঠ সমর্থন। এখানে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজ শাসনে জর্জরিত ভারতবাসীর মুখ দেখেন নি। দেখেন নি ইংরেজ শাসনে সৃষ্ট অসংখ্য দুর্ভিক্ষের ছবি। ইংরেজের অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে জেগে ওঠা অসংখ্য প্রজা বিদ্রোহ, কৃষক বিদ্রোহ, আজাদীর জন্য সর্বস্ব ত্যাগ স্বীকারকারীদের আত্মত্যাগ কোনো কিছুই রবীন্দ্রনাথের চোখে পড়ে নি। ব্রিটিশের শাসন যদি এতই কল্যাণব্রতী হয় তাহলে ঔপনিবেশিক ভারতের মানুষের জীবনে এত দুর্দশা নেমে এসেছিল কী করে! মানবদরদী কবি রবীন্দ্রনাথ তবে সেদিন ভারতের কোন শ্রেণির মানুষের উপর ইংরেজের সুধাবর্ষণ প্রত্যক্ষ করেছিলেন? একমাত্র ইংরেজের সুবিধাভোগী শ্রেণি হিসেবে যারা সেদিন শাসক ইংরেজের আশ্রয়ে ছিল তাদের পক্ষেই কেবল এ ধরনের দালালী ও তোষণনীতি অনুসরণ করা সম্ভব।

রবীন্দ্রনাথ তার একাধিক প্রবন্ধে বলেছেন ভারতবর্ষে ইংরেজ থাকুক আর নাই থাকুক তাতে তার কিছু আসে যায় না। ভারতবাসীর কর্তব্য তার সমাজকে রক্ষা করা, তাকে স্বাবলম্বী হওয়া। রাষ্ট্র রক্ষার দায়িত্ব ইংরেজের - এতে বিক্ষুব্ধ হওয়ার কিছু নেই। ইংরেজের সাথে ভদ্র সম্বন্ধ রাখার এই হচ্ছে সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ প্রদর্শিত কৌশল।

রবীন্দ্রনাথ তার দীর্ঘ জীবনে নানা বাক্যজাল ও বাগাড়ম্বর ব্যবহার করে ইংরেজ শাসনের Status quo সমর্থন করে গেছেন। কখনো কখনো কবিসুলভ উচ্ছ্বাসের কারণে তার ভিতরে ইংরেজ বিরোধিতার সাময়িক আলোড়ন দেখা গেলেও এটা তার স্থায়ী বৈশিষ্ট্য নয়। এটা দ্ব্যর্থহীন কোনো বিষয়ও ছিল না। ইংরেজ আনুগত্যই তার প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য। আবার কখনো কখনো সাম্রাজ্যবাদীরাও তাদের শাসনের ন্যায্যতা দেয়ার জন্য সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতাকে

---

৩৭. অমিত্র সূদন ভট্টাচার্য, 'ইংলন্ডেশ্বরীর মৃত্যুতে রবীন্দ্রাশ্রু একটি দুষ্প্রাপ্য শোকপ্রস্তাব', কলেজস্ট্রীট, শারদীয় সংখ্যা, সেপ্টেম্বর, ১৯৮৪

কৌশল হিসেবে প্রশ্রয় দেয়। রবীন্দ্রনাথের সাময়িক ইংরেজ বিরোধিতাও কিছুটা ওরকম। রবীন্দ্রপ্রেমিকরা তার মানবদরদী ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার লক্ষণ হিসেবে 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধটার উল্লেখ করে থাকেন। এখানে নাকি তিনি ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে যথেষ্ট বিষোদগার করেছেন। তিনি লিখেছেন:

> জীবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম য়ুরোপের অন্তরের সম্পদ এই সভ্যতার দানকে। আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারেই দেউলিয়া হয়ে গেল।

কেন দেউলিয়া হয়ে গেল সে সম্পর্কে তার মতামত:

> নিভৃতে সাহিত্যের রস সম্ভোগের উপকরণের বেষ্টন হতে একদিন আমাকে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল। সেদিন ভারতবর্ষের জনসাধারণের নিদারুণ দারিদ্র আমার সম্মুখে উদ্ঘাটিত হল তা হৃদয় বিদারক। অন্ন বস্ত্র পানীয় শিক্ষা আরোগ্য প্রভৃতি মানুষের শরীর ও মনের পক্ষে যা-কিছু অত্যাবশ্যক তার এমন নিরতিশয় অভাব বোধ হয় পৃথিবীর আধুনিক শাসন চালিত কোনো দেশেই ঘটেনি। অথচ এই দেশ ইংরেজকে দীর্ঘকাল ধরে তার ঐশ্বর্য জুগিয়ে এসেছে। যখন সভ্য জগতের মহিমাধ্যানে একান্ত মনে নিবিষ্ট ছিলেম তখন কোনোদিন সভ্যতা নামধারী মানব আদর্শের এতবড় নিষ্ঠুর বিকৃতরূপ কল্পনা করতেই পারিনি; অবশেষে দেখছি, একদিন এই বিকারের ভিতর দিয়ে বহুকোটি জনসাধারণের প্রতি সভ্য জাতির অপরিসীম অবজ্ঞাপূর্ণ ঔদাসীন্য।[৩৮]

মুশকিল হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ এখানে ইংরেজ শাসনের নিষ্ঠুরতার দিকে ইংগিত করলেও এর অবসান তিনি কামনা করেন নি। রবীন্দ্রনাথ কি এমন কোনো বাণী লিপিবদ্ধ করেছেন যাতে বোঝা যায় ইংরেজ শাসন বিতাড়ণ খুবই ন্যায্য? তিনি ইংরেজের ভারত ত্যাগের ব্যাপারটা অনেকখানি 'ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের' উপর ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু বিপ্লবের দ্বারা বা অন্য কোনো উপায়ে ভারতবর্ষ মুক্ত হোক তা তিনি চান নি। ইংরেজ শাসনের প্রতি তার ঐ সাময়িক ক্ষোভ ও বিষোদগার ইংরেজের নিরাপদ অস্তিত্বের জন্য ক্ষতিকর কিছু ছিল না। বরং তাতে ইংরেজের সাথে তার ভদ্র সম্বন্ধের ব্যাপারটায় কখনোই ফাটল ধরে নি। রবীন্দ্রনাথ যে কায়মনোবাক্যে ইংরেজের শাসনের স্থায়িত্ব চেয়েছেন তার প্রমাণ হাজির করেছেন আহমদ শরীফ:

> ২১-১-১৩১৫ তারিখে নির্ঝরিনী সরকারকে এক চিঠিতে ব্রিটিশ শাসনকে ঈশ্বরের শাসন হিসেবে গণ্য করে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যে অন্যায় তার ফতোয়া দেন।...

---

৩৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সভ্যতার সংকট। রবীন্দ্র রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, সুলভ সংস্করণ, কলকাতা: বিশ্বভারতী, পৌষ ১৪১০, পৃ: ৭৪৪ ও পৃ: ৭৪২

রমারল্যার কাছে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের প্রয়োজনীয়তার পক্ষে যুক্তি হাজির করে ভারতের পরাধীনতাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন।[৩৯]

রবীন্দ্র মনীষার এমনি চেতনা আমাদের গৌরব বৃদ্ধি করে না অবশ্যই।

ঔপনিবেশিকতার ঔরসে সাহেব ও পণ্ডিতদের যৌথ শ্রমে উনিশ শতকে কলকাতাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল বঙ্গীয় হিন্দু রেনেসাঁ। এই রেনেসাঁর শ্রেষ্ঠতম রত্ন ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিশীলতাকে বুঝতে হলে এই রেনেসাঁর ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতকে বিশ্লেষণ করতে হবে, যে রেনেসাঁ নাকি গোলামীকে আজাদীর তাৎপর্য দিতে চেয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের বেড়ে ওঠায় ও মনোগঠনে ঐ রেনেসাঁর প্রভাব ছিল সক্রিয়, যার বীজাণু তিনি আজীবন বহন করে বেড়িয়েছেন। এই কারণেই তিনি কখনো সাম্রাজ্যবাদকে সাম্রাজ্যবাদ বলতে পারেন নি। গোলামীর বিরুদ্ধে বুক পেতেও দাঁড়াতে পারেন নি কখনো।

ছয়

রবীন্দ্রচিন্তার ধারা প্রবাহটি কেমন ছিল? তিনি কি হিন্দু জাতীয়তাবাদী অথবা পাশ্চাত্য প্রভাবিত সেকুলার হিউম্যানিস্ট বা সমাজতন্ত্রী- কোন ধরনের বিশেষ চিন্তায় উজ্জীবিত হয়েছিলেন? অন্নদাশঙ্কর রায়ের মতো ভাবুকরা মিছেমিছি রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর পৌরাণিক ও মধ্যযুগীয় মনোবৃত্তিকে র‍্যাশনালাইজ করার চেষ্টা করেছেন আধুনিক মানবিকতাবাদের তাৎপর্য দিয়ে। যুক্তি দেয়াই যেতে পারে। কিন্তু সে যুক্তি যদি বালির বাঁধের উপর বসে দেওয়া হয় তা কি টেকসই হবে। অন্নদাশঙ্করও স্বীকার করেছেন রবীন্দ্রনাথ পুনরুজ্জীবনবাদী হিন্দুদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি যখন গোরা উপন্যাস লেখেন তখন নাকি তার রূপান্তর হয়েছিল। স্বদেশী আন্দোলনের অবসানে তিনি নাকি একেবারেই বদলে গিয়েছিলেন। অন্নদাশঙ্করের ভাষ্য উদ্ধার করছি:

- স্বদেশী যুগের পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী হয়েছিলেন। স্বাদেশিক শিক্ষার জন্যে আত্মোৎসর্গ করেছিলেন। কিন্তু তার স্বদেশ পৌরাণিক সাকারবাদী স্বদেশ নয়। তার কাছে ধর্ম রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির বাহন নয়। ধর্ম তার কাছে সব কিছুর উর্ধ্বে। জাতীয়তাবাদের খাতিরেও তিনি অধর্ম করবেন না। দেশের স্বাধীনতার জন্যেও খুন-ডাকাতী সমর্থন করবেন না। অন্ধ কুসংস্কারকে মুক্তি আন্দোলনের মিত্র করতেও তাঁর আপত্তি। মিত্রই কপট শত্রু। অন্ধতা থেকেই পরাধীনতা এসেছে। অন্ধতার মধ্যে প্রবেশ করলে স্বাধীনতা আসবে কোন মায়াবলে? রবীন্দ্রনাথ যুক্তিবাদী সিদ্ধান্তে অটল। তার প্রোগ্রাম গঠনকর্মে সর্বশক্তি নিয়োগ করে স্বাধীনতার বুনিয়াদ মজবুৎ

[৩৯]. আহমদ শরীফ, রবীন্দ্রোত্তর তৃতীয় প্রজন্মে রবীন্দ্র মূল্যায়ন

করা। আবেদন আর নিবেদন নয়। বয়কট আর বোমা নয়। নিরলস সংগঠন ও সেবা। সেই উপায়ে দেশকে আপনার করে নেওয়াই দেশ জয়। অবশেষে অপসরণ করলেন রবীন্দ্রনাথ। লোকে মনে করল পুলিশের ভয়ে শান্তিনিকেতনে গা ঢাকা দিলেন। ধীরে ধীরে যুগ চেতনার সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নিলেন। সে যুগ স্বদেশী যুগ নয়। আধুনিক যুগ। তার সঙ্গে আড়ি করে পূর্ণভাবে বাঁচা যায় না। ইংরেজের সঙ্গে আড়ি করেও অগ্রসর হওয়া যায় না। "এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খ্রীষ্টান।"

স্বদেশী যুগের অবসানে রবীন্দ্রনাথের মন যখন তৈরি হলো তখন তিনি হলেন আবার পশ্চিম অভিমুখের যাত্রী।[৪০]

একে কী বলা যায়? রবীন্দ্রনাথের মুখ রক্ষার জন্য এক আধুনিকতার পেটিকায় ভর্তি যুক্তিজাল বা বাগাড়ম্বর। রবীন্দ্রনাথের জীবনাদর্শ কী ছিল এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজছি এই কারণে যে আমাদের দেশের সেকুলার বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিকরা যেভাবে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়েন তাতে মনে হয় রবীন্দ্রনাথ ছাড়া সেকুলারিজম, মানবতাবাদের চর্চা একেবারেই অসম্ভব। নারায়ণ চৌধুরীর লেখা থেকে ধার করছি:

- যদি বলেন রবীন্দ্রনাথ চিন্তার ক্ষেত্রে একজন বড় রকমের মানবতাবাদী ভাবুক ছিলেন, তিনি ছিলেন বিশ্বমৈত্রীর সাধক, আন্তর্জাতিক শান্তি ও সৌভ্রাত্রের উদগাতা; সে তথ্যের বিরুদ্ধাচরণ করতে যাব না। কিন্তু সে সত্য স্বীকার করে নিয়েও শর্ত যোগ করে বলব যে, তাঁর মানবতা বুর্জোয়া ঘরানার মানবতা, উনিশশতকীয় লিবারেলিজম আর অবলীলায়িত আশাবাদের দ্বারা পুষ্ট শ্রেণী স্বার্থবিজড়িত এক খণ্ডিত মানবতা। এ-জাতীয় মানবতার নিতান্ত মোহমুগ্ধ বশংবদ ভক্ত আমরা নই, কারণ এ-জাতীয় মানবতায় আজকের দিনে কোনো কাজই চলে না। এ এক প্রকারের অলীক, অসার বস্তুভিত্তিহীন শুভেচ্ছা মিশনের অভিযান, যে অভিযানের বুলি সর্বস্বতা অভিযানকারী অন্তরে অন্তরে নিজেও ভালো করে জানেন। এই জাতীয় মানবতাবাদের গাঁটে-গাঁটে 'কম্প্রাডোর-বুর্জোয়াতন্ত্রের' রক্তদুষ্টির ব্যাধি অচ্ছেদ্যভাবে সংলগ্ন হয়ে আছে। একটু গা টান করলেই ব্যথায় সমস্ত শরীর কঁকিয়ে ওঠে। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের লুণ্ঠনকার্যের সহায়ক এদেশীয় দালাল বেনিয়ান-মুৎসুদ্দির বংশধরের মুখে মানবপ্রেমের এই সমস্ত গালভরা বড় বড় কথা প্রহসনের মত শোনায়, কখনও কখনও মনে অদ্ভুত কৌতুক-হাস্যের অনুভব জাগায়।[৪১]

---

৪০. অন্নদাশঙ্কর রায়, 'রবীন্দ্রনাথ'

৪১. নারায়ণ চৌধুরী, 'রবীন্দ্রনাথ'

রবীন্দ্রনাথ কী সত্যিই বদলে গিয়েছিলেন? বদলে যেয়ে তিনি আসলে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন? আমরা জানি রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী আন্দোলন থেকে ছুটে গিয়ে শান্তি নিকেতনে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এখানে বসেই তিনি বাকি জীবন শিল্প চর্চায়, সাহিত্য সৃষ্টিতে, সংগীত রচনায়, নাট্যাভিনয়ে তদুপরি জমিদারী কাজে বুঁদ হয়ে ছিলেন। মাঝে মাঝে এখান থেকে বেরিয়ে জমিদারীর গরীব প্রজাদের উপর অতিরিক্ত খাজনা (আবওয়াব) আদায় করে সেই টাকায় বিদেশ ভ্রমণে যেতেন এবং বিশ্ব মানবতাবাদের বাণী প্রচার করতেন। বলা যায় শান্তি নিকেতনই ছিল তার সবরকমের বৌদ্ধিক ও নৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রস্থল।

রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য জীবনীকার প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় আমাদের জানিয়েছেন- প্রাচীন ভারতের হিন্দু আদর্শ কীভাবে আধুনিক জীবনে সফল হতে পারে শান্তি নিকেতনে কবি তারই পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন এবং আমৃত্যু তিনি এই সাধনায় ব্যস্ত ছিলেন।[৪২]

শেষ বিচারে ও মোটা দাগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একজন হিন্দু জাতীয়তাবাদী ছিলেন। তবে প্রথম জীবনের রাজনীতির স্থূল হিন্দু জাতীয়তাবাদকে তিনি পরিহার করেছিলেন। কিন্তু হিন্দু জাতীয়তাবাদের ভাবসত্ত্বাটুকু গ্রহণ করে তিনি বাকি জীবন এর একটি সাংস্কৃতিক ও নান্দনিক রূপ দেয়ার চেষ্টা করেছেন। তিনি যে মানবতাবাদের বাণী প্রচার করতেন তা-ও ঐ প্রাচীন হিন্দু ধর্মের আধারে গঠিত। এর মধ্যে উপনিষদও ছিল, তপোবনও ছিল, মুনি-ঋষিরাও ছিল, ব্রাহ্মণের আচার-বিচারও ছিল। এর উপরে পশ্চিমা হাওয়ার একটি প্রলেপ পড়েছিল মাত্র। বস্তুত রবীন্দ্রনাথ আধুনিক কালের ঋষি হতে চেয়েছিলেন। শিব নারায়ণ রায় লিখেছেন:

> সাহিত্যের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী হিন্দু সংস্কৃতির পরম্পরাকে তাঁদের (রামমোহন, মাইকেল, বঙ্কিম) চাইতে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তার তত্ত্বচিন্তায়, কবিতায় এবং বিশেষ করে গানে সেই ঐতিহ্য তার চেতনাকে পুষ্ট এবং তার কল্পনাকে শেষ পর্যন্ত বেশ কিছুটা সীমাবদ্ধ করে রেখেছিল।[৪৩]

খ্যাতিমান বুদ্ধিজীবী শ্রী নীরদচন্দ্র চৌধুরীর চোখেও রবীন্দ্রনাথের এই হিন্দুত্বের ব্যাপারটা ভালোমতো ধরা পড়েছিল। তিনি লিখেছেন:

> একটা একেবারে বাজে কথা সর্বত্র শুনিতে পাই। তাহা এই- রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তি হিসাবে বিশ্বমানব' ও লেখক হিসাবে 'বিশ্বমানবতা'রই প্রচারক। কথাটার অর্থ ইংরেজি ও বাংলা কোনও ভাষাতেই বুঝিতে পারি না। তবে অস্পষ্টভাবে ধোঁয়া-ধোঁয়া যেটুকু বুঝি, তাহাতে অর্থহীন প্রলাপ বলিয়া মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের অপেক্ষা বিশিষ্ট বাঙালী ও খাঁটি বাঙালী হিন্দু জন্মায় নাই। তিনি এমনই বাঙালী যে ভারতবর্ষের অন্য

---

৪২. প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র জীবনী। কলকাতা: বিশ্বভারতী, বাংলা ১৪২০

৪৩. শিবনারায়ণ রায়, রবীন্দ্রনাথ, শেক্সপিয়ার ও নক্ষত্র সংকেত

অঞ্চলের অধিবাসীরও তাঁহাকে ভাল করিয়া বুঝিবার ক্ষমতা নাই। সত্য কথা বলিতে কি, রবীন্দ্রনাথকে 'গুরুদেব' বলিয়া উল্লেখ করার মত কপট ন্যাকামি আর কিছু হইতে পারে না। মহাত্মা গান্ধী অথবা নেহরু যে তাঁহাকে এই অভিধানে অভিহিত করিতেন, উহাকেই আমি অবাঙালীর রবীন্দ্রনাথকে না বুঝিবার চূড়ান্ত প্রমাণ বলিয়া মনে করি। কাহাকেও না বুঝিয়া রাজনৈতিক সুবিধার জন্য ভক্তি দেখাইতে গেলে কৃত্রিমতা এড়াইবার উপায় নাই। মহাত্মা গান্ধী ও নেহরু দুইজনেই এই দোষে দোষী। আসলে রবীন্দ্রনাথ মনেপ্রাণে বাঙালী হিন্দু ছিলেন, বাঙালী হিন্দু হিসাবেই নিজের কথা পৃথিবীর লোকের কাছে বলিয়াছিলেন। তাঁহার রচনার ইংরেজী অনুবাদে তাঁহার এই প্রকৃত রূপ প্রকাশ পায় নাই। তাই আজ পাশ্চাত্ত্যে, এমন কি বাংলার বাহিরেও তাঁহার আন্তরিক সমাদর নাই। যে বাঙালী হিন্দুত্ব তাঁহার আসল ধর্ম, 'দৃষ্টিদান' সেই ধর্ম হইতেই উৎসারিত হইয়াছে। এই উৎসার আবার এত স্বাভাবিক যে, উহা রবীন্দ্রনাথের মন হইতে অজ্ঞাতসারেই বাহির হইয়া আসিয়াছিল।

- অবশ্য একথা সত্য যে, একসময়ে রবীন্দ্রনাথ জ্ঞাতসারেই এক ধরনের হিন্দুত্বের দিকে ঝুঁকিয়াছিলেন। উহা জাতির জীবনে স্বদেশী আন্দোলনের যুগ ও তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনে পর পর মৃত্যুশোকের কাল। তাঁহার পত্নী মৃণালিনী মারা যান ১৯০২ সনের ২৩শে নভেম্বর; তেরো বৎসরের কন্যা রেণুকা বা রাণী মারা যায় ১৯০৩ সনের মে মাসে; প্রিয় শিষ্য সতীশচন্দ্র রায় মারা যান ফেব্রুয়ারী ১৯০৪ সনে; পিতা দেবেন্দ্রনাথ বিগত হন ১৯০৫ সনের জানুয়ারী মাসে; কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্র তেরো বৎসর বয়সে ১৯০৭ সনের নভেম্বর মাসে মারা যায়।
- একদিকে বাঙালীর জাতিগত জীবনে রাজনৈতিক সঙ্কট, আর একদিকে তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের শোক, এই দুই মিলিয়া রবীন্দ্রনাথের মনে একটা নির্বেদের সৃষ্টি করিয়াছিল। হিন্দুর মনে ও ধর্মে অতি প্রাচীন কাল হইতেই একটা নিষ্ঠুর বৈরাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া আছে। সাংখ্য, বেদান্ত, এমন কি গীতাও এই বৈরাগ্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত। এই বৈরাগ্য নিষ্ঠুর, তাই ইহা হইতে নিষ্কাম কর্মযোগের উৎপত্তি হইয়াছে। এই কর্মযোগের কথাও রবীন্দ্রনাথের মনে জাগিয়াছিল।
- কিন্তু এই পথ ধরিবার ইচ্ছা রবীন্দ্রনাথের জীবনে স্বদেশী আন্দোলন ও শোক দেখা দিবার আগেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। ইহাকেও স্বাভাবিক বলা যাইতে পারে। তখন বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাধারা ও বিবেকানন্দের কর্মযোগ এ দুইয়ের প্রভাব বাঙালীর উপর অত্যন্ত প্রবল হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের মত সজীব ব্যক্তির পক্ষে এই প্রভাব সম্বন্ধে অসাড় থাকা একেবারেই সম্ভব ছিল না। তাই তিনি উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালী জীবনের অন্য ধারায় অর্থাৎ উদারনৈতিক ব্রাহ্মধারায় বড় হইলেও নব্য হিন্দুত্বের

দিকে ঝুঁকিয়াছিলেন। ইহার পরিচয় তিনি পত্নীবিয়োগের পূর্বেই দিয়াছিলেন। ১৯০১ সনে শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মাচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে রবীন্দ্রনাথের হিন্দুত্ব আরও প্রকট হইয়া উঠে।[৪৪]

সত্য বটে রবীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে তার স্ববিরোধী চরিত্র বৈশিষ্ট্যের জন্য মানুষের ধর্মের কথা বলতেন। নাস্তিকতার আগুনে ধর্মীয় ভেদবুদ্ধিকে পুড়িয়ে ফেলার কথা বলেছেন। তবে এগুলো হচ্ছে তার সাময়িক উত্তেজনার ফল। রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে হলে তার ধর্মভাবনা ও ধর্মীয় সংস্কৃতি দিয়েই বুঝতে হবে। কারণ এটিই তার চরিত্রের উপর স্থায়ী প্রভাব ফেলেছে। সৈয়দ তোশারফ আলী লিখেছেন:

- রবীন্দ্রনাথ ধর্মমতে ছিলেন ব্রাহ্ম। ব্রাহ্মদর্শন উপনিষদের ওপর প্রতিষ্ঠিত হলেও ব্রাহ্মদের অনেকে সরাসরি হিন্দু বলতে চান না। এ নিয়ে একদা অনেক তর্ক-বিতর্ক হয়েছে। উপনিষদের ওপর প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মধর্ম বাহ্যিকভাবে খ্রিষ্টীয় প্রকরণ স্বীকার করেছিলো তৎকালীন হিন্দুদের খ্রীষ্টান হয়ে যাওয়া রোধ করতে। রবীন্দ্রনাথ নিজে রীতি অনুযায়ী উপাসনা মন্দিরে যেতেন। ১৮৮৪ থেকে ১৯১১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি আদি ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক ছিলেন। মূর্তিপূজার তিনি সমর্থক ছিলেন এমন কথা যেমন বলা যাবে না তেমনি মূর্তিপূজার তিনি কঠোর বিরোধী ছিলেন এমন কথাও জোর দিয়ে বলা যাবে না। শেষ বয়সে তিনি নিজেকে কোনো ধর্মের সঙ্গে যুক্ত রাখতে চাননি। মানুষের ধর্মের কথাও বলেছেন। এমনকি সাম্প্রদায়িক হানাহানি প্রত্যক্ষ করে 'নাস্তিকতার আগুনে' ধর্মীয় ভেদবুদ্ধিকে পুড়িয়ে নিঃশেষ করার কথাও তিনি খেদের সঙ্গে উচ্চারণ করেছিলেন একবার।
- তারপরও তার বিপুল সৃষ্টির দিকে তাকালে দেখা যাবে হিন্দু ধর্ম ও দর্শনের অনুপানে সিক্ত হয়েছে অনেক রচনা। হিন্দু দেব-দেবীর মাহাত্ম্য প্রচারে তিনি বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেননি। শ্রী দীনেশ চন্দ্র সেনের 'রামায়নী কথার' যে ভূমিকা ১৩১০ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন অন্য কোন হিন্দুর পক্ষে তারচে শ্রদ্ধাপূর্ণ ভূমিকা লেখা সম্ভব ছিল না। শিব, রুদ্র, কৃষ্ণ, সরস্বতীকে তিনি তাঁর সাহিত্যে মহিমান্বিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের সরস্বতী বন্দনা বাল্মিকী ও কালিদাসকে হার মানিয়েছে। সোনার তরী কাব্যের পুরস্কার কবিতা যার সাক্ষ্য বহন করছে। বাল্মিকী প্রতিভায় কালী, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর সুন্দর উপস্থাপনা রয়েছে। শিব, রুদ্র বা শঙ্করের মহিমা তাকে মুগ্ধ করেছিল। কৃষ্ণের প্রেম এবং সরস্বতীর ভক্তজনে কৃপা রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি কেড়েছিল। দূর্গার মাতৃভাবও তার মনঃপূত ছিল। অল্প বয়সের লেখা শৈশব সঙ্গীতের একটি কবিতায় (হর হৃদে কালিকা) তিনি কালী বন্দনাও করেছেন। যদিও কালীর ব্যাপারে

[৪৪]. নীরদচন্দ্র চৌধুরী, বাঙালী জীবনে রমণী। কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, বাংলা ১৩৯৫

তাঁর মনে কিছুটা দ্বিধা ছিল। বৌদ্ধ ধর্মের ওপরও তিনি শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রচনা করেছেন। শিখ, মারাঠা, রাজপূত- এদের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথই শ্রেষ্ট কবিতা লিখেছেন। অর্থাৎ সাহিত্যের আধারে তিনি ধর্মীয় বিষয়কে অমর করতে চেয়েছেন এবং এ ব্যাপারে তার সাফল্য বিস্ময়কর। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে এ দিকটির প্রতি অনেকেই নজর দিতে চান না। তাদের ধারনা, এ ব্যাপারে আলোচনা করলে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্মের আবেদন ক্ষুণ্ন হবার আশঙ্কা রয়েছে। এ ধারণা কিন্তু সঠিক নয়। রবীন্দ্রনাথকে যথাযথভাবে উপলব্ধির জন্য তাঁর ধর্মভাবনা সম্পর্কে সম্যক পরিচয় থাকা আবশ্যক।[৪৫]

এই রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে তাহলে আমাদের সেকুলার ভাবুকদের এত সমারোহ- আড়ম্বর কিসের? এমন উদ্দেশ্য যে আমরা সাদা চোখে দেখতে পাই না, অথচ সংগোপনে ঠিকই তার অভিপ্রায় হাসিল করে চলেছে।

আমাদের দেশে আরেকদল রবীন্দ্রস্তাবক আছেন যারা একই সাথে মার্কসবাদীও। এ অনেকটা কাঠালের আমসত্ত্বের মতো। অথচ এখানকার মার্কসবাদীরা সেই অসম্ভব কাজটিই করে চলেছেন। এদেশের একজন মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীর রবীন্দ্র মূল্যায়ন দেখা যাক। বেঁচে থাকলে হয়তো স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও এ মূল্যায়নে কুণ্ঠিত হতেন:

- রবীন্দ্রনাথ নদীর মতোই, প্রবহমান একাকী কিন্তু সংলগ্ন। কোন নদীও: না শীর্ণ নয়, যে শুকিয়ে গেছে কিম্বা যাচ্ছে সে নয়। এ নদী বর্ষার ভরপুর, সজীব ও সমৃদ্ধ ...
- এখন নদীর খুব প্রয়োজন, খরা কবলিত এই বাংলাদেশে খুবই প্রয়োজন রবীন্দ্রনাথকে। না, রবীন্দ্রনাথ আর দ্বিতীয়বার আসবেন না। কোনো বড় প্রতিভাই দ্বিতীয়বার আসে না। আসবার উপায় নেই। কিন্তু তার যে কাজ সবগুলো বৃত্তির সুষম বিকাশের ভিতর দিয়ে মানুষকে মানুষ করে তোলা এবং বিচ্ছিন্নতা ঘোঁচানো একের সঙ্গে অপরের- সেই কাজের খুব দরকার। মানুষ খণ্ডিত হয়ে যাচ্ছে। দরিদ্র মানুষ এদেশে চিরকালই খর্ব ও আবদ্ধ- যেমন দৈহিকভাবে তেমনি মানসিকভাবে। ধনীরাও এখানে পরিপূর্ণ নয়। তাদের টাকা হয়েছে কিন্তু হৃদয় সতেজ হয়নি। বরঞ্চ দুর্বল হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে বিশ্বাস করতেন হৃদয়ের শিখায় এবং মানুষের পূর্ণতায়। বিচ্ছিন্নতাও বাড়ছে। ধনীরা বিচ্ছিন্ন, গরিবরা তো বিচ্ছিন্ন বটেই। ধনীর সঙ্গে গরিবের দূরত্ব ক্রমবর্ধমান, রবীন্দ্রনাথ বাঙালিকে কাছাকাছি নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন বাঙালির... এখানে রবীন্দ্রনাথ যে কাজ করেছেন সে কাজ খুবই জরুরি

[৪৫]. সৈয়দ তোশারফ আলী, রবীন্দ্রনাথের ধর্মভাবনা ও ধর্মসাধনা। সাপ্তাহিক রোববার, ঈদসংখ্যা, ১৯৯৪

বৈকি। তাঁকে ছাড়া চলবে কেন? কিভাবে? নদী ছাড়া বাংলাদেশ কবে ছিল। থাকবে কবে?[৪৬]

আরেকজন মার্কসবাদীর মূল্যায়ন হচ্ছে এরকম:

- রবীন্দ্রনাথের মাটিতে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করার সাধনা, রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে বেঁচে থাকার, বিকশিত হওয়ার কিংবা রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করার বর্বর অহংকার হচ্ছে পায়ের তলায় জমিশূন্য, শেকড় শূন্য, নির্বোধের অহংকার।[৪৭]

এসব মূল্যায়নে অনেকে খুশী হতে পারেন। কিন্তু নিরপেক্ষ জায়গা থেকে বললে, এতে মার্কসবাদীদের বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি অবিচার করা হয়। ভাববাদী, কথিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী পাঠকদের আতিশয্যমণ্ডিত রবীন্দ্রপ্রীতির না হয় একটা অর্থ আছে, কিন্তু মার্কসবাদীরা যখন রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এই ধরনের মাতামাতি করেন তার কি অর্থ? মার্কসবাদের কোথায় লেখা আছে- যে কবির সৃষ্টিতে গণমানুষ নেই, শ্রেণিসংগ্রাম নেই, প্রোলেতারিয়েতদের পক্ষে মুক্তির কোনো কথা নেই সেই রকম একজন বুর্জোয়া ঘরানার কবি ও ভাবুককে নিয়ে এতো মাতামাতি করতে হবে? তাহলে তারা এতকাল যা শিখেছেন এবং অন্যকে শিখিয়েছেন সেগুলো কী তারা জলাঞ্জলি দিয়েছেন?

এদেশের মার্কসবাদীরা ঐতিহাসিক কারণে ভারতীয় রাজনীতির প্রতি উন্মুখ। একসময় দলছুট সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা এদেশে কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম গোড়াপত্তন করেছিলেন। এরা রাজনৈতিকভাবে কমিউনিস্ট হলেও সাংস্কৃতিকভাবে বর্ণবাদী ও হিন্দুঘেঁষাই রয়ে যান। এই সাংস্কৃতিক কারণে তারা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রতি প্রচ্ছন্নভাবে দুর্বল থাকেন এবং সেই সিলসিলা আজও বহমান আছে। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রতি অন্তর্গত দুর্বলতার কারণে এরা এদেশে ভারতের সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের কৌশল হিসেবে রবীন্দ্রনাথকে সবার সামনে হাজির করেন। এক্ষেত্রে মার্কসবাদী সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, সত্যেন সেন, রনেশ দাসগুপ্ত, সংশয়বাদী হাবিবুর রহমান, বাঙালি জাতীয়তাবাদী ওয়াহিদুল হক, হায়াৎ মামুদ, আনিসুজ্জামান, সৈয়দ শামসুল হক ও গোলাম মুরশিদের মধ্যে মৌলিক কোনো তফাৎ দৃষ্টিগোচর হয় না।

সাত

পাকিস্তান আমলে রবীন্দ্র বিরোধিতার প্রশ্নটা উঠেছিল। একে এদেশের বাঙালি জাতীয়তাবাদীরা প্রসন্নভাবে নেন নি। উল্টো তারা এটাকে মনে করেছেন বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতির উপর আঘাত। বাংলা ভাষা ও রবীন্দ্রনাথ সমার্থক কিছু নয়। কবির রাজনৈতিক বিশ্বাসের জন্য যদি

---

৪৬. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, বাঙ্গালীর জয় পরাজয়। ঢাকা: বিদ্যাপ্রকাশ, ২০০৫

৪৭. সরদার ফজলুল করিম, রবীন্দ্রনাথের অস্তিত্বে আমাদের অস্তিত্ব। ঢাকা: দৈনিক সংবাদ, ২৪ ফাল্গুন, ১৩৯৬

তার বিরোধিতা হয় তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। এ উপমহাদেশে মুসলমানরা যে হিন্দুদের সাথে থাকতে পারেন নি বা তাদেরকে থাকতে দেয়া হয় নি তা কিন্তু বাঙালি জাতীয়তাবাদীরা বেমালুম চেপে যান। একটি রাষ্ট্র তার সংহতির স্বার্থে নানা রকম সিদ্ধান্ত নেয়। পাকিস্তান আমলে মুসলিম জাতীয়তাবাদের স্বার্থে রবীন্দ্র বিরোধিতার প্রশ্নটা এসেছিল। তার কার্যকারণ ব্যাখ্যা করেছেন আবুল মনসুর আহমদ:

> রবীন্দ্রনাথ এ সাহিত্য বিশ্ব দরবারে স্থান করে দিয়েছেন। তবু এ সাহিত্য পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য নয়। কারণ এটা বাংলার মুসলমানের সাহিত্য নয়। অর্থাৎ এ সাহিত্য থেকে মুসলিম সমাজ প্রাণ-প্রেরণা পায় নি। এ সাহিত্যের স্রষ্টাও মুসলমান নয়, এর বিষয়বস্তুও মুসলমানী নয়। এর স্পিরিটও মুসলমানী নয়, এর ভাষাও মুসলমানের ভাষা নয়।[৪৮]

পাকিস্তান সৃষ্টির পর সৈয়দ আলী আহসান লিখেছিলেন:

> মনে রাখতে হবে, পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল স্বাতন্ত্র্যবোধের উপর ভিত্তি করে। এই স্বাতন্ত্র্যবোধের পরিচয় মিলবে আমাদের সাহিত্যে ও কাব্যে। ... নতুন রাষ্ট্রের স্থিতির প্রয়োজনে আমরা আমাদের সাহিত্যে নতুন জীবন ও ভাবধারার প্রকাশ খুঁজব। সেই সঙ্গে এটাও সত্য যে আমাদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখবার এবং হয়তো বা জাতীয় সংহতির জন্যে যদি প্রয়োজন হয়, আমরা রবীন্দ্রনাথকেও অস্বীকার করতে প্রস্তুত রয়েছি। সাহিত্যের চাইতে রাষ্ট্রীয় সংহতির প্রয়োজন আমাদের বেশী।[৪৯]

রবীন্দ্র বিরোধিতা মানেই বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের বিরোধিতা নয়। ইকবাল তো সারে জাহা সে আচ্ছা হিন্দুস্তাঁ হামারার কবি। তারপরেও কি ভারত ইকবালকে তার জাতীয়তাবাদী ও সাংস্কৃতিক চৈতন্যের আধারে ঐভাবে স্থান দিয়েছে যেভাবে রবীন্দ্রনাথের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়। এর কারণ যে মতাদর্শিক এটা বুঝিয়ে বলার দরকার নেই। এদেশের বাঙালি জাতীয়তাবাদীরা রবীন্দ্র বিরোধিতাকে কৌশলগত কারণে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের বিরুদ্ধে আগ্রাসন হিসেবে গ্রহণ করেন এবং মুসলিম জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথকে বিদ্রোহের প্রতীক বানিয়ে এক সাংস্কৃতিক লড়াইয়ে লিপ্ত হন। এদেশে ভারতের পক্ষে মুসলিম জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রামের আগে সাংস্কৃতিক বিরোধিতা শুরু হয়। এর প্রথম লক্ষণ পরিস্ফুট হয় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ১৯৪৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর ও ১৯৪৯ সালের ১ জানুয়ারি ঢাকার কার্জন হলে অনুষ্ঠিত দু'দিনব্যাপী এক সাহিত্য সম্মেলনে। ঐ সম্মেলনে মূল সভাপতি হিসেবে ভাষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এক নতুন ব্যাখ্যা হাজির করেন:

---

৪৮. উদ্ধৃত, 'পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য', সরদার ফজলুল করিম সম্পাদিত। ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৬৮

৪৯. সৈয়দ আলী আহসান, পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা সাহিত্যের ধারা, মাহে নও, আগস্ট, ১৯৫১, পৃ: ৫৪

> আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালি। ... মা প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাঙালিত্বের ছাপ মেরে দিয়েছেন যে মালা-তিলক-টিকিতে কিংবা টুপি-লুঙ্গি-দাড়িতে তা ঢাকবার জো টি নেই।[৫০]

এটা রীতিমতো মুসলিম জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা। পরবর্তীকালে বাঙালি জাতীয়তাবাদী ও কমিউনিস্টরা পিছনে থেকে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহকে দিয়ে এ ধরনের কথা বহুবার বলিয়েছেন। তিনি ছিলেন এক বিচিত্র ধরনের মানুষ। ভাষা বিষয়ের পণ্ডিত। আচার ও পোশাকে নিষ্ঠাবান মুসলমান হলেও সাংস্কৃতিক চিন্তার দিক দিয়ে তিনি ছিলেন অস্পষ্ট, অনেক ক্ষেত্রে বিভ্রান্ত। মুসলমান ছেলেদের জন্য বাঙলা নাম রাখার প্রস্তাবও করেছিলেন একবার। এসব শুনে সেকালের কবি আশরাফ আলী খান চৌধুরী কৌতুকভরে তার জন্য একটি নাম দিয়েছিলেন- আচার্য বলিরাম। প্রথম জীবনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত বিষয়ে পড়তে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেখানকার হিন্দু পণ্ডিতরা তাকে ঢুকতে দেন নি। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে তার চাকরিও হয় নি। মুসলমান অধ্যুষিত পূর্ব বাংলায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হলে এখানে তার চাকরি হয়। ভারতবর্ষের রাজনীতির ধারা, হিন্দু-মুসলমান বিরোধ বিশেষ করে মুসলিম জাতীয়তাবাদ নিয়ে তার কোনো স্বচ্ছ ধারণা ছিল না। তার সমসাময়িক ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় রাজনীতি বিশেষ করে হিন্দি ও হিন্দু ন্যাশনালিজম নিয়ে প্রগাঢ় ধারণা রাখতেন। এর পক্ষে তিনি লড়াইও করেছিলেন। তুলনায় ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর অবস্থান ধোঁয়াশাপূর্ণই ছিল। বাঙলা ভাষার পণ্ডিত হয়েও সুনীতিকুমার শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের মতোই হিন্দু রাষ্ট্র ও হিন্দু জাতীয়তাবাদের খাতিরে হিন্দিকে বহু ভাষাভাষী ভারতবর্ষের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করার প্রস্তাব করেছেন। তিনি লিখেছেন:

> এক একটি প্রদেশে এক একটি ভাষা, এক একটি ভাষা অবলম্বন করিয়া এক একটি স্বতন্ত্র জাতি; সকলেই বৃহত্তর বৃত্ত স্বরূপ ভারতবর্ষের অন্তর্গত, সকলেরই প্রাদেশিক বা প্রান্তিক সত্তা বা সভ্যতা প্রাচীন ভারতের সার্বভৌম সত্তা বা সভ্যতার উপরে প্রতিষ্ঠিত, সকলকেই হিন্দী ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, ব্যবহার করিতে হইবে।[৫১]

মুসলিম জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক বিরোধিতার আরেকটি নজির হচ্ছে মওলানা ভাসানীর কাগমারী সম্মেলন। মূলত বামপন্থীরা এ সম্মেলনের পিছনে প্রধান অনুঘটকের কাজ করে। এ সম্মেলনের ভিতর দিয়ে মুসলিম জাতীয়তাবাদকে ছুড়ে ফেলা হয় এবং ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং রাজনীতির কতক ক্ষেত্রে বাংলার সীমানা ছাড়িয়ে ভারতীয় ঐতিহ্যকেও

---

[৫০]. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনের মূল সভাপতির ভাষণ: ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৪৮

[৫১]. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ভারত সংস্কৃতি। কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, বাংলা ১৪০৯

অঙ্গীকার করা হয়।[৫২] বাঙালি জাতীয়তাবাদ যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সাংস্কৃতিক ও নৈতিক সম্প্রসারণ এটা কাগমারী সম্মেলনের ভিতর দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা চলে।

মওলানা থেকে কমিউনিস্টে পরিণত জনাব ভাষানী ১৯৬৭ সালে রবীন্দ্র বিতর্ক চলাকালীন একটি বিবৃতি দেন। বিবৃতির কিয়দংশ উদ্ধৃত করছি:

> রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্য সাহিত্য, ছোটগল্প, প্রবন্ধ, নাটক, উপন্যাস ও সঙ্গীতের মাধ্যমে বাংলা ভাষাকে নূতন গৌরবে অভিষিক্ত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের অবদান সর্বজনীন। ইসলাম সত্য ও সুন্দরের জয় ঘোষণা করেছে। এই সত্য ও সুন্দরের পতাকা তুলে ধরেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাই, যাঁরা ইসলামের নামে, রবীন্দ্রনাথের উপর আক্রমণ চালাচ্ছেন, তাঁরা আসলে ইসলামের সত্য ও সুন্দরের নীতিতে বিশ্বাসী নন।[৫৩]

এই বিবৃতিতে বিবৃতিদাতার ইসলাম সম্পর্কে অপ্রতুল ধারণা এতো স্পষ্ট যে তা ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই এবং এই বিবৃতির অন্তর্গত ফাঁপা রাজনৈতিক আবেগ বুঝতেও কারো কষ্ট হওয়ার কথা নয়। এই বিবৃতির ভিতর মুসলিম জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে এক ধরনের কৌশলগত বীজ লুকানো রয়েছে মাত্র। ইসলামের নাম ভাঙ্গিয়ে এখানে রবীন্দ্রনাথকে জায়েজ করা হয়েছে। সত্য ও সুন্দরের চেতনা দেশে-দেশে সংস্কৃতি-সংস্কৃতিতে ভিন্ন রকম। রোমান ক্যাথলিক চার্চের সৌন্দর্য চেতনা, রামকৃষ্ণ মিশনের সৌন্দর্য চেতনা আর একজন মুসলিম আলেমের সৌন্দর্য চেতনা নিশ্চয় এক রকম নয়। সৌন্দর্য চেতনা বাস্তব অর্থে যদি এতই সর্বজনীন হতো তাহলে পৃথিবীর রক্তাক্ত ও সহিংস ইতিহাস অন্যরকম হতো বৈকি।

মওলানা ভাসানী ছিলেন এক অদ্ভুত চরিত্রের মানুষ। ব্যক্তিগত জীবনে নির্লোভ ও কিছুটা বিপ্লবী মেজাজের। যদিও তার রাজনীতি সুনির্দিষ্ট কোনো আদর্শ দ্বারা চালিত হতো কিনা বলা শক্ত। তিনি ইসলামী সমাজতন্ত্রের কথা বলতেন। কখনো কখনো তিনি খেলাফতে রব্বানীর কথাও বলেছেন। যদিও এই রাজনীতির পক্ষে তার কোনো কর্মসূচী ছিল না। কার্যত তিনি সারাজীবন মার্কসবাদীদের নিয়ে রাজনীতি করেছেন। তাদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়েছেন, নেতৃত্বে বসিয়েছেন, বিশ্বাস করতেন শ্রেণি সংগ্রামকে এবং আস্তিক হয়েও তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বজুড়ে কমিউনিস্টদের সাফল্য কামনা করতেন। জীবনের শেষ দিকে এসে তিনি ভারতের বিরুদ্ধে ফাঁপা বুলিসর্বস্ব হুংকার দিতেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেলো তার আশ্রিত মার্কসবাদীরাই এদেশে প্রধানত মুসলিম জাতীয়তাবাদ বিরোধী ভারতমুখী বাঙালি জাতীয়তাবাদের নৈতিক, সাংস্কৃতিক ও বৌদ্ধিক কাঠামো নির্মাণ করেছে।

---

৫২. আবুল মোমেন, রবীন্দ্রনাথ মুসলিম মানস ও বাংলাদেশের অভিযাত্রা। ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, ২০১১

৫৩. দৈনিক পাকিস্তান, ২৭ জুন ১৯৬৭। উদ্ধৃত: গোলাম মুরশিদ, রবীন্দ্র বিশ্বে পূর্ববঙ্গ পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রচর্চা। ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮১

যাই হোক মুসলিম জাতীয়তাবাদ বিরোধী সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের এই সিলসিলা ধরে ঔপনিষদিক রবীন্দ্রনাথকে এদেশে নিয়ে আসা হয়েছে এবং ষাটের দশকে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বাড়-বাড়ন্তের সুযোগে রবীন্দ্রনাথকে রীতিমতো বিদ্রোহের প্রতীক বানিয়ে স্পার্টাকাস, জোয়ান অফ আর্কের মর্যাদা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ষাটের দশকে ছায়ানট, বাফা, সংস্কৃতি সংসদ, উদিচী, ক্রান্তি, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন, খেলাঘর প্রভৃতি সংগঠন রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে সংস্কৃতির আঁড়ালে এক প্রমত্ত ভারতীয় রাজনীতির খেলা শুরু করে। রাজনৈতিক কৌশলের কারণে একে তারা বলে এক অসাম্প্রদায়িক, চিরায়ত, মানবিক বাঙালি সংস্কৃতির চর্চা। চিরায়ত বাঙালি সংস্কৃতি বলে ইতিহাসে আদৌ কিছু নেই। এটাও একটি রাজনৈতিক প্রোপাগান্ডা। যা আছে তা হলো হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলিম সংস্কৃতি। এই নতুন বাঙালি চেতনার রসদ বহুলাংশে আসে বঙ্গভঙ্গের সময়কার রবীন্দ্র রচিত হিন্দু জাতীয়তাবাদ ভিত্তিক দেশপ্রেমের সেই সঙ্গীতগুলো থেকে। যেমন:

১. যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে।...

২. বাঙলার মাটি, বাঙলার জল, বাঙলার বায়ু, বাঙলার ফল- পূন্য হউক, পূন্য হউক, পুন্য হউক হে ভগবান।

৩. ও আমার দেশের মাটি, তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা। তোমাতে বিশ্বময়ীর, তোমাতে বিশ্বময়ীর আঁচল পাতা ॥ ...

৪. আজি বাঙলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী । ... ইত্যাদি।

এভাবে বাঙালি মুসলমানের একাংশ সংস্কৃতির প্রশ্নে সেই পুরনো ভারতীয় জাতীয়তাবাদের খাদের মধ্যে যেয়ে পড়ে। হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার ফেরে ওপার বাংলা থেকে পালিয়ে আসা বিশিষ্ট মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী বদরুদ্দীন উমর এই ভারতীয় খাদের মধ্যে পড়াকে বলেছেন স্বদেশ প্রত্যাবর্তন:

- মুসলমানদের যে দৃষ্টি দেশের প্রতি এতকাল ছিল মমতাহীন, সেই দৃষ্টিই আচ্ছন্ন হল স্বদেশের প্রতি প্রেম ও মমতায়। ১৯৪৭ সাল থেকে ভাষা ও সংস্কৃতির সংগ্রাম তাই আসলে তাদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনেরই সংগ্রাম।[৫৪]

ভাষা ও সংস্কৃতির রাজনীতির আড়ালে এদেশে যে মূলত ভারতীয় রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তৃত হয়েছে এবং বাঙালি মুসলমানের ঐতিহাসিক আত্মপরিচয়কে বিবর্ণ করে দেয়ার চেষ্টা হয়েছে এটা অবশ্য উমর সাহেবরা বলতে নারাজ। কারণ, তারা এই আত্মপরিচয় নিয়ে আদৌ শ্লাঘা বোধ করেন না এবং এটি তাদের ভিতরে কোনো আলোড়ন সৃষ্টি করে না। এদেশে

[৫৪]. বদরুদ্দীন উমর, সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা, ঢাকা: গ্রন্থনা, ১৯৬৯

মার্কসবাদীদের একটা বড় রাজনৈতিক সাফল্য হচ্ছে- উনিশ শতকীয় কলকাতা কেন্দ্রিক বর্ণবাদী সংস্কৃতির পক্ষে লড়াই করে একশ্রেণির বাঙালি মুসলমানের মনে এরা নিজেদের আত্মপরিচয় সম্বন্ধে ভালোমতো হীনমন্যতা পয়দা করতে পেরেছেন।

এই প্রত্যাবর্তন বা ভারতমুখীনতার আদর্শিক কাঠামো নির্মাণ করেছেন আবুল ফজল, সুফিয়া কামাল, রনেশ দাশগুপ্ত, শওকত ওসমান, আবু জাফর শামসুদ্দীন থেকে শুরু করে আহমদ রফিক, আনিসুজ্জামান, হাবিবুর রহমান, ওয়াহিদুল হক, সনজীদা খাতুন, হায়াৎ মামুদ, সনৎকুমার সাহা প্রমুখ। রবীন্দ্রনাথের গান গেয়ে এই প্রত্যাবর্তনের সাংস্কৃতিক রূপ দিয়েছেন কলিম শরাফী, আবদুল আহাদ, বিলকিস নাসিরুদ্দীন, সনজীদা খাতুন, ফাহমিদা খাতুন, মালেকা আজীম প্রমুখ।

এদের অনেকেই জাতীয়তাবাদ প্রশ্নে বিভিন্ন সময় দ্বিধান্বিত ছিলেন। অনেকের মধ্যেই প্রচুর স্ববিরোধিতা ছিল। অনেকেই ওপার বাংলা থেকে এসে মুসলিম জাতীয়তাবাদের সর খেয়েছেন। অনেকে ভোলও পাল্টিয়েছেন। তারপরেও বলতে হবে এদেশের বাঙালি জাতীয়তাবাদী সংস্কৃতির এরাই হলেন মূলধারা। বাংলাদেশে রবীন্দ্রচর্চা ও বাঙালি সংস্কৃতি চর্চার আঁড়ালে এরাই ভারতীয় রাজনীতির স্বার্থরক্ষার কাণ্ডারী হিসেবে বিভিন্ন সময় এগিয়ে গেছেন। এই ধারার কয়েকজন বুদ্ধিজীবী ১৯৬৭ সালে প্রচারমাধ্যমে রবীন্দ্র সংগীত বর্জন করার সরকারি সিদ্ধান্তের বিপক্ষে একটি বিবৃতি দেন। বিবৃতির কিয়দংশ এরকম:

> রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য বাংলা ভাষাকে যে ঐশ্বর্য দান করিয়াছে, তাঁহার সঙ্গীত আমাদের অনুভূতিকে যে গভীরতা ও তীক্ষ্ণতা দান করিয়াছে- তাহা রবীন্দ্রনাথকে বাংলাভাষী পাকিস্তানীর সংস্কৃতির সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করিয়াছে।[৫৫]

এই বিবৃতির 'সংস্কৃতির সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ' কথাটি গুরুত্বপূর্ণ। ভারতবর্ষের ইতিহাসে 'অবিচ্ছেদ্য সংস্কৃতি' বলে কিছু ছিল না বা সংস্কৃতির কোনো জাতীয় রূপও গড়ে ওঠে নি। তাহলে এই অবিচ্ছেদ্য শব্দটির প্রয়োগ কেন? এটি যে রাজনৈতিক কৌশলের কারণে হয়েছে তা বলাই বাহুল্য।

তবে এটা মনে করার কারণ নেই রবীন্দ্রনাথের পক্ষ সমর্থনকারী বুদ্ধিজীবীরাই প্রবল ছিলেন। এই ধারার বিপরীত স্রোতটির যুক্তিও ফেলনা ছিল না। এরা উপরোক্ত বিবৃতির মর্মার্থ সমর্থন করেন নি। ১৯৬৭ সালেই মুসলিম জাতীয়তাবাদী রাজনীতির জন্য রবীন্দ্রনাথ যে অপ্রাসংগিক এ কথাটা ৪০ জন বুদ্ধিজীবী যুক্তি ও শাণিত বাক্যবাণে বুঝিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেন। এটা শুধু প্রচার সর্বস্ব একটা বিবৃতি ছিল না, এটা মুসলিম জাতীয়তাবাদের পক্ষে একটি সাংস্কৃতিক দলিলও বটে। বিবৃতিটি এরকম:

---

৫৫. আজাদ, ২৮ জুন ১৯৬৭। উদ্ধৃত: গোলাম মুরশিদ, রবীন্দ্র বিশ্বে পূর্ববঙ্গ পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রচর্চা

- পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে রবীন্দ্র সংগীত সম্পর্কে সরকারী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিয়া একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী মহলের যে বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে বলা হইয়াছে রবীন্দ্রনাথ বাংলাভাষী পাকিস্তানীদের তামুদ্দুনিক সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই উক্তির প্রতিবাদ করিতে আমরা বাধ্য হইতেছি এই কারণে যে, এই উক্তি স্বীকার করিয়া নিলে পাকিস্তানী ও ভারতীয় তমদ্দুন যে এক এবং অবিচ্ছেদ্য এই কথাই মানিয়া নেওয়া হয়। রবীন্দ্রনাথ যে তমদ্দুনের ধারক ও বাহক, তাহা হইতেছে ভারতীয়- যে তমদ্দুনের মূল কথা হইল: শক হুন দল মোগল পাঠান এক দেহে হল লীন এবং যে তমদ্দুন এই উপমহাদেশের মুসলমানদের অভিহিত করে হিন্দু মুসলমান বলিয়া। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই এক প্রবন্ধে এই উপমহাদেশের মুসলমানদের "হিন্দু মুসলমান" বলিয়া অভিহিত করেন।
- তমদ্দুন সম্পর্কে এই যে ধারণা, ইহার সহিত পাকিস্তানী তমদ্দুনের আকাশ পাতাল ব্যবধান রহিয়াছে। বরং বলা যাইতে পারে, একে অপরের সম্পূর্ণ বিপরীত। যে তামুদ্দুনিক স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা, উপরোক্ত বিবৃতি মানিয়া নিলে সে ভিত্তিই অস্বীকৃত হয়। সে কারণে উপরোক্ত বিবৃতিকে আমরা শুধু বিভ্রান্তিকর নয়, অত্যন্ত মারাত্মক এবং পাকিস্তানের মূলনীতির বিরোধী বলিয়াও মনে করি।[৫৬]

বিবৃতিদাতাদের মধ্যে আবুল মনসুর আহমদ, মুহম্মদ বরকতুল্লাহ, ইব্রাহীম খাঁ, আবুল কালাম শামসুদ্দীনের মতো বিদগ্ধ পণ্ডিত, আহসান হাবীব, ফররুখ আহমদের মতো প্রথিতযশা কবিরাও ছিলেন।

বাংলাদেশের এই জাতীয়তাবাদী দ্বন্দ্ব ভারতবর্ষের জাতিগত ইতিহাসের পরিণাম এবং ১৯৬০-এর দশকে পূর্ববাংলায় রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে এই বিরোধ উত্তাপ ছড়ায়। রবীন্দ্রনাথ এখানে ইস্যু বটে, কিন্তু যে সাংস্কৃতিক বিরোধ ভারতবর্ষে ঐতিহাসিক কাল ধরে চলে আসছে, তার ধারাবাহিকতাই এখানে মুখ্য হয়ে দেখা দেয়। রবীন্দ্রনাথ এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরের কবি হলেও তিনি কিন্তু এই বিরোধের মীমাংসা করতে পারেন নি। বিশ্বমানবতার বাণী প্রচার করা সত্ত্বেও ভারতবর্ষের গৃহদাহ তিনি বন্ধ করতে একরূপ ব্যর্থ হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ নিয়ে নিয়েছেন একটি পক্ষ। তার ভাষায় 'লাল টকটকে ফেজ টুপি মাথায় দেয়া'[৫৭]অপরপক্ষ তাই তাকে ছাড় দিতে চায় নি।

---

[৫৬]. আজাদ, ৩০ জুন ১৯৬৭। উদ্ধৃত: গোলাম মুরশিদ, রবীন্দ্র বিশ্বে পূর্ববঙ্গ পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রচর্চা

[৫৭]. স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, 'কালান্তর', রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড। কলকাতা: বিশ্বভারতী, বাংলা ১৪১০

আট

ষাটের দশক থেকে এদেশের রবীন্দ্রানুসারীরা ঔপনিষদিক রবীন্দ্রনাথকে উদার মানবিকতা, আধুনিকতা, চিরায়ত বাঙালি প্রভৃতি মুখোশ ও কৌশলের আকারে লুঙ্গী পরা, কলমা পড়া, নামাজ পড়া বাঙালি মুসলমানের উপর চাপানোর চেষ্টা করছেন। চাপানো সংস্কৃতি আর যাই হোক অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক হতে পারে না। এর একমাত্র উদ্দেশ্য ভারতীয় রাজনীতির পক্ষে এদেশের মানুষের মধ্যে রাবীন্দ্রিক মনোগঠন করা ও মুসলিম জাতীয়তাবাদকে নির্মূল করা। এরা অনেক প্রমত্ত ও শক্তিশালী। ভারতের সমর্থনে এরা উদ্ধতও বটে। তারপরেও রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এদেশের মানুষের দ্বিধা ও ভ্রান্তি কিন্তু ঘোচে নি। কারণ রবীন্দ্রনাথের ঔপনিষদিক আদর্শ, ভারতীয় জাতীয়তাবাদে আস্থা, তার গীতা- মহাভারতভুক্ত জগত ভাবনা এদেশের অধিকাংশ মানুষের বিশ্বাসের সাথে মেলে না। যারা সংস্কৃতির দিক দিয়ে ইসলাম ছেড়ে দিয়েছেন অথবা রাজনীতির দিক দিয়ে ভারতীয় আনুগত্য কবুল করেছেন তাদের কথা অবশ্য আলাদা। কিন্তু অধিকাংশ বাঙালি মুসলমান যারা এখনও ইসলামের মধ্যেই তাদের সংস্কৃতির জগতকে খোঁজেন তাদের জন্য ঔপনিষদিক রবীন্দ্রনাথকে অবিচ্ছেদ্য করে তোলা কঠিন কাজ বৈকি।

সেকুলারিজম বা বাঙালি সংস্কৃতির কথা বলে দেশজ সংস্কৃতি তথা ইসলামপূর্ব, অনৈসলামিক সংস্কৃতিকে বাঙালি মুসলমানের ঐতিহ্য হিসেবে গ্রহণ করার জন্য এখন অবিরত ওকালতি করা হচ্ছে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতের উপনিষদীয় আদর্শের ভাবমূর্তি নিয়ে যে সংস্কৃতির কথা বলেছেন তা কি বাস্তব অর্থে মুসলিম সমাজকে আকৃষ্ট ও আশ্বস্ত করতে পারে? রবীন্দ্রনাথকে সাহিত্যের রস আস্বাদনের আকারে পাঠ করা আর ঐতিহ্যের আকারে গ্রহণ করা এক জিনিস নয়। সেকুলার, আধুনিক বলে পরিচিত পশ্চিমের কথিত রাষ্ট্রগুলো তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ঐতিহ্যের বাইরে কি অন্য কোনো ধর্মাবলম্বীদের ঐতিহ্যকে তাদের মূল স্রোতের অংশ মনে করেন? তাত্ত্বিক বয়ানের আকারে অথবা অযথা বাগাড়ম্বরের আকারে স্বীকার করা হলেও সেখানকার বাস্তবতা কি এসবের পক্ষে প্রামাণ্য কিছু তুলে ধরে? একই কথা ভারতের পক্ষেও প্রবলভাবে সত্য। এমনকি রবীন্দ্রনাথও অন্য ধর্ম-সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে নিজের ঔপনিষদিক সংস্কৃতির সাথে সমন্বয় করতে চান নি।

মরহুম মোতাহের হোসেন চৌধুরী শান্তিনিকেতনে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আপনার লেখায় ইসলাম ও বিশ্বনবী সম্পর্কে কোনো কথা লেখা নেই কেন?' উত্তরে কবি বলেছিলেন, 'কুরআন পড়তে শুরু করেছিলুম। কিন্তু বেশিদূর এগুতে পারিনি। আর

তোমাদের রসূলের জীবনচরিতও ভাল লাগেনি।[৫৮] এই বাস্তবতাটাই এ দেশের রবীন্দ্রানুসারীরা গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক এবং এই অপরিণত বুদ্ধিবৃত্তির স্তরকে যখন আমজনতার উপর তারা রাজনৈতিক কৌশলের কারণে আরোপ করার চেষ্টা করেন সেটি তখন সাম্প্রদায়িকতার মতো ভয়ংকর জিনিস হয়ে ওঠে বৈকি।

বলা হয়ে থাকে রবীন্দ্রনাথ যখন গোরা উপন্যাস লেখেন তখন তার চিন্তাভাবনার উপর একটা উদারনৈতিকতার ছাপ পড়েছিল। এই উপন্যাসের গোরার একটি ডায়ালগ লক্ষ করা যাক:

> গোরা কহিল, "যে অন্যায় সহ্য করে সেও দোষী, কেননা সে জগতে অন্যায়ের সৃষ্টি করে। আমার কথা বুঝবে না। তবু মনে রেখো, ভালোমানুষি ধর্ম নয়; তাতে দুষ্ট মানুষকে বাড়িয়ে তোলে। তোমাদের মহম্মদ সে কথা বুঝতেন। তাই তিনি ভালোমানুষ সেজে ধর্মপ্রচার করেননি।"[৫৯]

এর সরল অর্থ করলে দাঁড়ায় ইসলামের নবী ভালোমানুষ ছিলেন না এবং অন্যায়ের প্রতিরোধ করলেও তিনি যাবতীয় অধর্মের ভিতর দিয়েই তা করেছেন। রবীন্দ্রচিন্তার এই দিকটি আর যাই হোক কোনো ধরনের সাংস্কৃতিক বহুত্ব ও সম্প্রীতিকে সমর্থন করে না। বস্তুত, তত্ত্বের ক্ষেত্রে তিনি অনেক সময় মানবপ্রেমী হলেও জীবনের ক্ষেত্রে তিনি সংস্কারমুক্ত ও উদার হতে পারেন নি। ঋষি, বিশ্বকবি, গুরুদেব প্রভৃতি আখ্যার আড়ালে রবীন্দ্রনাথ ঢাকা পড়ে আছেন।

সংস্কৃতির একটা মানে হতে পারে আত্মপরিচয় বা নিজের আমিত্বকে উচ্চকিত করা। দেশে দেশে, ভাষায় ভাষায় সংস্কৃতির মধ্যে হেরফের আছে। এটা সত্য জীবনের সমাজের চলিষ্ণুতার প্রয়োজনে ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে লেনা-দেনা, আদান-প্রদান হয়ে থাকে। কিন্তু এটাই একমাত্র সত্য নয়। নিজের প্রয়োজনেই আবার ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতিগুলো তাদের আপন আপন বাতি জ্বালিয়ে রাখে। রবীন্দ্রনাথ তার ঔপনিষদিক ভাবাদর্শের ক্যানভাসে যে 'বাঙালি' সংস্কৃতির জগত গড়ে তুলেছিলেন তার মধ্যে বাঙালি মুসলমানের জমিন কতটুকু। শিল্পীর রসবিচারের মাপকাঠিতেই রবীন্দ্রনাথকে আমরা মূল্যায়ন করতে পারি। কিন্তু ঐতিহ্যের শরিক হিসেবে তাকে আমরা গ্রহণ করতে পারি না।

---

[৫৮]. এস মুজিব উল্লাহ, বিতণ্ডা। ঢাকা: সৈয়দ রহমত উল্লাহ, ১৯৮৩

[৫৯]. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'গোরা', রবীন্দ্র রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড। কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৪১০

রবীন্দ্রনাথ, বঙ্গভঙ্গ ও হিন্দু জাতীয়তাবাদ

ব্রিটিশ শাসকরা প্রশাসনিক সুবিধার কথা বলে বঙ্গ ভঙ্গ করেছিলেন। বাঙালি হিন্দু নেতারা সে কথা মানতে অস্বীকার করেন। তাদের কথা হলো— ব্রিটিশরা কুমতলবে বাঙালিদের দু'টুকরো করে দুর্বল করতে চায়। ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হয়। অবশ্য এর আগেও ব্রিটিশরা বাংলার সীমানা নিয়ে কয়েকবার কাটাকুটি করেন। কিন্তু সেই সময় বাঙালি হিন্দুরা তেমন একটা প্রতিক্রিয়া দেখান নি। কারণ তখনকার সীমানা পুনঃনির্ধারণের ফলে পূর্ববাংলার উপর তাদের কর্তৃত্বে হাত পড়ে নি বা তাদের স্বার্থের উপর বড় কোনো ঘা লাগে নি।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ কার্যকর করার পর থেকে কলকাতা কেন্দ্রিক হিন্দু জমিদার ও শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্তের নেতৃত্বে বাঙালি হিন্দুরা এর বিরোধিতা শুরু করেন। তারা একে একে ব্রিটিশ সরকারের কাছে এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে স্মারকলিপি দেন, হরতাল ডাকেন, স্কুল-কলেজ বর্জনের কথা বলেন এবং শেষমেষ ব্রিটিশ পণ্য বর্জনের ডাক দেন। তবে এই আন্দোলনের একটি চরিত্র হলো— এটি ধর্মীয় ভাবাবেগের সাথে একাকার হয়ে পড়ে এবং হিন্দুত্ব ও ধর্মীয় উন্মাদনা বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের আদর্শিক ও আত্মিক প্রেরণা হয়ে ওঠে। দেবীর নামে শপথ, রাখিবন্ধন, অরন্ধন, বন্দে মাতরম সঙ্গীত প্রভৃতি এই আন্দোলনের চরিত্রকে একান্তই সম্প্রদায়গত করে তোলে এবং হিন্দু ধর্মীয় পুনরুত্থানবাদের সাথে জড়িয়ে যায়।

এই আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথ রাজনীতিকদের পাশে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। দিনের পর দিন বক্তৃতা, ভাষণ, লেখালেখি ও শোভাযাত্রা করে এবং প্রবন্ধে, নিবন্ধে, কবিতায়, নাটক আর গানে গানে তিনি একাই বাংলাদেশকে মাতিয়ে তোলেন। ব্যক্তিগতভাবে তিনি এই আন্দোলনে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। তারই প্রস্তাবে এ সময় রাখিবন্ধনকে রাজনৈতিক কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হয় যা সম্পর্কে সেকালের রাজনীতিক সুরেন্দ্রনাথ বলেছিলেন রাখিবন্ধনের ভিতর দিয়ে তারা প্রাচীন ভারতের একটি প্রথার পুনঃপ্রবর্তন করেন।[৬০]

বঙ্গভঙ্গের ফলে প্রধানত বাঙালি হিন্দু জমিদাররা ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। কারণ নতুন পরিস্থিতিতে কলকাতায় বসে পূর্ববাংলার মুসলিম কৃষকদের উপর শোষণ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা অসম্ভব হয়ে উঠবে— এতে তারা যারপরনাই চিন্তিত ছিলেন। উকিলরা তাদের মক্কেল কমে যাওয়ার শংকায় ভুগছিলেন। যাই হোক, বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্বের প্রশ্নে বিরোধ ও মতান্তর থাকলেও এর নেতারা ছিলেন মূলত কৃষকবিরোধী হিন্দু জমিদার, মধ্যসত্বভোগী ও ইংরেজি শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্তরা। এই যে বাঙালি হিন্দু 'ভদ্রলোক' শ্রেণি, এরা আসলে কারা? এই বাঙালি হিন্দুকে কেন্দ্র করেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এদেশে তাদের

---

৬০. সুরজিৎ দাশগুপ্ত, রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ। কলকাতা: দেজ পাবলিশিং, ২০১০

উপনিবেশ খাড়া করেছে। এই বাঙালি হিন্দু ভদ্রলোকরাই উপনিবেশের প্রধান দেশীয় বাহক। বঙ্গভঙ্গের ফলে এই বাঙালি হিন্দুরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। বিশেষ করে পূর্ববঙ্গ ও আসামকে নিয়ে গড়া নতুন প্রদেশে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে, সরকারি সুযোগ-সুবিধা পাবে— এই ভাবনা তাদের মাথা রীতিমতো গুলিয়ে দেয়। শিবাজী প্রতিম বসু সেদিনকার বাঙালি হিন্দু মানসিকতার অবস্থাটা এভাবে তুলে ধরেছেন :

- সবচেয়ে বড় কথা, পূর্ববঙ্গ ও অসমকে নিয়ে গড়া নতুন প্রদেশে মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে আর বাংলার পশ্চিমাংশটি বিহার, ওড়িশার সঙ্গে পূর্ববৎ যুক্ত থাকায় সেখানেও হিন্দু বাঙালিরা সংখ্যালঘুতায় ভুগবে। অতএব, একদিকে ধর্ম, অন্যদিকে ভাষারূপী জিরাফের মধ্যে দাঁড়িয়েই এতদিন দুধেভাতে থাকা শিক্ষিত হিন্দু বাঙালি সহসা মারমুখো হয়ে পড়ল।[৬১]

ব্যাপারটা কিন্তু 'সহসা মারমুখো' হওয়ার ঘটনা ছিল না। এর পিছনে রয়েছে হিন্দু মানস গঠনে সমাজ নেতা, বুদ্ধিজীবী, ধর্মীয়ভাবে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সচেতন চেষ্টা। এ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখের কথা বলা যায় । দীর্ঘ সময় ধরে প্রস্তুত হতে থাকা হিন্দুত্ববাদী মানসভূমি বঙ্গভঙ্গের আগেই যথেষ্ট পরিমাণ উত্তাপ সৃষ্টি করে। বঙ্গভঙ্গের আগেই এক ধরনের বিভাজন তৈরি হয়েছিল। বঙ্গভঙ্গের ফলে আগুনে ঘৃতাহুতি দেয়া হয় মাত্র । সুমিত সরকার লিখেছেন :

- সাধারণভাবে স্বদেশী মেজাজের সঙ্গে অন্তরঙ্গ যোগ ছিল রাজনীতি ও ধর্মীয় পুনরুত্থানবাদের মিলন প্রয়াসের । এটিকে বারবার ব্যবহার করা হয়েছিল সক্রিয় কর্মীদের নৈতিক শক্তিবৃদ্ধি এবং জনসংযোগের প্রধান উপকরণ হিসেবে। সুরেন্দ্রনাথ তাই দাবি করেছিলেন, তিনিই প্রথমে মন্দিরে দাঁড়িয়ে স্বদেশী শপথ নেওয়ার উপায়টি ব্যবহার করেন। জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনার মধ্যেও প্রায়শই প্রবল পুনরুত্থানবাদী অন্তর্বস্তু ছিল, প্রচলিত জাতিভেদ বিধির মাধ্যমে বয়কট বলবৎ করার চেষ্টা হয়। মে ১৯০৬-তে চরমপন্থী নেতারা জেদ ধরেছিলেন, প্রতিমাপূজো সমেত শিবাজী উৎসব করতে হবে। বন্দে মাতরম, সন্ধ্যা বা যুগান্তর-এর পাতায় র‍্যাডিকাল রাজনীতির সঙ্গে আক্রমণমুখী হিন্দুত্ব প্রায়শই অঙ্গাঙ্গী মিশে যেত।[৬২]

অমলেশ ত্রিপাঠী কংগ্রেসী ঐতিহাসিক হিসেবে পরিচিত। তার চোখেও হিন্দু জাতীয়তাবাদের এই ঐতিহাসিক বিকাশ ধারাটা এড়িয়ে যায় নি :

- সনাতন হিন্দু ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা এবং গাঢ় দৃষ্টিতে অতীতে ফিরে তাকানো ছাড়াও চরমপন্থী নেতারা ভারতবর্ষের ইতিহাসকে অভী সিদ্ধির জন্যে নানাভাবে ব্যবহার

---

৬১. শিবাজী প্রতিম বসু, বঙ্গভঙ্গ ২০০৫, সম্পাদক, অর্জুন গোস্বামী। কলকাতা : চয়নিকা, ২০০৫

৬২. সুমিত সরকার, আধুনিক ভারত ১৮৮৫-১৯৪৭। কলকাতাঃ কে পি বাগচী, ২০০৪

করেছিলেন।...অরবিন্দের অনুপ্রাণিত লেখনী থেকে তাই উৎসারিত হয়েছিল গীতার অনবদ্য ভূমিকা, তিলক সাগ্রহে রচনা করেছিলেন 'গীতা-রহস্য' (গীতার একটি পূর্ণাঙ্গ ভাষ্য), লাজপৎ রায়ও উর্দুভাষায় শ্রীকৃষ্ণের জীবনকথা লিখেছিলেন। বাংলায় ব্রহ্মবান্ধবের 'শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব' এবং অশ্বিনীকুমার দত্তের 'ভক্তিযোগ'-এরও মূল প্রেরণা ছিল গীতা। বলাবাহুল্য, এই সমস্ত রচনার উপর বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব ছিল অতি স্পষ্ট, আর এই রচনাগুলির মধ্যে চরমপন্থীদের দ্বারা বৈদিক সংস্কৃতির একটি ইতিহাসসিদ্ধ ব্যাখ্যার প্রচেষ্টাও লক্ষ্য করা যায়।[৬৩]

এই ব্যাপারটা রবীন্দ্রনাথও জানতেন। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলন যে সহসা কোনো ব্যাপার ছিল না, সে সম্পর্কে তিনি লিখেছেন :

- দেশ অন্তরে অন্তরে স্বদেশী ভাবে দীক্ষিত হইয়া আসিতেছিল। এমন সময় পার্টিশন ব্যাপার একটা উপলক্ষ মাত্র হইয়া এই স্বদেশী আন্দোলনকে স্পষ্টরূপে বিকশিত করিয়া তুলিল। বস্তুতঃ বয়কট করার ছেলেমানুষী ইহার প্রাণ নহে।[৬৪]

অমলেশ ত্রিপাঠী লিখেছেন— রবীন্দ্রনাথ শিবাজী উৎসব কবিতা লিখে এই হিন্দু মৌলবাদী চিন্তার পূর্ণতা দিয়েছিলেন।[৬৫]

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন কোনো সেকুলার আন্দোলন ছিল না। যদিও এর নেতারা তখন রাজনৈতিক কৌশলের কারণে সব বাংলাভাষীকে ঐক্যবদ্ধ করার কথা বলেছিলেন। এ আন্দোলন ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয় সংস্কৃতিকে দুর্বল করে দিয়েছিল মাত্র যার পরিণতি দেশভাগ ও সাম্প্রদায়িকতা। নীরদ চৌধুরীর মতে স্বদেশী আন্দোলন হিন্দু পুনরুত্থানবাদ আন্দোলনে পর্যবসিত হয়েছিল এবং এই জাতীয়তাবাদকে তিনি নাৎসীবাদের সাথে তুলনা করেছেন।[৬৬]

ঐতিহাসিক বিপানচন্দ্র যথার্থ লিখেছেন:

- ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয় সংস্কৃতিকে দুর্বল করার কাজে একধরনের মহাপুরুষ সৃষ্টি— রানা প্রতাপ, শিবাজী, গুরুগোবিন্দ সিংহ ইত্যাদি যাঁরা মধ্যযুগে মোঘল শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন তাঁদের সম্বন্ধে উপকথা রচনা— অন্য যে কোনো মতবাদের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। এক কলমের খোঁচায়, প্রায় স্বতঃসিদ্ধরূপে এই ধরনের মহাপুরুষ— পুরাণ দ্বিজাতিতত্ত্ব বা মূল সাম্প্রদায়িক

---

৬৩. অমলেশ ত্রিপাঠী, ভারতের মুক্তি সংগ্রামের চরমপন্থী পর্ব। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৬

৬৪. প্রশান্তকুমার পাল, রবীজীবনী, পঞ্চম খণ্ড, ১৯০১-১৯০৮। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০২

৬৫. অমলেশ ত্রিপাঠী, ভারতের মুক্তিসংগ্রামের চরমপন্থী পর্ব

৬৬. Nirad C. Chaudhury, The Autobiography of an Unknown Indian. Bombay: Jaico Publishing House, 1994

> দৃষ্টিভঙ্গির যাথার্থ্য প্রমাণ করে দিয়েছিল। কী হিসেবে এরা 'জাতীয়' নায়ক, এদের সংগ্রাম কী অর্থে 'জাতীয়' সংগ্রাম? এরা বিদেশীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত ছিলেন বলে? কী অর্থে মোঘলরা বিদেশী? তাঁরা মুসলমান ছিলেন বলে? রানা প্রতাপ, শিবাজী এবং গুরুগোবিন্দ সিংহের 'জাতীয়তাবাদের' ঐক্যসূত্র কী ছিল? তাঁরাতো হিন্দু বা অ-মুসলমান ছিলেন। এভাবে মহাপুরুষ-পুরাণগুলো স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি করেছিল।[67]

মুসলমানরাও বুঝতে পারেন নি মারাঠা বা শিখ সরদার কেন বাঙালি জাতির আদর্শ হবেন। বিশ শতকের গোড়ায় ইসলাম প্রচারক পত্রিকায় মৌলভী ওসমান আলী বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন এই বলে যে, এত বিদ্যাবুদ্ধি নিয়ে বাঙালি হিন্দু শেষে মারাঠা দস্যু দলপতির ভক্ত হয়ে পড়ল। ১৯০৫-এর ১০ ফেব্রুয়ারি সোলতান পত্রিকা আরো আশঙ্কা প্রকাশ করে এখন থেকে শিখগুরু গোবিন্দ সিংকেও নিয়মিত পূজা করা হবে।[৬৮]

রবীন্দ্রনাথ নিজেও শিখগুরুকে নিয়ে বন্দীবীর নামে একটি কবিতা লেখেন। সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথ 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে ভারত ও হিন্দুত্বকে সমার্থক বলেও দাবি করেন :

- হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খ্রিষ্টান ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে পরস্পর লড়াই করিয়া মরিবে না— এইখানে তাহারা একটা সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাইবে। সেই সামঞ্জস্য অহিন্দু হইবেনা, তাহা বিশেষভাবে হিন্দু। ... হিন্দু ধর্ম কি প্রত্যেককে প্রতিদিনই, এই আমাদের দেবতার বিহারস্থল, প্রাচীন ঋষিদিগের তপস্যার আশ্রম, পিতৃপিতামহের মাতৃভূমি ভারতবর্ষের সহিত প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে ভক্তির বন্ধনে বাঁধিয়া দিতে পারিবে না?[৬৯]

রবীন্দ্রনাথের তখন এমন অবস্থা যে তার কল্পনায় ভারত বলতে তপোবন, প্রাচীন ভারতের ঋষিদের জীবনধারা আর প্রাচীন ভারতের ভাবাদর্শই একমাত্র আদর্শ হয়ে উঠেছে। এটা ছাড়া মুক্তি নেই, স্বাধীনতা নেই, অবমাননা থেকে নিষ্কৃতি নেই। পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন:

- ১৯০১ থেকে ১৯০৬ রবীন্দ্রনাথের সামাজিক-রাজনৈতিক রচনাবলীতে স্পষ্ট পুনরুত্থানবাদী অভিমত প্রকাশ পেল। ১৮৮২- ৮৫-তেও এটা ঘটেছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতা থেকে প্রাচ্য সভ্যতার পার্থক্য ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা রবীন্দ্রনাথ বললেন, রাষ্ট্র নয়, ঐতিহ্যবাহী সমাজই ভারতীয় জীবনের প্রকৃত কেন্দ্র বলে অভিহিত হল। হিন্দু অতীতকে কাব্যময় ভাষায় জাগিয়ে তোলা হল, বাল্যবিবাহকে, বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে নিয়ন্ত্রণকে হিন্দু সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে অযৌক্তিক বলা হল না। জাতি, বর্ণ

---

৬৭. বিপানচন্দ্র, আধুনিক ভারত ও সাম্প্রদায়িকতাবাদ। কলকাতা: কে পি বাগচী, ১৯৮৯

৬৮. অলককুমার, 'বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধের শতবর্ষ', পরিকথা (কলকাতা), মে, ২০০৫

৬৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'স্বদেশী সমাজ', রবীন্দ্র রচনাবলী, ২য় খণ্ড। কলকাতা: বিশ্বভারতী, বাংলা ১৪১০

> এমনকি সতীদাহর মধ্যেও ১৯০৪-এর মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ যাথার্থ্য দেখতে পেলেন। রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক আদর্শ একটি প্রোগ্রামের রূপ পেতে লাগল। মেলা, বক্তৃতার মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে ঐতিহ্যবাহী সমাজের পুনর্জীবনের জন্য তিনি বললেন হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু সমাজেই ভারতীয় ঐক্যকে বিধৃত করবে।[৭০]

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের ভিতর দিয়ে বাঙালি হিন্দুদের ভিতরে এক ধরনের রাজনৈতিক জাগরণ ঘটে অবশ্যই। এই আন্দোলন একসময় ব্রিটিশ বিরোধী হয়ে ওঠে এবং অসংখ্য তরুণ বাঙালি হিন্দু, হিন্দুধর্ম থেকে প্রেরণা পেয়ে বীরত্ব, সাহসিকতা ও ত্যাগের দৃষ্টান্ত রাখেন। আম মুসলমানরা এ আন্দোলনে জড়ান নি। যে দু'-একজন মুসলমান নেতা এ আন্দোলনে জড়িয়েছিলেন কিংবা হিন্দুরা মুখরক্ষার জন্য রেখেছিলেন তাদের পিছনে গণমানুষের সমর্থন ছিল না।

১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হয়ে যায়। এই রদ হওয়ার পিছনে হিন্দু জমিদার মহাজনদের চাপ কতটা ছিল, ব্রিটিশদের যুক্তিপ্রণালী কতটা ছিল, আর মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদের প্রতিক্রিয়া কতটা ছিল, সেসব হিসেবের মধ্যে না নিয়েও বলা যায় বাংলাভাষীরা কিন্তু বিভক্ত হয়ে গেলেন। বঙ্গভঙ্গ বাতিল হলেও মনোভঙ্গকে আর ঠিক মেলানো যায় নি। হিন্দু ও মুসলিম জাতীয়তাবাদ দুই রাস্তা ধরে চললো।

জেল থেকে বের হয়ে এই আন্দোলনের নেতা অরবিন্দ ঘোষ প্রত্যক্ষ রাজনীতি ছেড়ে দিয়ে পন্ডিচেরীতে সন্ন্যাসী হয়ে চলে যান। এই আন্দোলনের আরেক নেতা বিপিনচন্দ্র পাল ইংল্যান্ডে যান এবং সেখানে ১৯১১ সালে ঘোষণা করেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীন সমমর্যাদাসহ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারই হলো ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্খার সর্বোত্তম সমাপণ। এই আন্দোলনের সবচেয়ে সৃষ্টিশীল প্রতিভাধর নেতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হঠাৎ করে আন্দোলন থেকে সটকে পড়েন এবং ক্লান্তিহীন ভাষায় বলতে থাকেন :

> ভারতবর্ষের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে ঐক্য স্থাপনের সহযোগিতাই হলো আত্মপ্রতিষ্ঠালাভের প্রকৃত পন্থা; এ পথেই বিশ্বমানবের ঐক্য এবং অভিন্নতার আদর্শের বাস্তব রূপায়ণ সম্ভব।[৭১]

বোঝাই যাচ্ছে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে ধূর্ত ইংরেজ খুব ভালো মতো ভাঙ্গন ধরাতে পেরেছিলো এবং নেতা-কর্মীদের মধ্যে সংশয় ও বিভ্রান্তি তৈরিতে সফল হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ যে স্বদেশী আন্দোলন থেকে সরে এসেছিলেন এ নিয়ে নানা জন নানা কথা বলেছেন। ব্রিটিশের ভূমিকার কথাও এসেছে। রবীন্দ্রনাথ আন্দোলনে থাকাকালে অসংখ্য কবিতা-গান লিখেছেন,

---

[৭০]. পার্থ প্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, উপন্যাসের রবীন্দ্রনাথ। কলকাতা: এবং মুশায়েরা,২০১০

[৭১]. অরবিন্দ পোদ্দার, রবীন্দ্রনাথ : রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। কলকাতা: প্রত্যয়, ১৯৯৯

যা অসংখ্য তরুণদের ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করেছে। একটি কবিতার একাংশ :

উদয়ের পথে শুনি কার বাণী
ভয় নাই, ওরে ভয় নাই;
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।

স্বদেশী আন্দোলনের নেতা ঋষি অরবিন্দ ঘোষ জেল থেকে মুক্তি পাবার পর রবীন্দ্রনাথ উল্লসিত হয়ে তাকে নিয়ে নমস্কার কবিতাটি লেখেন :

...দেবতার দীপ হস্তে যে আসিল ভবে
সেই রুদ্র দূতে, বলো, কোন রাজা কবে
পারে শাস্তি দিতে; বন্ধন শৃঙ্খল তার
চরণ বন্দনা করি করে নমস্কার ...

এই কবি আন্দোলন ছেড়ে দেয়ার পর স্বদেশী আন্দোলনের কর্মীদের চরিত্র হনন করতে শুরু করেন এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সহযোগিতায় বিশ্ব মানবতার ঐক্য ও অভিন্নতার আদর্শ দেশে দেশে প্রচারে ঝাঁপ দিয়ে পড়েন। স্বদেশী আন্দোলনের বিরোধিতা করে লেখা রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' উপন্যাস পড়ে সে সময় এক স্বদেশী কর্মী লিখেছিলেন :

> রবীন্দ্রনাথ একজন স্বদেশী প্রচারককে নায়ক করিয়া তাহারই মস্তকে পরস্ত্রী-হরণ প্রচেষ্টার আরোপ করিয়া আপন লেখনী মসিলিপ্ত করিলেন, এ দুঃখ প্রাণে বাজিল।... তিনি স্বদেশীর সর্ব্ব কার্য্যই দোষদুষ্ট বলিয়া বাহবা লইয়াছেন।[৭২]

অনেকে বলে থাকেন 'ঘরে বাইরে' ও 'গোরা' উপন্যাস লেখার পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের চিন্তার পরিবর্তন ঘটেছিল। হতে পারে। তবে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাভাবনার কোনো স্থিরতা ছিল না। তিনি ঘন ঘন মত বদলাতেন এবং সময় ও সুযোগের সাথে তাকে দ্রুত মানিয়ে নেয়ার চেষ্টা করতেন। স্বদেশী আন্দোলন ছেড়ে দেয়ার পর তিনি এর অন্তর্নিহিত সাম্প্রদায়িকতার নিন্দা করলেন। ভালো কথা। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনে তার ভূমিকার জন্য তিনি কি অনুতপ্ত হয়েছিলেন? আন্দোলনের পক্ষে তার লেখালেখি কি তিনি প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন? এই পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ হিন্দু-মুসলমানের সমস্যা গভীরভাবে বোঝার চেষ্টা করেছিলেন। সেসব কথা পড়লে মন স্পর্শ করে। একটা উদাহরণ দিই :

[৭২]. অর্চনা, আষাঢ়, ১৩২৩। উদ্ধৃত : সন্দীপন সেন, রাজনীতির রুদ্ধ দ্বার ও রবীন্দ্রনাথ। কলকাতা: অনুষ্টুপ, ২০১৫

- আজ আমরা সকলেই এই কথা বলিয়া আক্ষেপ করিতেছি যে, ইংরেজ মুসলমানদিগকে গোপনে হিন্দুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া দিতেছে।কথাটা যদি সত্যিই হয় তবে ইংরেজের বিরুদ্ধে রাগ করিব কেন। দেশের মধ্যে যতগুলি সুযোগ আছে ইংরেজ তাহা নিজের দিকে টানিবে না, ইংরেজকে আমরা এতবড়ো নির্বোধ বলিয়া নিশ্চিত হইয়া থাকিব এমন কী কারণ ঘটিয়াছে। মুসলমানকে যে হিন্দুর বিরুদ্ধে লাগানো যাইতে পারে এই তথ্যটাই ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। কে লাগাইল সেটা তত গুরুতর বিষয় নয়। শনিতো ছিদ্র না পাইলে প্রবেশ করিতে পারে না; অতএব শনির চেয়ে ছিদ্র সম্বন্ধেই সাবধান হইতে হইবে। আমাদের মধ্যে যেখানে পাপ আছে শত্রু সেখানে জোর করিবেই— আজ যদি না করে তো কাল করিবে। এক শত্রু যদি না করে তো অন্য শত্রু করিবে— অতএব শত্রুকে দোষ না দিয়া পাপকেই ধিক্কার দিতে হইবে।...
- আমরা জানি বাংলাদেশের অনেক স্থানে এক ফরাশে হিন্দু-মুসলমানে বসে না— ঘরে মুসলমান আসিলে জাজিমের এক অংশ তুলিয়া দেওয়া হয়। মানুষকে ঘৃণা করে যে দেশে ধর্মের নিয়ম, প্রতিবেশীর হাতে জল খাইলে যাহাদের পরকাল নষ্ট হয়, পরকে অপমান করিয়া যাহাদিগকে জাতি রক্ষা করিতে হইবে, পরের হাতে চিরদিন অপমানিত না হইয়া তাদের গতি নাই। তাহারা যাহাদিগকে ম্লেচ্ছ বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছে সেই ম্লেচ্ছর অবজ্ঞা তাহাদিগকে সহ্য করিতে হইবেই।
- কোন বিখ্যাত স্বদেশী প্রচারকের নিকট শুনিয়াছি, পূর্ববঙ্গে মুসলমান শ্রোতারা তাহাদের বক্তৃতা শুনিয়া পরস্পর বলাবলি করিয়াছে যে, বাবুরা বোধকরি বিপদে ঠেকিয়াছে। ... উদ্দেশ্য সাধনের উপলক্ষে প্রেমের সম্বন্ধ পাতাইতে গেলে ক্ষুদ্র ব্যক্তির কাছেও তাহা বিস্বাদ বোধ হয়।...[৭৩]

স্বদেশী আন্দোলনের আগে ও পরের রবীন্দ্রনাথ কিন্তু ভিন্ন এবং স্ববিরোধীও বটে । এই স্ববিরোধিতার বৈশিষ্ট্য তার ব্যক্তিত্বের অন্যতম লক্ষণ এবং এটি তার জীবনব্যাপী প্রবাহিত। এই ধরনের ব্যক্তি বিপজ্জনকও বটে। কারণ রবীন্দ্রনাথের মতো প্রভাবশালী ব্যক্তির এই স্ববিরোধী চরিত্র জনসমাজে প্রভাব ফেলে, মানুষ বিভ্রান্ত হয় ও খাদে পড়ে যেতে পারে।

তিনি এক এক সময় ভারতকে হিন্দুত্বের সমার্থক হিসেবে দেখেছেন আবার পরমূহুর্তে ভারতবর্ষকে ধর্মনির্বিশেষে সকলের দাবি করেছেন। জালিয়ান ওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তিনি ব্রিটিশের দেয়া নাইটহুড ত্যাগ করেন কিন্তু হত্যাকাণ্ডের জায়গায় একটি স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠার তিনি বিরোধিতা করেন এই যুক্তিতে যে এটি ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়াবে। বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার পর কৃতজ্ঞ ও রাজভক্ত কবি রবীন্দ্রনাথ ব্রিটিশ সরকারের অনুরোধে সম্রাট

---

৭৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ব্যাধি ও প্রতিকার', রবীন্দ্র রচনাবলী, ৫ম খণ্ড। কলকাতা:বিশ্বভারতী, বাংলা ১৪১০

পঞ্চম জর্জের অভিষেক উপলক্ষ্যে প্রশস্তিমূলক 'জনগণমন অধিনায়ক' গানটি রচনা করেন।[৭৪] এটি বর্তমানে ভারতের জাতীয় সংগীত। এই গানের সমালোচনা হলে রবীন্দ্রনাথ তখন বলেন, তিনি নাকি জনগণমন অধিনায়ক বলতে পঞ্চম জর্জকে বোঝান নি, অন্তর্যামীকে বুঝিয়েছেন।[৭৫]

রবীন্দ্রনাথের এই ভূমিকা জনমানসে কি বার্তা দিয়েছে? এটি বিভ্রান্তি বাড়িয়েছে এবং সুবিধাবাদীরা তাকে ইচ্ছেমতো ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্রনাথের এই স্ববিরোধিতায় সেকালের দেশনেতা সুভাষচন্দ্র বসু ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। স্বদেশী আন্দোলন ছেড়ে দেওয়ার পর রবীন্দ্রনাথ যখন দেশে দেশে ব্রিটিশের সহযোগিতায় বিশ্ব মানবতার তত্ত্ব প্রচার করে বেড়াচ্ছেন তখন সুভাষ বসু লিখেছিলেন :

- রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রানুসারীদের জীবনে ও সাহিত্যে... শূন্যগর্ভ, অগভীর আন্তর্জাতিকতাবাদের স্ফুরণ দেখা যায়।[৭৬]

এ প্রসঙ্গে আমরা স্মরণ করতে পারি যে সুভাষ যার ভক্ত ছিলেন সেই বিবেকানন্দও রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে 'যৌনতার বিষ' বলে বর্ণনা করেছিলেন।[৭৭] সুভাষবসুর আরেক গুরু চিত্তরঞ্জন দাসও রবীন্দ্রনাথের এই দোদুল্যমানতাকে নিন্দা করেছেন।[৭৮]

যাহোক, রবীন্দ্রনাথের এসব ঘটনার বিরোধিতা করায় সুভাষের সাথে তার সম্পর্ক একসময় তলানীতে যেয়ে পৌঁছেছিল। রবীন্দ্রনাথ তখন রেগে গিয়ে সুভাষ বসুকে Spoilt Child বলে গালমন্দ করেছিলেন। কিন্তু Spoilt Child সুভাষ বসুর পর্যালোচনায় যুক্তি ছিল না এমন বলা সম্ভব নয়। তাছাড়া জাতীয়তাবাদ চিন্তায় রবীন্দ্রনাথের দোদুল্যমানতা, অস্পষ্টতা ও স্ববিরোধিতা এত স্পষ্ট যে দার্শনিক সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনও সেটা বলতে বাধ্য হয়েছিলেন : তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা পরস্পর বিরোধী। কোনো জায়গায় জাতীয়তাবাদী আবার কোথাও জাতীয়তাবাদ বিরোধী।[৭৯]

রবীন্দ্রনাথের এই স্ববিরোধিতা তার ভক্তদের মধ্যেও দৃশ্যমান। আমাদের দেশের রবীন্দ্রপূজারীরা তাকে বাঙালি জাতীয়তাবাদের আইকন হিসেবে মানেন। স্বদেশী আন্দোলন থেকে বেরিয়ে আসার পর রবীন্দ্রনাথ সব ধরনের জাতীয়তাবাদের নিন্দা করেছিলেন। তিনি

---

৭৪. কৃষ্ণা দত্ত ও অ্যান্ড্রু রবিনসন, রবীন্দ্রনাথ টেগোর দি মিরিয়াড মাইন্ডেড ম্যান। নিউদিল্লি: রূপা অ্যান্ড কোম্পানি, ২০০০

৭৫. প্রশান্তকুমার পাল, রবিজীবনী, ষষ্ঠ খণ্ড। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৯৯ বঙ্গাব্দ

৭৬. অলকরঞ্জন বসু চৌধুরী, পলিটিকসের ধূলিচক্রে রবীন্দ্রনাথ। কলকাতা: ভাষাবিন্যাস,১৯৯৯

৭৭. কৃষ্ণা দত্ত ও অ্যান্ড্রু রবিনসন, রবীন্দ্রনাথ টেগোর দি মিরিয়াড মাইন্ডেড ম্যান

৭৮. সন্দীপন সেন, রাজনীতির রুদ্ধদ্বার ও রবীন্দ্রনাথ

৭৯. অরুনকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র সমীক্ষা। কলিকাতা: এ মুখার্জী অ্যান্ড কোঃ প্রাঃ লিঃ, বাংলা ১৩৬৮

জাতীয়তাবাদকে বলেছিলেন ভৌগলিক অপদেবতা। তিনি আরো বলেছিলেন দেশপ্রেম আসলে হলো দানবীয় লোভের পূজার উপাচার আর জাতীয়তাবাদ এক মারাত্মক দুষ্ট ব্যাধি।[৮০]

এদেশের বাঙালি জাতীয়তাবাদীরা বাঙালি জাতীয়তাবাদের নামে যা করছেন বা অতীতে করেছেন তাকে কি কোনোভাবে 'রবীন্দ্রনাথের আলোয়' ব্যাখ্যা করা যায়? রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী আন্দোলন থেকে বের হয়ে আসার পর ঐ আন্দোলনের সাম্প্রদায়িকতা ও সশস্ত্র পন্থার নিন্দা করেছেন। এদেশের বাঙালি জাতীয়তাবাদ তো সশস্ত্র পন্থায় প্রতিষ্ঠিত। ঐ সশস্ত্র জাতীয়তাবাদ কি রবীন্দ্রনাথ সমর্থন করতেন? হিন্দু জাতীয়তাবাদী স্বদেশী আন্দোলনের পক্ষে রবীন্দ্রনাথের লেখা গানগুলোকে এদেশের সেকুলার বাঙালি জাতীয়তাবাদীরা কীভাবে হজম করলেন, আর কীভাবেই বা অনুমোদন করলেন ক্ষুদিরাম, সূর্যসেনদের অভীষ্ট জাতীয়তাবাদকে যা একসময় রবীন্দ্রনাথ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

শেষ কথা হলো রবীন্দ্রনাথের এই স্ববিরোধিতার জন্য তাকে গ্রহণ করার চেয়ে ব্যবহার করেছেন অনেকে। এই কারণেই স্বদেশী আন্দোলনের এত বড় ঘটনার পর তিনি যখন ঐ আন্দোলন ছেড়ে দেন এবং এর দুর্বলতার কথা বলতে থাকেন তখন সেসব কথা মানুষ গ্রহণ করে নি। তার 'সুবচন' জনগণের মধ্যে কোনো ইতিবাচক প্রভাব ফেলে নি। বরং আন্দোলনে তার এককালীন হিন্দু জাতীয়তাবাদী ভূমিকাই বাঙালি হিন্দুরা গ্রহণ করেছেন, আন্দোলন ছেড়ে দেয়ার পর তার সমন্বয় ভাবনাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং পূর্বেকার হিন্দু জাতীয়তাবাদী ভূমিকা ভারতবর্ষে প্রধান হয়ে গেছে এবং বিজয়ী হয়েছে। ভারতবর্ষে যে হিন্দু জাতীয়তাবাদের রমরমা দেখি তাতে রবীন্দ্রনাথের দায় মোটেই কম নয়। আন্দোলনে বাতাস দেয়ার পর সেখান থেকে সটকে পড়ায় দায়মুক্তি পাওয়া যায় না।

আসলে ১৯০৫-এর প্রথম বঙ্গভঙ্গের সময়ই ১৯৪৭-এর দ্বিতীয় বঙ্গভঙ্গের বীজ বোনা হয়ে গিয়েছিল। নীরদ চৌধুরী ঠিকই বলেছেন :

- The Bengali Hindu has been as right in 1947 as he was in 1905.[৮১]

অর্থাৎ দুই ক্ষেত্রেই বাঙালি হিন্দুরা নিজেদের স্বার্থ সুরক্ষা ছাড়া কিছু চায় নি । আদর্শ হচ্ছে ফাঁকা বুলি। পরবর্তীকালে জয়া চ্যাটার্জী লিখেছেন :

- বাংলার হিন্দু ভদ্রলোকদের ক্রম-ক্ষয়িষ্ণু ক্ষমতা, ধন-সম্পদ ও মর্যাদা হুমকির সম্মুখীন হওয়ায় তারা সামাজিক অবস্থান অক্ষুণ্ন রাখার লক্ষ্যে কূট-কৌশল অবলম্বন করে এবং নিজেদের কাজের যৌক্তিকতা হিসেবে বিভিন্ন ভাবাদর্শকে ব্যবহার করে।[৮২]

---

৮০. রামচন্দ্র গুহ: 'ইন্ট্রোডাকশন', রবীন্দ্রনাথ টেগোর: ন্যাশনালিজম। নিউদিল্লি: পেঙ্গুইন বুকস, ২০০৯

৮১. Nirad C. Chaudhury, The Autobiography of an Unknown Indian.

৮২. জয়া চ্যাটার্জী, বাঙলা ভাগ হল। ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০৩

১৯০৫-এ হিন্দুদের বিভাজন বিরোধী অবস্থান, ১৯৪৭-এ তারা বিভাজনপন্থী — এর একটিই লক্ষ্য— নিজেদের সুযোগ-সুবিধা অক্ষুণ্ন রাখা । সেই উদ্দেশ্য সাধন করতে তারা বিভিন্ন ভাবাদর্শকে ব্যবহার করে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অবস্থান গ্রহণ করেছে। ১৯৪৬-এর নির্বাচনে মুসলিম লীগের জয় তাদেরকে আতঙ্কে ফেলে দেয়। সম্ভবত এই জয়ের কথা গোড়াতেই অনুমান করে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তার ডায়রিতে লিখেছিলেন যে ভারতের কোনোও প্রান্তে ইসলামের পতাকা উড়বে এটা মেনে নেওয়া যায় না।[৮৩] অথচ দোষ দেয়া হয় কাদের? অনিবার্যভাবে মুসলমানদের। সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় আরো লিখেছেন :

> আজও পশ্চিমবঙ্গে প্রচারের ধারাটা এমন যে মুসলমানরা পাকিস্তান চাইল বলেই দেশ ভাগ হয়ে গেল। তাদের জানা থাকেনা যে পাকিস্তানের আগে মুসলমানরা চেয়েছিলেন মর্যাদা নিয়ে বাঁচার অধিকার। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার। সে অধিকার স্বীকার করা হয়নি বলেই, ওঠে পাকিস্তানের দাবি।[৮৪]

সাম্প্রদায়িকতার আধুনিক ইতিহাস চর্চায় আজও একটি গুরুত্বপূর্ণ ফাঁক থেকে গেছে। দেশী-বিদেশী ঐতিহাসিকদের অধিকাংশই ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যেই সাম্প্রদায়িক প্রবণতা খুঁজে পেয়েছেন। তুলনামূলকভাবে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার উল্লেখ ও বিশ্লেষণ কম। এর মূলে আছে একটি পুরানো ধারণা (Paradigm)। তা হলো— ভারতীয় জাতীয়তাবাদ, যা হিন্দুত্বের রসে নিষিক্ত, একটি অভ্রান্ত, অলঙ্ঘ্য, অখণ্ড ধারণা। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, অঞ্চল নির্বিশেষে এই জাতীয়তাবাদ সব ভারতবাসীর ওপর সমানভাবে পরিব্যপ্ত। কোনো জনগোষ্ঠী বা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আশা-আকাঙ্খা, প্রেরণা ও অভিব্যক্তির মধ্যে এই ধারণার সামান্যতম বিচ্যুতি দেখলেই তাকে সাম্প্রদায়িকতা, বিচ্ছিন্নতাবাদ প্রভৃতি অভিধায় ভূষিত করে ধিক্কারে জর্জরিত করা হয়।[৮৫]

১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের সময় রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকলে কোন পক্ষে থাকতেন? অনুমান করি গান্ধী-নেহরু-শ্যামাপ্রসাদের পক্ষেই থাকতেন। ভারতকে ঐক্যবদ্ধ রাখার শেষ প্রয়াস হিসেবে জিন্নাহ্ কেবিনেট মিশন প্রস্তাবকে গ্রহণ করেন। কিন্তু নেহরু সেটি বাতিল করেন। রবীন্দ্রনাথ কি জিন্নাহর পাশে দাঁড়িয়ে নেহরুর নিন্দা করতেন? অনুমান করি তিনি নেহরুর সাথেই থাকতেন। এই অনুমানের কারণ হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ মোটের উপর নেহরু গান্ধীর রাজনীতিতেই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তিনি নিজেও একটা সময় পর্যন্ত কংগ্রেসের রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন । কবি নিজেই বলেছেন, কংগ্রেসের বিরোধী পক্ষে যোগ দিতে

---

[৮৩]. সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইতিহাসের দিকে ফিরে: ছেচল্লিশের দাঙ্গা। কলকাতা: উৎস মানুষ, ১৯৯৩

[৮৪]. প্রাগুক্ত

[৮৫]. অঞ্জন গোস্বামী, ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে হিন্দু-মুসলমান। কলকাতা: চিরায়ত প্রকাশন, ১৯৯৫

পারিনা।[৮৬]যে রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদের নিন্দা করেও ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষপাতী ছিলেন, তিনি আর যাই হোক জিন্নাহর পক্ষে দাঁড়াতে পারতেন না। দেখা যাচ্ছে, শ্যামাপ্রসাদের রাজনীতিটাই সবাই করেছেন। রবীন্দ্রনাথ করেছেন বিশ্ব মানবতার মুখোশে, গান্ধী করেছেন অহিংসার মুখোশে, আর নেহরু করেছেন সেকুলারিজমের মুখোশে। যে মুখোশই ব্যবহার করেন না কেন শেষ পর্যন্ত শ্যামাপ্রসাদের রাজনীতিটাই বিজয়ী হয়েছে ১৯০৫-এ, ১৯৪৭-এ ও পরবর্তীতে এবং আজও তার ধারাবাহিকতা চলছে।

ক্ষমতার রাজনীতির খেয়োখেয়িতে বাঙালি মুসলমান নেতারা ১৯৭১-এ এসে বললেন দ্বিজাতিতত্ত্ব মিথ্যা। তার মানে একজাতিতত্ত্ব ঠিক। শ্যামাপ্রসাদের রাজনীতিই ঠিক। শ্যামাপ্রসাদের পক্ষের রাজনীতি করতে যেয়ে বাঙালি মুসলমান নেতারা পুনরায় পূর্ববাংলাকে ভারতীয় রাজনীতির শিকলে বন্দী করে ফেললেন। এই শিকলবন্দী পূর্ববাংলার রাজনীতিকে আজাদির তাৎপর্য দেয়া হলো। যেমন রবীন্দ্রনাথ একসময় ব্রিটিশ শাসনকে বলেছিলেন ঈশ্বরের শাসন। ঠিক এই জায়গায় এসে রবীন্দ্রনাথ আজকের বাংলাদেশের জন্য প্রাসংগিক হয়ে উঠেছেন।

[৮৬]. প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র জীবনী। কলকাতা : বিশ্বভারতী, বাংলা ১৪২০

রবীন্দ্র বিতর্ক

এক

ওপার বাংলার দেশ পত্রিকা একবার লিখেছিল রবীন্দ্রনাথ ছাড়া বাঙালি হওয়া যায় না।[৮৭] বাঙালিত্ব অর্জনের পূর্ব শর্ত হিসেবে একজন কবিকে জানার এই বাধ্যবাধকতার ধারণা একেবারে নতুন। আমরা বাংলা ভূখণ্ডে বাস করি, বাঙলা ভাষায় কথা বলি এটাই কি বাঙালি হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়? দেশ পত্রিকার জুড়ে দেয়া এই অতিরিক্ত শর্ত আমাদের বাঙালিত্ব অর্জনের বৈশিষ্ট্যকে আরো শক্ত করে দিল।

একটা ভাষায় এক বা একাধিক বড় কবি থাকেন। এদের কবিতা, চিন্তাভাবনা ঐ নির্দিষ্ট ভাষার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ঠিক এই কারণে একজন কবি একটি নির্দিষ্ট ভাষাভাষীর জাতিত্বের সমার্থক হয়ে উঠবেন এরকম কালাপাহাড়ী দাবি কেউ কখনো করেন নি।

জন্মগতভাবে ব্রিটেনের অধিবাসীরা ইংরেজি ভাষী। কিন্তু অনেক ব্রিটিশ আছেন যাদের শেক্সপিয়ার সম্বন্ধে কোনো জানাশোনা নেই। তাই বলে তাদের ব্রিটিশ হওয়া থেকে কেউ খারিজ করতে পারেন নি। একই কথা খাটে সেই সব আমেরিকানদের সম্পর্কে যারা ওয়াল্ট হুইটম্যান সম্বন্ধে তেমন কিছু জানেন না কিংবা সেইসব জার্মানদের সম্বন্ধে যারা গ্যয়টে সম্পর্কে একপ্রকার অজ্ঞ। বাংলাদেশের দিক থেকে যদি বলি রবীন্দ্রনাথের আগে যারা জন্মেছেন, যারা বাঙলা ভাষার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন তাদের স্থান তাহলে কোথায় হবে? আলাওল, আব্দুল হাকিম, সৈয়দ সুলতান এরা কি তবে বাঙালি নন? এরাতো রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কিছু জানতেন না। এইভাবে রবীন্দ্রনাথকে বাঙালিত্ব বা বাঙালি জাতীয়তাবাদের সাথে সমার্থক হিসেবে দেখানোর একটা সমস্যা হচ্ছে এতে করে বাঙালিত্বের বৃহৎ পরিসর অনেক সংকুচিত হয়ে যায়। যেমন করে উনিশ শতকে কোনো কোনো হিন্দু সমাজপতি ও বুদ্ধিজীবীরা হিন্দুত্বের সঙ্গে বাঙালিত্বকে গুলিয়ে ফেলেছিলেন।

বাংলাদেশের দিক দিয়ে বরাবর একটা রবীন্দ্র বিতর্ক আছে। বাংলাদেশকে বুঝতে হলেও রবীন্দ্র বিতর্কের ধারাটা আমাদের বোঝা জরুরি। এই যে বিতর্ক এর জন্য কবি স্বয়ং নিজেই দায়ী। এটা সত্য, সাহিত্যের বিচার মূলত রসের বিচার । রবীন্দ্র সাহিত্যের আলোচনা হওয়া উচিত নান্দনিক পটভূমিতেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কোনো অবতার নন। মানবীয় দুর্বলতা ও সবলতার সব সমন্বয় ঘটেছিল তার জীবনে। এই জন্য তার সাহিত্য বিচার করতে যেয়ে সমকালীন রাজনীতি- সংস্কৃতির ধারা তাকে কীভাবে প্রভাবিত করেছিল তার বিচারও

[৮৭]. দেশ (কলকাতা), ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০০১

অপরিহার্য হয়ে যায়। সেই পটভূমিতেই রবীন্দ্রনাথের অনেক ভূমিকাকে মনে হয় বিতর্কিত, যা পূর্ব বঙ্গের মুসলমানদের কাছে সবসময় গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে।

রবীন্দ্র বিতর্ক আমাদের দেশে গত শতকের ষাটের দশকে রীতিমতো রাজনৈতিক চরিত্র অর্জন করে। এদেশে যারা ইসলামকে বাদ দিয়ে সেকুলার ও সমন্বয়ী বাঙালি জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা করতে চান, রবীন্দ্রনাথ তাদের প্রতীকে পরিণত হন। এদেশে মুসলিম জাতীয়তাবাদের যে ধারাটি আছে তাকে খর্ব করতেই রবীন্দ্রনাথকে ব্যবহার করা হয়। কবি হিসেবে নয়, অস্ত্র হিসেবে।

মজার ব্যাপার হলো— এখানকার বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের কাছে রবীন্দ্রনাথ বাঙলা ও বাঙালিত্বের প্রতীক হয়ে উঠলেও তিনি কিন্তু কোনোদিনই বাঙালি জাতীয়তাবাদী ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথ বাঙলা ভাষার প্রধান কবি। বাঙলা ভাষাতেই তিনি করেছেন আজীবন সাহিত্য সাধনা। কিন্তু তা বলে তিনি কখনো বাঙলা ভাষাভাষীদের নিয়ে পৃথক রাষ্ট্র করবার কথা ভাবেন নি এবং রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাঙলার কথা তার মাথায় কখনোই আসে নি। আসলে বাঙলা ভাষা ভিত্তিক কোনো রাষ্ট্র নয়, রবীন্দ্রনাথ চিরকালই এক অখণ্ড ভারত গড়ার স্বপ্ন দেখে গেছেন। সেই ভারতকেও তিনি দেখেছেন উপনিষদের চোখ দিয়ে, কোনো আধুনিক সেকুলার ভাবুকের চোখ দিয়ে নয়।

১৯০৪ সালে কবি তার বিখ্যাত 'শিবাজী উৎসব' কবিতাটি লেখেন। এখানে কিন্তু কোনো ভাষা ভিত্তিক রাষ্ট্রের কথা বলা হয় নি। বলা হয়েছে শিবাজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত ভারতজুড়ে এক ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার কথা। আজকাল ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার কথা শুনলে অনেকে আৎকে ওঠেন। এর মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের গন্ধ আছে কিনা তা শুকে দেখার চেষ্টাও করেন অনেকে। কিন্তু রবীন্দ্র কাব্যের এই বিশেষ দিকটিকে কেউ কখনো সাম্প্রদায়িক বলেছেন বলে মনে হয় না। রবীন্দ্র মানসের এই স্তরগুলো একদিনে বিকশিত হয় নি। যে আবহাওয়া ও পরিবেশে তিনি মানুষ হয়েছিলেন রবীন্দ্র মানস বিকাশে তার একটা ভূমিকা ছিল। বলা হয়ে থাকে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের পরিবেশ ছিল উদার, অসাম্প্রদায়িক ও সংস্কার মুক্ত। রবীন্দ্রনাথ ও তার পরিবারকে নিয়ে তৈরি হয়েছে অনেক মিথ। এটি তারই একটি।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের সমৃদ্ধি এসেছিল ইংরেজের সাথে সহযোগিতার সূত্রে। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর। উনিশ শতকের কলকাতাকে কেন্দ্র করে ইংরেজি শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্তের মধ্যে যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনের ঘটনা ঘটে তার অনেক কিছুতেই ঠাকুর পরিবারের সদস্যরা নেতৃত্ব দেন। এর মধ্যে ঠাকুর পরিবারের সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দু মেলার প্রচলন ও জাতীয় সভা স্থাপন খুব বড় ঘটনা। এই হিন্দু মেলা ও জাতীয় সভা যে ধরনের স্বাদেশিকতার চিন্তাভাবনা লালন করেছিল তাকে কোনোভাবে অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবোধ সম্পন্ন বলা যাবে না। বরং এই মেলা পরবর্তী কালে অনেকাংশে

হিন্দু-মুসলিম বিভেদের বিষফল রোপণ করে এ কথাও সত্য। দীর্ঘকাল ধরে হিন্দু সাহিত্যিকরা হিন্দু মেলা ও জাতীয় সভার আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে যে বিপুল সাহিত্য রচনা করেন তা কিন্তু হিন্দু-মুসলিম বিরোধকে স্থায়ী করে দেয় । হিন্দু মেলার কর্মী হিসেবে রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘদিন কাজ করেন। এ মেলার সমর্থনে তিনি কবিতা ও গান রচনা করেন। একটি দৃষ্টান্ত দিই, যা তার 'যবন' বিদ্বেষের গভীর উচ্চারণ। যে রবীন্দ্রনাথকে আমরা জানি এ গান তার সাক্ষ্য দেয় না ।

জ্বল্, জ্বল্, চিতা! দ্বিগুন, দ্বিগুন,
পরান সঁপিবে বিধবা বালা ।
জ্বলুক জ্বলুক চিতার আগুন
জুড়াবে এখনই প্রাণের জ্বালা ॥
শোন, রে যবন! শোন্ রে তোরা!
যে জ্বালা হৃদয়ে জ্বালালি সবে,
সাক্ষী রলেন দেবতা তার
এর প্রতিফল ভুগিতে হবে ॥[৮৮]

ঠাকুর বাড়ীর আরেকটি আবিষ্কার ছিল সঞ্জীবনী সভা। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় স্বাদেশিকের সভা। এখানে সভ্যদের দীক্ষা দেয়া হতো ঋকমন্ত্রে।[৮৯] ঋগ্বেদের পুঁথি, মড়ার মাথার খুলি ইত্যাদি নিয়ে এখানে যে সভা হতো তা কিন্তু একান্তই হিন্দুদের।[৯০]

ভারতবর্ষের একটা সর্বজনীন পরিচ্ছদ কী হতে পারে এ সভায় তা নিয়ে অনেক আলোচনা ও বিতর্ক চলে। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, 'ধুতিটা কর্মক্ষেত্রের উপযোগী নহে অথচ পায়জামাটা বিজাতীয়' ।[৯১] জাতীয়তার এমন সঙ্কীর্ণ অর্থ ঠাকুর বাড়ির প্রভাবে তখন রবীন্দ্রনাথের অন্তরেও বদ্ধমূল ছিল।

রবীন্দ্রনাথের পিতা ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাকে বলা হতো মহর্ষি। তিনি ছিলেন ব্রাহ্ম সমাজের নেতা। রাজনৈতিক অর্থে নয়, ধর্মীয় অর্থে। চরিত্রের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন রক্ষণশীল হিন্দু। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের এই পরিবেশকে আমরা বড় জোর ধর্মীয় ও রক্ষণশীল বলতে পারি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার সীমাকেও এটি স্পর্শ করে। কিন্তু যে ইউরোপীয় সূত্রে আমরা উদারনৈতিক ও সংস্কারমুক্ত শব্দগুলো ব্যবহার করি তা দিয়ে কি এই আবহাওয়াকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব? তারপরেও ঠাকুর পরিবারের পরিবেশকে সংস্কারমুক্ত উদার

---

৮৮. জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাট্যসংগ্রহ, কলকাতা: বিশ্বভারতী,১৯৬৯

৮৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্র রচনাবলী, নবম খণ্ড। কলকাতা, বিশ্বভারতী,বাংলা ১৪১০

৯০. বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি। কলকাতা: শিশির পাবলিশিং হাউস, ১৯২০, পৃষ্ঠা : ৩৬

৯১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্র রচনাবলী, নবম খণ্ড

বলে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। কারণ দীর্ঘদিন ধরে বাংলার সামাজিক সাংস্কৃতিক নেতৃত্ব দিয়েছেন ঠাকুর পরিবারের সদস্যরা। এ সূত্রেই সাম্প্রদায়িকতার পাপও এদের স্খলন হয়ে গিয়েছে।

রবীন্দ্র মানস এই পরিবেশে লালিত বলে তার মধ্যে কতকটা মুসলিম বিদ্বেষের ডাব ছিল। বহুদিন ধরে জাতীয়তার নামে শুদ্ধ হিন্দু জাতীয়তা এবং ভারতবর্ষ অর্থে শুদ্ধ হিন্দু ভারতবর্ষ জ্ঞান— এরূপ সংকীর্ণতাও তার মধ্যে আমরা দেখি নানারকম ঐতিহাসিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক কার্যকারণে বিরাট ব্যক্তি মানুষের জীবনেও নানা রকমের রূপান্তর ঘটে। রবীন্দ্রনাথ তার বড় উদাহরণ। রবীন্দ্র মানসের এই দিকটি আলোচনা ছাড়া তার সম্পর্কে কোনো আলোচনা পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না।

আমাদের এখানে যারা রবীন্দ্রচর্চা করেন তাদের সমস্যা হচ্ছে তারা রবীন্দ্রনাথকে বিচার করেন ভক্তের দৃষ্টিতে, কেউ কেউ পূজারীর আয়নায়। আবার কেউ আছেন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে তার বিচার করেন। কাউকেই বিশ্লেষকের ভঙ্গীতে দেখা যায় না। এই দৃষ্টিভঙ্গী রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এখানে ভ্রান্তি বাড়িয়ে চলে। কাজী আবদুল ওদুদ, আবু সয়ীদ আইয়ুব, মোফাজ্জল হায়দার, আনোয়ার পাশা, হাবিবুর রহমান এরা যত না রবীন্দ্র বিশ্লেষক তার চেয়ে বেশি রবীন্দ্রভক্ত।

এইভাবে ঊনিশশতকীয় রবীন্দ্রনাথ এসে পড়েন বিশ শতকের দোর গোড়ায়। তখনও তিনি হিন্দু ভারতে পরিভ্রমণরত। মুক্ত ভারতে তার চোখ পড়ে নি। এমনি সময়ে বঙ্গ বিভাগের ঘটনা ঘটে। বঙ্গ বিভাগ এদেশের হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ককে বিষিয়ে দেয়। হিন্দু জমিদারদের অত্যাচার মুসলমানদের সহ্য করতে হয়েছিল বহুদিন। বঙ্গ বিভাগের ঘটনা তাদেরকে আশাবাদী করে তোলে। নতুন প্রদেশে বর্ধিত অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিধার আশায় তারা বঙ্গবিভাগকে সমর্থন দেন। অন্যদিকে বঙ্গ বিভাগের মধ্যে হিন্দুরা এতকালের অর্জিত সুযোগ সুবিধা হারানোর ভয়ে বিচলিত হয়ে ওঠেন। সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ তার জমিদারীর স্বার্থকে এসময় বড় করে দেখেন এবং তখনকার বঙ্গভঙ্গ বিরোধী হিন্দু সমাজনেতা ও বুদ্ধিজীবীদের দলে ভিড়ে যান।

বঙ্গভঙ্গের সূত্র ধরে স্বদেশী আন্দোলনের যে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি শুরু হয় একটা পর্যায় পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ তার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। এসময় তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পক্ষেও দাঁড়ান নি। জমিদার হিসেবেও রবীন্দ্রনাথ প্রজাবৎসল ছিলেন না মোটেই। তার জমিদারীতে প্রজাদের উপর এতদূর অত্যাচার হতো যে বিভিন্ন সময় প্রজাবিদ্রোহের ঘটনাও ঘটেছে। পশ্চিমবঙ্গের বুদ্ধিজীবী অমিতাভ চৌধুরী, স্বপন বসু প্রমুখ এই অত্যাচারের কথা বিস্তারিতভাবে লিখেছেন। এটা বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় রবীন্দ্রনাথের জীবনের এই যে ঘটনা পরম্পরা তা কিন্তু পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা সহজে গ্রহণ করতে পারেন নি বা তাদের চোখে ভালো লাগে নি। পূর্ব বাংলার মানুষ রবীন্দ্রনাথের প্রতি যদি কিছু অপ্রীতি দেখিয়েও থাকে তবে তা একেবারে

অস্বাভাবিক বলা যাবে না। রবীন্দ্র মানস ও রাজনীতির এই বিশেষ দিকটাই তাকে বিতর্কের কেন্দ্রে পৌঁছে দিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের জমিদারী ছিল বাংলাদেশের পতিসর, শাহজাদপুর ও শিলাইদহে। এসব জমিদারীর অধিকাংশ প্রজা ছিল মুসলমান। একটা জিনিস ভেবে অবাক হই পূর্ববঙ্গের নিসর্গ যতটুকু তাকে প্রভাবিত করেছে বিপুল সংখ্যক মুসলমান প্রজা বা ইসলাম ধর্মের অন্তর্নিহিত সামাজিক শক্তি তাকে মোটেও টানতে পারে নি। নোবেল প্রাইজ পাওয়ার আগ পর্যন্ত একজন সমাজ সচেতন মানুষ হিসেবে রবীন্দ্রনাথ কখনো মুসলমানদের সম্পর্কে ভেবেছেন এমন প্রমাণ তার কথায় ও কাজে পাওয়া যায় না।

নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর তার চিন্তাভাবনার একটা বিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। বিশ্বের সাথে তার যোগ স্থাপিত হয়। তার ক্ষুদ্র জীবনদৃষ্টিকে বাস্তব প্রয়োজনেই সম্প্রসারিত করতে হয়। এই সম্প্রসারণের কালে তিনি হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের কারণগুলো কিছুটা খুঁজে ও বুঝে দেখার চেষ্টা করেন। কালান্তরের লেখাগুলো তার এই মানস পরিবর্তনের সাক্ষ্য। যদিও এই পরিবর্তন কতখানি ভিতরের চাপে আর কতখানি বাইরের প্রয়োজনে হয়েছিল তা কেউ বিশ্লেষণ করেন নি।

নোবেল প্রাইজের টাকা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ শান্তি নিকেতন গড়েছিলেন। কিন্তু কেন এই শান্তি নিকেতন মুসলমানপ্রধান পতিসর, শাহজাদপুর, শিলাইদহে না গড়ে হিন্দুপ্রধান বীরভূমের বোলপুরে যেয়ে গড়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তার উত্তর পাওয়া কঠিন বৈকি। রবীন্দ্রনাথ প্রথম তৈরি করেছিলেন ব্রহ্মচর্যাশ্রম। নাম দিয়েছিলেন তপোবন বিদ্যালয়। তার সামনে আদর্শ ছিল প্রাচীন ভারতের মুনি-ঋষিদের পাঠদানের পদ্ধতি। শান্তি নিকেতনকে সেই ধাচেই তিনি গড়েছিলেন। শিবনারায়ণ রায় শান্তি নিকেতনকে বলেছেন রুরাল ইউনিভার্সিটি। আর রবীন্দ্রনাথ শান্তি নিকেতনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে লিখেছেন :

> আমি ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মচর্যের প্রাচীন আদর্শে আমার ছাত্রদিগকে নির্জনে নিরুদ্বেগে পবিত্র নির্মলভাবে মানুষ করিয়া তুলিতে চাই। ... বিদেশী ম্লেচ্ছতাকে বরণ করা অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়। ইহা হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিও, স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়; পরধর্মো ভয়াবহ।[৯২]

এসব চিন্তাভাবনাকে কি আধুনিক, সেকুলার, উদার মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন, প্রগতিপন্থী বলা চলে? জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের মতো শান্তি নিকেতনকেও ঘিরে আমাদের এখানে তৈরি হয়েছে কতকগুলো মিথ। এ মিথের প্রচারক আমাদের এখানকার সেকুলার বুদ্ধিজীবীরা যারা

---

৯২. ত্রিপুরার রাজা ব্রজেন্দ্রকুমার দেব মানিক্যকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি (৭ বৈশাখ ১৩০৯, এপ্রিল ১৯০২), প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৪৮ (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৪১), পৃষ্ঠা ৬৫৭

চাঁদের একপিঠের বর্ণনা করেন, অন্য পিঠের কলঙ্ক তাদের অলক্ষ্যে থাকে। শান্তি নিকেতনের পাঠদানের পদ্ধতি সম্বন্ধে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তার রবীন্দ্র জীবনীতে লিখেছেন :

> এই আদর্শ অনুসারে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রাতে ও সায়াহ্নে গায়ত্রী মন্ত্রের ব্যাখ্যা শুনে ধ্যান করতে হতো। উপাসনার সময়ে কষায় বস্ত্র পরিধান করতে হতো। উপাসনার পর বেদগান করতে হতো এবং সবশেষে অধ্যাপকদের পদধূলি নিতে হতো।[৯৩]

চিন্তা-ভাবনার দিক দিয়ে এ-তো টোল, চতুষ্পাঠীর চেয়েও প্রাচীন। কোনোভাবেই একে আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলা চলে না। এরপরে শান্তি নিকেতন নিয়ে গড়ে ওঠা উদারতার মিথ আমাদের টিকিয়ে রাখা কতটুকু যুক্তিযুক্ত?

দুই

আগেই বলেছি মুসলমান সমাজের প্রতি রবীন্দ্রনাথের বিদ্বেষ ও অনীহার একটা বড় কারণ হচ্ছে তার মানস গঠনে তার পরিবারের সংরক্ষণশীল পরিবেশ, হিন্দুত্ববাদী চিন্তা-ভাবনা এবং তখনকার দিনের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ইতিহাসের ধারা বড় ভূমিকা পালন করে। কতকক্ষেত্রে হিন্দুত্ববাদী রাজনীতিতে রবীন্দ্রনাথের অংশগ্রহণ মুসলমান সমাজের কাছে তাকে অপ্রিয় করে তোলে । কবি হিসেবে নয়, মানুষ রবীন্দ্রনাথই তখন চলে আসেন আলোচনার কেন্দ্রে । জমিদার হিসেবেও তিনি জনপ্রিয় হতে পারেন নি। তার জমিদারীর অধিকাংশ প্রজাই ছিলেন মুসলমান। সেটিও ছিল তার প্রতি অপ্রীতির আরেকটি কারণ। যদিও শেষ জীবনে তার জমিদারীতে মুসলমান প্রজাদের উপর অবিচার সম্বন্ধে তিনি কিছুটা সচেতন হয়েছিলেন। কিন্তু তখন সময় অনেক গড়িয়ে গেছে। বঙ্গভঙ্গের পর থেকে বাংলাদেশে যে স্বাতন্ত্র্যকামী রাজনীতি ও সংস্কৃতির বিকাশ হতে থাকে তার প্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ এখানকার মুসলমানদের কাছে পুরোপুরি গ্রহণযোগ্যতা পান নি এবং পাকিস্তান আন্দোলনের প্রেক্ষিতে তিনি হয়ে ওঠেন প্রতিপক্ষ ।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর পূর্ববঙ্গে একটা অদ্ভূত অবস্থার সৃষ্টি হয়। এতদিন মুসলমানরা মত ও চিন্তা নির্বিশেষে পাকিস্তানের পক্ষে লড়াই করেছিলেন। তাদের সামনে প্রতিপক্ষ ছিল একদিকে ব্রিটিশ, অন্যদিকে হিন্দু। পাকিস্তান অর্জনের পর সেই প্রতিপক্ষের দেয়াল সরে যায়। পাকিস্তান অর্জনের পিছনে যেমন কিছু সামাজিক, সাংস্কৃতিক কারণ ছিল তেমনি ছিল অর্থনৈতিক কারণ । পাকিস্তান অর্জনের পর এখানকার মুসলমানরা দেশের অন্য অংশের সাথে ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে একটি ঐক্য রচনার আশা করেছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতা

[৯৩]. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী, দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা: বিশ্বভারতী, বাংলা ১৪২০

উত্তর কালে তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশের মতো পাকিস্তানকে ও একই ভাগ্য বরণ করতে হয়। তৃতীয় বিশ্বের যেসব নেতারা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন, স্বাধীনতা উত্তর কালে তারাই এক কুৎসিত ক্ষমতার লড়াইয়ে লিপ্ত হন। ফলে যে আশা নিয়ে পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা মুসলিম লিগকে ভোট দেয় তা পূরণ হয় না। বাস্তব আর স্বপ্নের এই বিরোধ থেকেই হতাশা সৃষ্টি হয় এবং হতাশা থেকে বিস্ফোরণ।

পাকিস্তান হওয়ার পর মুসলিম লিগের একাংশ ক্ষমতার ননী ভোগ করে । অন্য অংশ বঞ্চিত হয়। এই বঞ্চিত অংশই মুসলিম লিগ থেকে বেরিয়ে যায় এবং বিরোধী দল গঠন করে। বিরোধী দল করতে যেয়ে তারা বিরোধী আদর্শকেও বরণ করেন। কারণ কোনো তাত্ত্বিক ভিত্তি ছাড়া দল টিকিয়ে রাখা যায় না। মুসলিম লিগ সারা ভারতের মুসলমানদের স্বাধিকার, স্বাতন্ত্র্যের কথা বলেছিল মুসলিম লিগ থেকে যারা বেরিয়ে যান তারা মুসলমানের স্বাতন্ত্র্যের কথা না বলে, বলেন আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যের কথা। বাঙলাভাষীদের স্বাধিকারের কথা। বিরোধী দলেও অনেক জনপ্রিয় নেতাকর্মীরা ছিলেন। তারা তাদের আদর্শের পক্ষে জনগণকে জাগিয়ে তোলেন। এইভাবে পূর্ববঙ্গে মুসলিম জাতীয়তাবাদ পিছু হটতে শুরু করে এবং সেকুলার জাতীয়তাবাদের উত্থান ঘটে।

জাতীয়তাবাদের একটা সাংস্কৃতিক দিক থাকে। সেই সংস্কৃতির একটা প্রতীক প্রয়োজন। সেকুলার বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রতীক হয়ে দাঁড়ান রবীন্দ্রনাথ । যদিও তিনি নিজে আদৌ সেকুলার ছিলেন না। এইভাবে যে মুসলিম লিগের সাংস্কৃতিক প্রতিপক্ষ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, ইতিহাসের ধারায় মুসলিম লিগের বিদ্রোহী অংশ সেই রবীন্দ্রনাথকে স্বপক্ষ বানিয়ে নেয়। ইতিহাসের অদ্ভূত আয়োজন বৈকি । তাই বাংলাদেশ হওয়ার পরও রবীন্দ্র বিতর্ক শেষ হয় না। কারণ এদেশের মানুষ দেখে শুধু সেকুলার জাতীয়তাবাদ দিয়ে তাদের সমস্যার সমাধান নেই। তাই তারা পুনরায় মুসলিম জাতীয়তাবাদের সাথে আপোস করে। আজকের বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ মুসলিম জাতীয়তাবাদের একটি বিশেষ ধরন মাত্র। এইভাবে বাঙালি জাতীয়তাবাদ কিছুটা ধাক্কা খায়। আমাদের জাতি চেতনা আজও এই ধাক্কা-ধাক্কির মধ্যে খাবি খাচ্ছে। বাঙালি মুসলমানের এই মানস বিবর্তন না বুঝতে পারলে এদেশে চলমান রবীন্দ্র বিতর্কের ধারা বোঝা যাবে না ।

ষাটের দশকে যে রবীন্দ্র রাজনীতি ও বিতর্কের উত্থান ঘটে তার মূলে আছে এই মুসলিম জাতীয়তাবাদ বনাম বাঙালি জাতীয়তাবাদের লড়াই। আমাদের এখানকার বাঙালি জাতীয়তাবাদীরা রবীন্দ্রনাথকে কবি হিসেবে নন, সাংস্কৃতিক চৈতন্যের প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চান। রবীন্দ্রনাথের কবিতা, গান উপভোগ করা এক কথা, আর তাকে সাংস্কৃতিক চৈতন্যের আঁধার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা আরেক কথা। রবীন্দ্রনাথের সাংস্কৃতিক চৈতন্যটা কী? প্রাচীন ভারতবর্ষীয় আদর্শ, তপোবন, ঔপনিষদিক ধর্ম এগুলোই তার

সাংস্কৃতিক চৈতন্যের আঁধার। এই চৈতন্যকে তৌহিদবাদী বাঙালি মুসলমান কীভাবে গ্রহণ করবে?

বাঙালি জাতীয়তাবাদীরা এটাকেই চাপিয়ে দিতে চান বাঙালি মুসলমানের উপর। এটাকে ভিত্তি করে তারা একটি বিশেষ রাজনৈতিক ধারা বিকাশের কথা বলেন। এইজন্যই তারা বলতে পারেন রবীন্দ্রনাথ ছাড়া বাঙালি হওয়া যায় না। যার ফলে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে যায়। এ সংঘর্ষ সংস্কৃতির সংঘর্ষ। কাজী আবদুল ওদুদ, আবু সয়ীদ আইয়ুব প্রমুখ বিদ্বজনের কথা আলাদা। এরা সাংস্কৃতিক চৈতন্যের দিক দিয়ে ইসলাম ত্যাগ করেছিলেন। তাই তাদের পক্ষে রবীন্দ্র চৈতন্যের সাথে এক ধরনের রফা করা সম্ভব হয়েছিল । কিন্তু সেটা তো এদেশের আপামর বাঙালি মুসলমানের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ তারা ইসলাম বাদ দিয়ে রবীন্দ্র চৈতন্যের কাছে নিজেদের সমর্পণ করতে অনিচ্ছুক ।

রাজনীতির প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথের সাংস্কৃতিক চৈতন্যকে এখানে টেনে আনা হয়েছে বারবার। তার সৃষ্টির রস অতিক্রম করে সাংস্কৃতিক চৈতন্য নিয়ে টানাটানি করতে গেলে বিরোধ সৃষ্টি হবে। অতীতের মতো এরকম অবস্থা আমাদের কারোই কাম্য নয় আজ ।

সেকুলারিজম, রবীন্দ্রনাথ ও রাখাল ছেলের দল

এক

পশ্চিমবঙ্গের প্রখ্যাত পণ্ডিত শিবনারায়ণ রায় একবার আক্ষেপ করে লিখেছিলেন:
পঁচিশে বৈশাখের পূজা অনুষ্ঠান আড়ম্বরে এবং সংখ্যাধিক্যে দুর্গাপূজাকেও হার মানাতে বসেছে। দুর্গাপূজার ব্যাপ্তি ও গম্ভীরতাকে এখন ছাড়িয়ে গেছে 'সর্বজনীন' রবীন্দ্রোৎসবের ঘটা। এই কারণে রবীন্দ্রপূজার যারা সনদপ্রাপ্ত পুরোহিত (লেখক, অভিনেতা, গাইয়ে কিংবা আবৃত্তিকার) তাদের বাজার সরগরম।[৯৪]

তাই বলে শিবনারায়ণ রায় রবীন্দ্রনাথের শক্তিশালী প্রতিভাকে মোটেই খাটো করে দেখাতে চান নি। তিনি যা বলতে চেয়েছিলেন তার মোদ্দা কথা হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথকে উচ্ছ্বাসপ্রবণ বাঙালির ছাঁচে ফেলে নিজেদের বাঙালিত্ব প্রমাণের চেয়ে সম্পূর্ণ আধুনিক মন নিয়ে তার সৃষ্টির বিশ্লেষণ করা উচিত। হুজুগবাজ রবীন্দ্র পূজারিদের স্থূলতা ও মূঢ়তার কারণে শিল্পী রবীন্দ্রনাথ যেভাবে দেবতায় পর্যবসিত হয়েছেন তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে গিয়ে শিবনারায়ণের কী অবস্থা হয়েছিল তা এখানকার সংস্কৃতির জগতের কেউ কেউ হয়তো জানেন। পাণ্ডাগোছের রবীন্দ্র পূজারীরা তার উপর রীতিমতো হামলে পড়েছিলেন এবং তার জীবননাশেরও শঙ্কা জেগেছিল।

যে দেশে তেত্রিশ কোটি দেব-দেবীর ছড়াছড়ি, সেখানে আরো একজন দেবতার আগমন জনতার ভালো না লাগার কথা নয়। কারণ, দেশের মানুষ দেব- দেবীতেই অভ্যস্ত। কিন্তু যারা নিরাকার খোদায় বিশ্বাস করেন, আল্লাহ ছাড়া কারো আনুগত্য স্বীকার করেন না— তাদের জন্য দেবতার ধারণাটা অপ্রাসঙ্গিক ব্যাপার বৈকি! কিছুদিন হলো বাঙালি মুসলমান সমাজের একাংশ (সংখ্যায় কম হলেও শক্তিমান) যারা সংস্কৃতির দিক দিয়ে সম্ভবত ইসলাম ছেড়ে দিয়েছেন এবং নিজেদের জন্য এক সেকুলার ধর্মের প্রবর্তন করেছেন তারা রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে ভক্তিতে গদগদ হয়ে উঠছেন। এখন বুঝিবা রবীন্দ্র চরণামৃত পানে মোক্ষপ্রাপ্তিই তাদের একমাত্র কাম্য। এসব সেকুলারবাদী রবীন্দ্র চর্চার নামে যা করেন তা রীতিমতো দেবপূজা ও আরাধনার পর্যায়েই পড়ে। বাংলাদেশের একজন মহিলা কবি সুফিয়া কামাল রবীন্দ্রসঙ্গীত শ্রবণকে একবার ইবাদতের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। এ দেশে ঘটা করে রবীন্দ্রোৎসব উদযাপনের অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা ওয়াহিদুল হককে দেখেছি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তিনি ধূতি পরতেন, গড় হয়ে প্রণাম করতেন। শুধু তাই নয়, মৃত্যুর পর নিজের লাশটি পর্যন্ত বাঙালি মুসলিম সমাজের সংস্কৃতি অনুযায়ী ইসলামী মতে দাফন করার অনুমতি দেন নি। বাংলাদেশ

[৯৪]. শিবনারায়ণ রায়, 'রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক মন', প্রবন্ধ সমগ্র। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০১।

ব্যাংকের একজন প্রাক্তন গভর্নর আতিউর রহমান সরকারি অনুষ্ঠানে কুরআন তিলাওয়াতের পরিবর্তে রবীন্দ্রসঙ্গীত দিয়ে অনুষ্ঠান শুরুর রীতি চালু করেছিলেন। শুনেছি তিনি বিভিন্ন জায়গায় নিজেকে রাখাল ছেলে বলে পরিচয় দিতে এক ধরনের আত্মপ্রসাদ পান । কেননা তিনি কৃষক পরিবারের সন্তান। রাখাল ছেলের এই রবীন্দ্র বিলাস বেশ কৌতুককর বৈকি !

শিবনারায়ণ রায় তার ওই প্রবন্ধে লিখেছিলেন হুজুগবাজ, হৈহুল্লোড়লোভী রবীন্দ্র পূজারিদের কাজ-কর্মের সঙ্গে আধুনিক মন, মনন ও যুক্তির কোনো সম্পর্ক নেই । বাংলাদেশের সেকুলার রবীন্দ্র পূজারিদের সম্পর্কেও কথাটা একই রকম সত্য। মজার ব্যাপার হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় সেকুলারিজমের স্থান তেমন একটা ছিল না। তার অধিকাংশ গানে ও দার্শনিক রচনার মধ্যে ঔপনিষদিক ধারার প্রভাব খুব স্পষ্ট। প্রাচীন ভারতের ঋষিদের মতো তিনিও অনুভব করতেন যে বিশ্বজগত কোনো কল্যাণময় উপস্থিতির বিচিত্র বহিঃপ্রকাশ মাত্র। সংসারের সমস্ত দুঃখ, সংঘাত, ভাঙাচোরার অন্তরালে এমন কোনো চৈতন্যময় পুরুষ বর্তমান, যিনি সবকিছুতেই সুষমা ও সঙ্গতি দান করে চলেন। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ একালের আধুনিক যুগে বসেও প্রাচীন ভারতের আর্যঋষিদের তপোবনকে ফিরিয়ে আনার ভাবনায় ব্যাকুল হতেন। অনেকেই জানেন কবি তার শান্তি নিকেতনকে ঋষিদের তপোবনের আদলে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। কবির এই তপোবন ফিরিয়ে আনার চিন্তাকে আর যাই হোক সেকুলার মনের পরিচায়ক বলা যায় না ।

রবীন্দ্রনাথের একটি প্রিয় শব্দ ছিল মহাভারত। এই মহাভারত কিন্তু ইউরোপের নেশন স্টেটের আদর্শে গড়ে ওঠে নি। এই মহাভারতের ভিত্তি হচ্ছে হিন্দুত্ব। এটা সত্য যে রবীন্দ্রনাথ অনেক সময় ধর্মের নামে ধর্মতন্ত্র, সংস্কার, অন্ধ বিশ্বাসকে আঘাত করেছেন। জীবনের শেষ দিকে এসে তিনি হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের ব্যাপারটা বোঝারও চেষ্টা করেছিলেন। কালান্তরের লেখাগুলো তার প্রমাণ। তারপরও হিন্দুত্ব ও ভারতীয়ত্বের সমীকরণও তিনি একই সঙ্গে করেছেন। তার আত্মপরিচয় প্রবন্ধটিতে সেই জাত্যাভিমানী হিন্দুর পরিচয়ই আমরা দেখতে পাই :

- আমি হিন্দু এ কথা বলিলে যদি নিতান্তই কোন লজ্জার কারণ থাকে তাতে সে লজ্জা আমাকে নিঃশব্দে হজম করিতেই হইবে।

অন্যত্র একই প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন:

- হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যদি কোন বিরোধ থাকে, তা মেটাবার জন্য ‘হিন্দু পরিচয়’ বিসর্জন দিতে হবে এ কখনও সুস্থমস্তিষ্ক কল্পনা হতে পারে না । আর আমি হিন্দু নই বলিলেই হিন্দু-মুসলমানের বিরোধটা যেমন তেমনই থাকিয়া যায়, কেবল আমিই তাহা হইতে পাশ কাটাইয়া আসি।[৯৫]

[৯৫]. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘আত্মপরিচয়’, রবীন্দ্র রচনাবলী, নবম খণ্ড, সুলভ সংস্করণ। কলকাতা: বিশ্বভারতী, পৌষ ১৪১০।

এ জাতীয় বিশ্বাসের কথাবার্তাকে আর যাই হোক সেকুলার চেতনামণ্ডিত বলা যাবে না। তারপরেও আমাদের একশ্রেণির প্রগতিশীল ভাবুক, বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতিকর্মী সেকুলারিজমের আড়ালে রবীন্দ্র চর্চা করছেন। এসব চর্চার আশু উদ্দেশ্য হচ্ছে রাজনীতি। বিপুলায়তন রবীন্দ্র সাহিত্যের শৈল্পিক ও নান্দনিক বিশ্লেষণ নয় মোটেই। এই রাজনীতির লক্ষ্য হচ্ছে এ দেশের ইসলাম ভিত্তিক সংস্কৃতিকে বদলে ফেলে সেখানে কলকাতার বাবু কালচারকে প্রতিস্থাপিত করা, যাতে বাঙালি মুসলিম সমাজের সাংস্কৃতিক ভিত্তি নড়বড়ে হয়ে যায় এবং ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারতের আধিপত্যের জোয়াল আরো মজবুত হতে পারে।

দুই

বাংলাদেশে এখন প্রমাণ করার চেষ্টা চলছে রবীন্দ্রনাথ হচ্ছেন আমাদের জাতীয় চেতনার উৎস। বাংলাদেশের অনেক পণ্ডিত ও সংস্কৃতিসেবীরা মনে করেন তিনি হচ্ছেন বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রাণশক্তি। আমাদের জাতীয় চেতনার অন্যতম উৎস হলো বাঙলা ভাষা। আর রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বাঙলা ভাষার মহান কবি কিন্তু মজার ব্যাপার হলো তার বিশালায়তন সাহিত্য সৃষ্টিতে এমন কিছু নেই যা বিশেষভাবে বাঙলা ভাষা-ভাষী মানুষকে একটি পৃথক স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় অনুপ্রাণিত করতে পারে। রবীন্দ্রনাথ কখনো বাঙালিদের জন্য পৃথক রাষ্ট্র চান নি। তিনি যা চেয়েছিলেন তা হচ্ছে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের আওতায় বাঙলা ভাষা-ভাষী মানুষের মুক্তি। এই কারণে তিনি বাঙলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষপাতিও ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথ বহু জায়গায় খোলামেলা বলেছেন, হিন্দি হওয়া উচিত নিখিল ভারতের রাষ্ট্রভাষা। শান্তি নিকেতনে এক অনুষ্ঠানে হিন্দির পক্ষে রবীন্দ্রনাথের এরকম মন্তব্যের প্রতিবাদ করেছিলেন ড. শহীদুল্লাহ।

এটা ঠিক পাকিস্তান আমলে রবীন্দ্র সঙ্গীতের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছিল। বাংলাদেশের অনেক গুণীজন সে ঘটনার পক্ষে-বিপক্ষে মতামত দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এসব বিতর্কের কারণও ছিল হয়তো রবীন্দ্র চর্চার আড়ালে রবীন্দ্র রাজনীতি। রবীন্দ্র সাহিত্য আর রবীন্দ্র রাজনীতি ঠিক এক জিনিস নয়। পাকিস্তান আমলে রবীন্দ্র বিরোধিতা হয়েছিল, শুধু সে কারণেই বলা যায় না রবীন্দ্রনাথ আমাদের জাতীয় চেতনার কেন্দ্রবিন্দু। আবুল ফজল, মোতাহের হোসেন চৌধুরীর মতো প্রগতিশীল ভাবুকরা বহুবার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নানা সূত্রে যোগাযোগ করে জানতে চেয়েছেন মুসলমান সমাজ নিয়ে তার উদাসীনতার কথা। এর সদুত্তর তারাও পেয়েছিলেন বলে মনে হয় না। এ কারণেই আওয়ামী লীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং পাকিস্তান আন্দোলনের সাংস্কৃতিক ব্যাখ্যাতা আবুল মনসুর আহমদ লিখেছিলেন :

- বিশ্বকবির বিশ্ব ভারতীর বিশ্বে কতবার শারদীয় পূজায় আনন্দময়ী মা এসেছে গিয়েছে, কিন্তু একদিনের তরেও সে বিশ্বের আকাশে ঈদ- মোহরমের চাঁদ ওঠেনি।[৯৬]

আবুল মনসুর আহমদের তাই সুস্পষ্ট মতামত ছিল, মেজরিটি বাঙালির সঙ্গে নাড়ীর যোগ না থাকলে কেউ জাতীয় কবি হতে পারে না— হতে পারে না জাতীয় চেতনার উৎস। এ কারণেই তিনি মেজরিটি বাঙালির জন্য জাতীয় সাহিত্য নির্মাণের ডাক দিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ হিন্দু ধর্মের অন্তর্ভুক্ত ব্রাহ্ম সমাজে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। রাজা রামমোহন রায় এই ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রাহ্মরা ছিলেন মূর্তি পূজার বিরোধী। রামমোহনের মৃত্যুর পর ব্রাহ্ম সমাজ দুর্বল হয়ে যায় এবং দু'-তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এর একাংশের নেতৃত্ব দিতেন রবীন্দ্রনাথের পিতা দেবেন্দ্রনাথ । ব্রাহ্ম সমাজের এই অংশ রামমোহনের চিন্তা-চেতনা থেকে কিছুটা সরে আসেন এবং এরা হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী চিন্তা-ভাবনার প্রতি বেশি ঝুঁকে পড়েন। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতেই প্রতিষ্ঠা হয়েছিল হিন্দু মেলার। বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতা প্রসারে হিন্দু মেলার অবদান ছিল অনেকখানি। মহারাষ্ট্রে বালগঙ্গাধর তিলক যখন শিবাজী উৎসব চালু করেন বাংলাদেশে তা জনপ্রিয় করতে এগিয়ে আসেন ঠাকুরবাড়ির প্রভাবশালী সদস্যরাই। এর প্রভাব পড়েছিল রবীন্দ্রনাথের চিন্তা-ভাবনার উপর। এই প্রেক্ষাপটেই রবীন্দ্রনাথ শিবাজীর গৌরব গাঁথা রচনা করেন এবং ভারত জুড়ে এক ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্নের কথা বলতে পারেন। এখন সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন উঠতে পারে, বাংলাদেশের মানুষ কি এই ভাবপ্রবাহের অংশ?

অনেক রবীন্দ্র পুরোহিতের লেখা পড়ে বিস্মিত হই জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের পরিবেশ নাকি ছিল উদার, অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল। হিন্দু মেলা, শিবাজী উৎসবের মতো ব্যাপার প্রগতিশীলতার কোন মাপকাঠিতে দাঁড়ায় তা জানি না। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত 'বন্দে মাতরম' সঙ্গীত গাওয়া হতো । এই সঙ্গীতটিকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষের ইতিহাসে অনেক তিক্ত স্মৃতি জড়িয়ে আছে। এটি ছিল হিন্দু জাতীয়তাবাদের বিখ্যাত সঙ্গীত। কংগ্রেস এটিকে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে মর্যাদা দিয়ে মুসলমানদের গাইতে বাধ্য এই গানটিতে সুরারোপ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে তাই এদিক থেকেও করার চেষ্টা করেছিল। যার পরিণতি সাম্প্রদায়িকতা ও দেশভাগ। রবীন্দ্রনাথ আজকের বাংলাদেশের জাতীয় চেতনার উৎস হিসেবে বিবেচনা করা ইতিহাসসম্মত নয়।

বিশ শতকের প্রথম দিকে মুসলমানরা যখন বঙ্কিমচন্দ্রের সাম্প্রদায়িকতাপূর্ণ লেখালেখি নিয়ে বিশেষভাবে সোচ্চার হয়ে ওঠেন, তখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে দাঁড়ান এবং বলেন :

---

৯৬. আবুল মনসুর আহমদ, বাংলাদেশের কালচার। ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস,১৯৭৬ ।

- মুসলমান বিদ্বেষ বলিয়া আমরা আমাদের জাতীয় সাহিত্য বিসর্জন দিতে পারি না। মুসলমানদের উচিত নিজেদের জাতীয় সাহিত্য নিজেরাই সৃষ্টি করা।[৯৭]

রবীন্দ্রনাথ সবচেয়ে বেশি সমালোচিত হন বঙ্গভঙ্গের কালে। বাঙালি হিন্দু নেতারা বঙ্গভঙ্গ বিরোধী যে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ প্রথম দিকে তার সঙ্গে জড়িত হয়েছিলেন। এ আন্দোলনকে তীব্র করার জন্য তিনি লিখেছিলেন অনেক গান। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন কোনো সেকুলার আন্দোলন ছিল না। এটা ছিল পুরোপুরি হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। এর নেতৃত্বে ছিলেন শ্রী অরবিন্দ ঘোষ ও তার ভাই বারীন ঘোষ। এরা বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়েছিলেন। বঙ্গভঙ্গের ফলে ব্রিটিশরা পূর্ববঙ্গ ও আসাম নিয়ে মুসলমান অধ্যুষিত এক প্রদেশ সৃষ্টি করে। এর রাজধানী হয় ঢাকা। এর পেছনে ব্রিটিশের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক উভয় রকমের স্বার্থ ছিল। পূর্ববঙ্গেই ছিল হিন্দু জমিদারদের বড় বড় জমিদারী। তারা ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন মুসলিম প্রধান পূর্ববঙ্গে তাদের জমিদারী লোপ পেতে পারে। এসব জমিদার বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে টাকা-পয়সা দিয়ে জোরদার করে তোলেন। আন্দোলনকে সামনে রেখে বাঙালি ও বাঙালিত্বের স্লোগান ছিল বড় রকমের ভাঁওতা। বঙ্গভঙ্গ না হলে বাঙালি হিন্দুরা ওরকম করে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে কখনোই ঝাঁপিয়ে পড়তেন না। জমিদারী হারানোর ভয় হয়তো রবীন্দ্রনাথকেও পেয়ে বসেছিল।

অবশ্য একটা পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ এ আন্দোলন থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন। তিনি সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সমালোচনা শুরু করেন। যেসব তরুণ বল প্রয়োগ করে ব্রিটিশকে তাড়াতে চান তাদের সমালোচনা করে তিনি চার অধ্যায় উপন্যাস লেখেন। ব্রিটিশ সরকার এ উপন্যাসের হাজার হাজার কপি বিলি করে জেলে আটক সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের তরুণদের কাছে তাদের মাথা ধোলাইয়ের জন্য। শরৎচন্দ্র ছিলেন বিপ্লবীদের পক্ষে। তিনি লিখেছিলেন পথের দাবী উপন্যাস। এখানে তিনি বিপ্লবীদের সমর্থন করেছিলেন। ফলে ব্রিটিশ সরকার পথের দাবী বাজেয়াপ্ত করে। অনেকে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ এর প্রতিবাদ করবেন। তিনি এটা না করে শরৎচন্দ্রকে কিছুটা ভর্ৎসনা করে বলেছিলেন, তার উচিত হয় নি এ উপন্যাস লেখা। মোটের উপর রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন ব্রিটিশ সরকারকে টিকিয়ে রাখতে। অনেক সময়ই তিনি ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে ঈশ্বরের শাসনের সঙ্গেও তুলনা করতেন। এ কোনো দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদীর কথা হতে পারে না । যাই হোক রবীন্দ্রনাথের মতো বিশাল ব্যক্তিকে হারিয়ে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছিল। আর ব্রিটিশের লাভ হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের

[৯৭]. মুসলিম জননেতা নওয়াব নওয়াব আলী চৌধুরী একটি বক্তৃতায় মুসলিম বিদ্বেষপূর্ণ সাহিত্য বন্ধের প্রতি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে 'ভারতী' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ এই মন্তব্য করেন।

মতো ব্যক্তিকে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের বিরুদ্ধে কিছুটা হলেও খাড়া করতে পেরে। কবির এ মনোপরিবর্তনে ব্রিটিশের হাত থাকলেও থাকতে পারে।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন খুব তীব্র হওয়ার কারণে কার্জনের বঙ্গভঙ্গ এক সময় রদ হয়ে যায়। ব্রিটিশ সরকার তখন পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের সান্ত্বনা দেয়ার জন্য ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন। এতেও বাঙালি হিন্দুরা ক্ষেপে যান। তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেন। এমনকি ঢাকার হিন্দুরাও চান নি ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় হোক। তারা মনে করেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হবে একটি মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয় আর মুসলমানের ছেলেরা লেখাপড়া শিখে তাদের পাতে ভাগ বসাবে। মজার ব্যাপার হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের মতো বিশ্বকবিও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পক্ষে একটি কথাও বলেন নি। আজ যেসব রাখাল ছেলেদের রবীন্দ্র বিলাস পেয়ে বসেছে তারা জানেন না তাদের দেবতাতুল্য মানুষটি রাখাল ছেলেরা লেখাপড়া শিখে সমাজের উপর তলায় উঠে আসুক এটা কখনোই চান নি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী প্রায় একই সময় কার্যক্রম শুরু করে। কিন্তু বিশ্বভারতী মুসলমান ছাত্রদের মোটেও আকর্ষণ করে নি। ঠাকুর পরিবারের অধিকাংশ জমিদারী ছিল পূর্ববঙ্গে। রবীন্দ্রনাথও পূর্ববঙ্গে কাটিয়েছেন বহুদিন। তারপরেও মুসলমান অধ্যুষিত পূর্ববঙ্গে তিনি তার শান্তি নিকেতন প্রতিষ্ঠা করতে উৎসাহ পান নি। তিনি এটা গিয়ে তৈরি করেন বীরভূমে। প্রথমদিকে শান্তি নিকেতনে মুসলমান ছাত্রদের কোনো প্রবেশাধিকারই ছিল না। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে অনেকের কাছে চাঁদা চেয়েছিলেন। হায়দরাবাদের নিজাম তাকে সে আমলে এক লাখ টাকা দিয়েছিলেন। সেই চাঁদার সূত্রেই কিছু মুসলমান ছাত্র সুযোগ পায় শান্তি নিকেতনে লেখাপড়া করার। সাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলী ছিলেন এদের একজন। মনে রাখা দরকার, বিশ্বভারতী নয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ভেতর দিয়ে পূর্ববঙ্গে একটি মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজ বিকাশ হওয়ার সুযোগ পায় আর তা এ অঞ্চলের মানুষের জাগরণে বড় ভূমিকা রাখে। অর্থাৎ ইতিহাসের নিরিখে দেখতে গেলে রবীন্দ্রনাথ নয়, যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছিলেন তারাই এ অঞ্চলের মানুষের সত্যিকারের জাগরণে বড় ভূমিকা রাখেন যা আজকের বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের অন্যতম ভিত্তি। তারাই পূর্ববঙ্গের মানুষের সত্যিকারের জাতীয় চেতনার উৎস হওয়ার দাবিদার।

আজকের প্রজন্ম হয়তো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্যোক্তা নওয়াব সলিমুল্লাহর নামই শোনে নি। এদেশের মানুষের প্রতি এই মানুষটির আত্মত্যাগকে বোধ হয় আমরা ভুলতে চাচ্ছি। একটা আত্মবিস্মৃত জাতি কখনো মেরুদণ্ড নিয়ে খাড়া হতে পারে না। পত্রপত্রিকা, মিডিয়া থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাশরুম এমনকি সরকারি অফিস পর্যন্ত একদল মতলববাজ রাজনীতিক ও সংস্কৃতিকর্মী বিরতিহীনভাবে রবীন্দ্র সিনড্রম সৃষ্টি করে চলেছেন। ভাবটা এমন—

রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আমাদের কোনো চেতনা নেই। আমাদের ভবিষ্যত একেবারেই অন্ধকার। মনে রাখা দরকার, শান্তি নিকেতন নয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাই করেছে ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য আন্দোলন যার ভেতর দিয়ে বাংলাদেশের উদ্ভব। তাই যেসব রাখাল ছেলে রবীন্দ্রনাথকে জাতীয় চেতনার উৎস বানাতে গদগদ হয়ে উঠেছেন তারা ইতিহাসের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করেছেন বলে মনে হয়।

পূর্ববঙ্গে ঠাকুর জমিদারদের যেসব এলাকায় জমিদারী ছিল (শিলাইদহ, শাহজাদপুর, পতিসর) সেখানে এদের খাজনা তোলার জন্য তহশিল অফিস ছিল। জমিদারী দেখাশোনার সুবাদে রবীন্দ্রনাথ এসব জায়গায় দিনের পর দিন কাটিয়েছেন। এসব তহশিল অফিসকে এখন রবীন্দ্রতীর্থ হিসেবে বলার চেষ্টা চলছে। ধার্মিক লোকেরা তীর্থে যান পূণ্য সঞ্চয়ের জন্য। আমাদের সেকুলারবাদী রাখাল ছেলেরা এখানে কী পূণ্য সঞ্চয় করবেন জানি না। তবে আজকের রাখাল ছেলেদের পূর্বপুরুষদের অনেক হাহাকার ও দীর্ঘশ্বাস মিশে আছে এসব রবীন্দ্রতীর্থের সঙ্গে। ঠাকুর জমিদাররা ছিলেন খুবই অত্যাচারী। প্রজাপীড়ন ও নির্মমভাবে খাজনা আদায়ে তাদের সুনাম কারও চেয়ে কম ছিল না। কুষ্টিয়ার সাহিত্যিক কাঙ্গাল হরিনাথ একবার ঠাকুর পরিবারকে অত্যাচারী জমিদার হিসেবে সমালোচনা করেছিলেন। এই অপরাধে রবীন্দ্রনাথের বাবা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কাঙ্গাল হরিনাথকে খুন করার জন্য গুণ্ডা লেলিয়ে দেন। এই নিষ্ঠুর জমিদারদের হাত থেকে বাংলার কৃষকদের উদ্ধার করতে শের-ই-বাংলা ফজলুল হক ঋণসালিশি বোর্ড স্থাপন করেন। ফজলুল হকের এই প্রজাহিতৈষী কর্মকাণ্ডের ইতিহাস রবীন্দ্রোৎসবের ঘটার চেয়ে কম গৌরবোজ্জ্বল নয়। দুর্ভাগ্য, এদেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে ফজলুল হকের জন্মোৎসব পালিত হয় না।

আমাদের রাখাল ছেলেরা বাপ-দাদার রক্তে আর ঘামে ভেজা সংস্কৃতির ভূগোলই পরিবর্তন করে দিতে চান বোধ হয়। কুরআন শরিফের চেয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীতই তাদের কাছে এখন বেশি মূল্যবান মনে হয়। নিজের সংস্কৃতি সম্বন্ধে হীনমন্যতা তৈরি হলেই কেবল এ ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে।

শেক্সপিয়ারকে বলা চলে ইংরেজি সাহিত্যের কিংবদন্তী। তাকে বাদ দিয়ে ইংরেজি সাহিত্যের আলোচনা চলে না। তারপরেও তিনি আমেরিকার জাতীয় কবি নন। একটা জাতি গড়ে ওঠে ইতিহাসের নানা বিবর্তনের ভেতর দিয়ে। আমেরিকার সেই ইতিহাসে শেক্সপিয়ারের স্থান নেই। বাঙালি মুসলিম সমাজের বিবর্তন হয়েছে একভাবে। বাঙালি হিন্দুর অন্যভাবে। এই বিবর্তনের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন, সেখানে বাঙালি মুসলিম সমাজের উপস্থিতি নগণ্য। ইতিহাসের এই সত্যকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার মধ্যে আছে এক ধরনের হীনমন্যতার লজ্জা। এই লজ্জার ফাঁক-ফোকর দিয়েই রবীন্দ্রপূজা বাঙালি মুসলিম সমাজের একাংশকে গ্রাস করেছে।

রবীন্দ্রনাথের মার্কসবাদী ভক্তরা

রবীন্দ্রনাথ ঘরে বাইরে উপন্যাস লেখেন ১৯১৫ সালে। এখানে তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে স্বদেশী আন্দোলনের নিন্দা করেন এবং এর কর্মীদের চরিত্র হনন করার চেষ্টা করেন। সেই উপন্যাসের তরজমা পড়ে হাঙ্গেরীর মার্কসবাদী তাত্ত্বিক Gyorgy Lukacs এটিকে libellous pamphlet (কুৎসামূলক প্রচারণাপত্র) এবং petty bourgeoisie yarn of the shoddiest kind (পেটি বুর্জোয়ার নষ্ট আকাঙ্খা) বলে মন্তরবীব্য করেন। শুধু তাই নয়, এ উপন্যাসের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকাকে তিনি এভাবে বিবৃত করেন :

- Tagore was but an intellectual agent (of the empire, acting) against the Indian freedom movement in the novel.[৯৮]

রবীন্দ্রনাথ ১৯২৪ সালে চীনে যান এবং বেইজিংয়ে বক্তৃতা দেন। সেই বক্তৃতার সময় লেকচার হলে একটি লিফলেট পাওয়া যায় যেখানে লেখা হয় :

- Dr. Tagore speaks of the "Heavenly Kingdom", "Almighty God" and "Soul". If these could remove us from misery what would be the use of man's endeavour to reform the world? We oppose D. Tagore, who tries to stunt the growth of self determination and the struggle of oppressed classes and races.[৯৯]

সোভিয়েত নেতা জোসেফ স্টালিন ১৯৩০ সালে রবীন্দ্রনাথকে মস্কো সফরের অনুমতি দেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কমিউনিস্ট রাশিয়ায় ব্যক্তি স্বাধীনতার দুর্গতির সমালোচনা করলে স্টালিন ক্ষুব্ধ হন এবং তিনি তার 'রাশিয়ার চিঠি' সোভিয়েত দেশে প্রকাশনা নিষিদ্ধ করেন। এমনকি তার সাক্ষাতকারও প্রকাশ হতে দেন নি।[১০০]

উপরের ঘটনা ও বিবৃতিগুলো থেকে স্পষ্ট হয় বিশ্বব্যাপী কমিউনিস্টরা প্রথম থেকেই মানুষ ও শিল্পী রবীন্দ্রনাথকে তাদের আদর্শের ছাঁচে ঢেলে মূল্যায়ন করার চেষ্টা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পান ১৯১৩ সালে। তারপর তার আন্তর্জাতিক খ্যাতি আরো বিস্তৃত হয়। কিন্তু কমিউনিস্টরা তাকে কখনোই বুর্জোয়া শিল্পীর অতিরিক্ত কিছু মনে করেন নি। রুশ বিপ্লবের পরে কমিউনিস্টরা টলস্টয় ও তুর্গেনিভের মতো সাহিত্যিককেও তাদের আদর্শের

---

৯৮. Mohammad Quayum, Review of Rabindranath Tagore: Ghare Baire (The Home and World). Published in Mukto-Mona Blog on February 13, 2007 and Aparthib Zaman, Reflections on Tagore, Arts, Politics and Rationalism. Published in Mukto-Mona Blog on May 7, 2005

৯৯. Aparthib Zaman, Reflections on Tagore, Arts, Politics and Rationalism

১০০. dua India, Sunday, 22 May, 2011

ভিত্তিতে সমালোচনায় জর্জরিত করেছিলেন। এদের কাছে গোর্কি কিংবা মায়াকোভস্কি যেভাবে সমাদৃত হয়েছেন, টলস্টয়, তুর্গেনিভের ক্ষেত্রে সেটা ঘটে নি। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে কমিউনিস্টদের বড় অভিযোগ ছিল তিনি গণমানুষের জন্য সাহিত্য রচনা করেন নি। তিনি তার সৃষ্টির ভিতর দিয়ে গরিব প্রলেতারিয়েতদের পক্ষে দাঁড়াতে পারেন নি। তিনি আকাশচারী কবি, গজেন্দ্র মিনারে বসবাস করেছেন। তার জমিদারি সংযোগ ও ব্রিটিশ শাসকদের প্রতি নমনীয়তার কারণেও প্রভূত সমালোচনা করেছেন এরা। মার্কসবাদী রাষ্ট্রীয় ও সমাজদর্শন, তার বস্তুবাদী চিন্তাপ্রণালী ও মূল্যবোধ, ধর্ম সম্পর্কে বিরূপতা, প্রলেতারিয়েত সংস্কৃতির প্রতি মুগ্ধতা প্রভৃতির আলোকে এরা রবীন্দ্রনাথকে একসময় পরিত্যাজ্য জ্ঞান করেছেন।

ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হলে এখানকার কমিউনিস্টরাও বিশ্বকমিউনিস্ট পার্টির লাইনে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা শুরু করেন। ১৯৩৫ সাল থেকে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির নেতা ও চিন্তক সাজ্জাদ জহীর, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ রবীন্দ্রনাথকে বুর্জোয়া কবি হিসেবে আখ্যা দেয়া শুরু করেন।[১০১] কমিউনিস্ট নেতা ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, যিনি লেনিনের সাথে দেখা করেছিলেন; তিনি রবীন্দ্রনাথকে বুর্জোয়া বলার চেয়ে সামন্ত বলাই সঠিক মনে করতেন।[১০২]বিনয় ঘোষের মতো বামপন্থী বুদ্ধিজীবীও রবীন্দ্রনাথের উপনিষদ প্রীতিতে ত্যক্ত হয়ে তাকে শেষ পর্যন্ত বুর্জোয়াই বলেছেন।[১০৩]

১৯৫০-এর দশক পর্যন্ত বাংলাদেশের কমিউনিস্টরা রবীন্দ্রনাথকে তাদের মতাদর্শের পাল্লায় বিবেচনা করেছেন। ১৯৪৯ সালে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির নেতা ভবানী সেন তৎকালীন 'মার্কসবাদী' পত্রিকার পঞ্চম সংকলনে (সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯) রবীন্দ্রগুপ্ত ছদ্মনামে 'বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা' নামে একটি বড় প্রবন্ধ লেখেন। সেই সময় কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ থাকায় সম্ভবত ভবানী সেন এই ছদ্মনামের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। এই প্রবন্ধে ভবানী সেন মার্কসবাদীদের উপর রবীন্দ্রপ্রভাবের অনিষ্টকারিতা সম্পর্কে সবাইকে হুশিয়ার করেছিলেন। এই প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন :

> রবীন্দ্র দর্শন এবং রবীন্দ্র সাহিত্যের ভিতরকার কথাই হোল এই সংসারের দুঃখ কষ্ট জ্বালা যন্ত্রণা শোষণ অবিচার অত্যাচার এ সমস্তের বিরুদ্ধে নিষ্ফল প্রতিবাদ করে লাভ নেই, প্রাণের সম্পূর্ণতা ছাড়া শোষিত মানুষের মুক্তির কোন উপায় নেই। তাই কোন শোষণ ব্যবস্থা উচ্ছেদ করার প্রচেষ্টা অত্যন্ত অন্যায়। এই দার্শনিক মত-ই কাব্য রস আকারে তিনি বুদ্ধিজীবীদের কাছে পরিবেশন করেছেন। ...

---

[১০১]. Tapati Dasgupta, Social Thought of Rabindranath Tagore: A Historical Analysis. New Delhi: Abhinav Publications, 1993

[১০২]. প্রাগুক্ত

[১০৩]. প্রাগুক্ত

- রবীন্দ্র কাব্য মূলত এই কথাই শেখায়— সংসারে তুমি যে সোনার পশরা লাভ করবে, তাতেই তোমার পারের তরী ভরে যাবে, তোমাকে নেবার ঠাঁই হবে না। সংসারের দ্বন্দ্বে তুমি একা এবং অসহায়। সংসারের সংঘাত থেকে পালিয়ে যাবার এ মন্ত্র রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক এবং দার্শনিক মতেরই কাব্যমূর্তি। এ মন্ত্র প্রতিক্রিয়াকে শক্তিশালী করে, প্রগতিকে নয় ।...
- রবীন্দ্র-দর্শনই ভারতীয় শাসকশ্রেণীর দর্শন। রবীন্দ্র-দর্শনকে আক্রমণ করতে হবে শাসকশ্রেণীকে পরাস্ত করার জন্য। রবীন্দ্র সাহিত্যের সঙ্গে মার্কসবাদের বিরোধ এত প্রচণ্ড যে, প্রগতির শিবিরে তার স্থান হতে পারে না। রবীন্দ্র সাহিত্য হলো প্রগতির শিবির থেকে মানুষ ভুলিয়ে বের করে নিয়ে যাবার মোহিনী মায়া।[১০৪]

ভবানী সেনের সাথে অনেকে একমত না হলেও মার্কসবাদের দৃষ্টিতে তার আলোচনার সারবত্তা খারিজ করা সম্ভব নয় এবং মূলে সে সমালোচনা সঠিক ছিল পশ্চিমবঙ্গের বুদ্ধিজীবী শিবনারায়ণ রায় সেখানকার কমিউনিস্ট আন্দোলনের এক স্তম্ভ হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের একটি ঘটনার উল্লেখ করে লিখেছেন :

- ১৯৪৯ সালের একটি ঘটনা মনে পড়ে। একটি ছাত্র-সভায় অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, আবু সয়ীদ আইয়ুব এবং আমি আহূত হয়ে যাই। তরুণ মনে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমানবতার আবেদন সম্পর্কে আমি কিছু বলি; প্রতিবাদে হীরেনবাবু ঘোষণা করেন রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ 'bastard culture'-এর প্রতিভূ (তিনি ইংরেজিতে বক্তৃতা দিয়েছিলেন)। তৎকালে এটিই ছিল কম্যুনিস্টদের সরকারি মত। পরে কম্যুনিস্টদের এই সিদ্ধান্ত বদলায়, হীরেনবাবুরও দৃষ্টিভঙ্গি বদলেছে।[১০৫]

১৯৬০-এর দশক থেকে কমিউনিস্টরা শিবনারায়ণের ভাষায় 'বদলাতে' শুরু করেন এবং রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এতকালের মার্কসীয় মূল্যায়ন ঝেড়ে ফেলেন। এতকাল তারা যা বিশ্বাস করতেন তার সম্পূর্ণ বিপরীত চিন্তার প্রত্যয়নপত্র তারা দাখিল করেন। ভবানী বাবুও বদলে যান, হীরেনবাবুও বদলে যান। তারা নাকি তাদের ইতিপূর্বেকার রবীন্দ্র মূল্যায়নের ভুল বুঝতে পারেন এবং খেসারত দেয়ার জন্য রবীন্দ্রনাথের নবমূল্যায়ন শুরু করেন। এরা রবীন্দ্রনাথের প্রতি কতটা শ্রদ্ধাশীল ছিলেন তা প্রমাণ করার জন্য নতুন নতুন প্রবন্ধ লেখা শুরু করেন। ভবানীবাবু কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, একজন মনস্বী ও একটি শতাব্দী (রবীন্দ্র-বীক্ষা, ড. নীলরতন সেন সম্পাদিত, ১৯৬১)। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে লেখেন Himself a true poem নামে একটি বই। কমিউনিস্টদের এই দিকবদল ও ডিগবাজীর মুল্যায়ন করেছেন নারায়ণ চৌধুরী:

---

১০৪. ভবানী সেন, রবীন্দ্র বিরোধীতা কেন, (পুনঃমুদ্রণ) বিজ্ঞাপন পর্ব, কলকাতা, এপ্রিল- জুন, ১৯৮৬।

১০৫. শিবনারায়ণ রায়, প্রবন্ধ সংগ্রহ। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০১

> প্রয়াত ভবানী সেন মহাশয়ের প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা রেখেই বলছি, এই ঘটনাটিই আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে গেল এদেশের মার্কসবাদীদের সুস্থির প্রত্যয় (কনভিকশন) বলে কিছু নেই বিশেষতঃ শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রশ্নে এরা হাওয়ার গতি বুঝে মত পাল্টান। ১৯৪৮-৪৯ সালে কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনী থাকাকালে এঁরা রবীন্দ্র সমালোচনায় মুখর হয়েছিলেন। আর তখন থেকে এক যুগ পরে স্বাধীনতাউত্তর অবস্থায় পার্টির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হওয়ায়, রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকীর বৎসরে রবীন্দ্রনাথকে ধূপ-ধূনা- চন্দন-গুগগুল চর্চিত করে আরতি করবার প্রয়োজন দেখা দিল। এ যদি বিশ্বাসের ডিগবাজি খাওয়া না হয় তো একে অন্য কোন্ নামে অভিহিত করা যায় জানিনে। বলাই বাহুল্য, এই মতবদলের পশ্চাতে বিশ্বাসের উত্তরণ যত না সক্রিয় তারচেয়ে অনেক বেশীগুণ সক্রিয় রয়েছে অন্য ধরনের হিসাব— কেজো হিসাব।[১০৬]

এই ডিগবাজি অবশ্য কমিউনিস্টদের জাত স্বভাব। প্রথম দিকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আজাদির লড়াইয়ের কথা বলতো। এরাই হিটলার রাশিয়া দখল করলে মত বদলে ফেলে এবং ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে তথাকথিত জনযুদ্ধের ধুয়া তুলে ব্রিটিশের দালালে রূপান্তরিত হয়। চল্লিশের দশকে মার্কসবাদীরা পাকিস্তান আন্দোলনকে সমর্থন করে। তাদের তখন যুক্তি ছিল ভারতবর্ষের মজলুম মুসলমানদের মুক্তির জন্য তাদের একটি জাতীয় রাষ্ট্র প্রয়োজন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এরা মত বদলায় এবং তাদের সে সময়কার ভূমিকাকে Himalayan blunder বলে হাহাকার করে।

যাই হোক রবীন্দ্র জন্ম শতবর্ষে (১৯৬১) পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্টরা কলকাতায় ১০ দিন ব্যাপী রবীন্দ্র শান্তিমেলার আয়োজন করে। এখানে দেশ-বিদেশের প্রতিনিধিরা যোগ দেয় এবং রবীন্দ্রনাথকে ব্যবহার করে কমিউনিস্টরা তাদের রাজনৈতিক অবস্থানকে মজবুত করার চেষ্টা করে। কবির জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষে কমিউনিস্ট পার্টির প্রকাশনা সংস্থা ন্যাশনাল বুক এজেন্সি কর্তৃক সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের কর্মী থেকে বাম বুদ্ধিজীবীতে পরিণত সাহিত্যিক গোপাল হালদারের সম্পাদনায় একটি সংকলন বের হয়। এতে সুশোভন সরকার, গোপাল হালদার, বিষ্ণু দে, চিন্মোহন সেহানবীশ প্রমুখ বাম চিন্তক ও বুদ্ধিজীবীরা লেখালেখি করেন। এসব বুদ্ধিজীবীরা ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা সম্বন্ধে পুরোপুরি অবগত ছিলেন। শ্রেণি সংগ্রাম ও সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদ বিষয়েও তাদের ধারণা কম ছিল না। তারপরেও এরা বুর্জোয়া রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এভাবে হামলে পড়লেন কেন? কলকাতার উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণদের সংস্কৃতির

---

১০৬. নারায়ণ চৌধুরী, 'রবীন্দ্রনাথ : আমাদের সংস্কৃতি জগতে একটি অমীমাংসিত সত্তা', মুগ্ধ ও মুক্তদৃষ্টির রবীন্দ্র বিতর্ক (মুস্তাফা মজিদ সংকলিত)। ঢাকা: ডানা প্রকাশনী,১৯৮৭

আদলে তারা রবীন্দ্রনাথকে অলৌকিক দেবতার আসনে বসিয়ে পূজায় নেমে পড়লেন কোন যুক্তিতে? এই রবীন্দ্র শান্তিমেলার শেষ দিনে কমিউনিস্টরা জনগণের উদ্দেশ্যে আবেদনমূলক একটি প্রচারপত্র প্রকাশ করেন যার কিছুটা উদ্ধৃত করছি :

> যিনি সর্বদেশের মানুষের মহান বন্ধু, স্বাধীনতা ও বিশ্বমৈত্রীর অগ্রপথিক— সেই মানবপ্রেমিক কবি, আমাদের স্বদেশবাসী গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করার জন্য আমরা, ভারতবর্ষের লেখক, শিল্পী ও বিজ্ঞানীরা আমাদের দেশের জনসাধারণের সঙ্গে রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকীর শান্তি- উৎসব রবীন্দ্রমেলায় সমবেত হয়েছি। যে মানুষ নিজের জোরে ও বুদ্ধিমত্তায় বিশ্বপ্রকৃতিকে জয় করেছেন, হৃদয় দিয়ে সৃষ্টির মাধ্যমে যে মানুষ মর্মজগৎকে মুগ্ধ করেছেন, সকল মহাদেশ পরিব্যাপ্ত সেই মানুষের কণ্ঠস্বর তাঁর রচনায় প্রতিধ্বনিত। মানুষের প্রতি তিনি বিশ্বাস হারাননি কোনোদিন। তাঁর সেই বিশ্বাসে উদ্দীপিত আমরা এখানে সমবেত হয়ে সমস্ত মানুষের উদ্দেশেই জানাই আপনাদের অভিনন্দন । স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সমস্ত দেশের জনগণ, আমরা আপনাদেরই অংশ, আপনারা আমাদের। আপনারাই আমাদের প্রাণশক্তি ও উদ্দীপনার মহান উৎস। ... সর্বোপরি পৃথিবীর সমস্ত বুদ্ধিজীবী, কর্মী এবং জনগণ, আপনাদের প্রতি আবার আমাদের আবেদন এই, যে ধ্রুবমন্ত্র ছিল রবীন্দ্রনাথের আমৃত্যু শরণ্য, সেই মন্ত্রই হোক আমাদের পথের দিশারী। আসুন, মানবপ্রেমিক কবি, আমাদের গুরুদেবের এই মানসিকতায় প্রণোদিত হয়ে আমরা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য, ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতিবাহী বর্তমানের জন্য, শিল্পীর ব্রত পালনের জন্য এবং যুদ্ধহীন মুক্ত শান্তির পৃথিবীর জন্য আত্মনিয়োগ করি।[১০৭]

এ মনোভাব রবীন্দ্রপূজার শামিল। সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী কবিকে নিয়ে যুদ্ধবিহীন শান্তির পৃথিবী গড়ার প্রত্যয়ের মধ্যে রাজনৈতিক মতলববাজী থাকতে পারে। আদর্শবাদিতার নাম-গন্ধ নেই ।

কমিউনিস্টদের এই ডিগবাজি ও দিকবদলের একটি সামাজিক কারণ আছে। ত্রিশের দশকের বাঙালি কমিউনিস্টরা জনসমর্থন তেমন পান নি । কিন্তু মার্কসবাদী নৈতিকতায় এরা বেশ উঁচু মাপের ছিলেন। উল্লেখ্য, এদের মধ্যে কয়েকজন মুসলমান ঘরে জন্মগ্রহণকারী কমিউনিস্টও ছিলেন। এদের মধ্যে ছিলেন মুজফফর আহমদ, আবদুর রাজ্জাক খান ও আবদুল হালিম প্রমুখ এদের পরে বাংলাদেশে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব যারা নেন, তাদের প্রায় সকলেই এককালীন সন্ত্রাসবাদী যুগান্তর, অনুশীলন কিংবা সূর্যসেনের নেতৃত্বাধীন সন্ত্রাসী গ্রুপ

---

১০৭. অনির্বাণ সেনগুপ্ত, 'সৃষ্টির একুশ শতক', উৎসব সংখ্যা, ১৪১৭। উদ্ধৃত: আবদুশ শাকুর, রবীন্দ্রচর্চায় বাম বলয়ের ঐতিহাসিক অবদান, নতুন দিগন্ত, এপ্রিল-জুন,২০১১

থেকে এসে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেয়ার কারণে এরা রাজনৈতিকভাবে হিন্দুত্ব, সন্ত্রাসবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, মুসলিম বিদ্বেষ হয়তো তাৎক্ষণিকভাবে ত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু ঐ রাজনৈতিক ভাবাদর্শ যে মানসিক কাঠামো তৈরি করেছিল তার থেকে মুক্ত হওয়া সহজ ব্যাপার ছিল না। একই কারণে কালচারাল হিন্দুইজমকেও তারা ত্যাগ করতে পারেন নি

দ্বিতীয়ত, এই শ্রেণির কমিউনিস্টরা প্রলেতারিয়েত শ্রেণি থেকেও আসেন নি। এরা শ্রেণির দিক থেকেও ছিলেন ভূমিমালিক কিংবা পেটি বুর্জোয়া। ব্যারিস্টার জ্যোতিবসু কিংবা হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে আর যা-ই হোক প্রলেতারিয়েত বলা যাবে না। এই শ্রেণি একদিন ব্রিটিশের সহযোগিতায় ঔপনিবেশিক কলকাতাকে কেন্দ্র করে বাঙালি সংস্কৃতির মডেল তৈরি করে— যার পুরোটাই ছিল হিন্দুয়ানী। এই সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠতম রত্ন হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই সন্ত্রাসবাদী, একই সাথে উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণরা রাজনৈতিকভাবে কমিউনিজমে দীক্ষা নিলেও সাংস্কৃতিকভাবে হিন্দুয়ানী রয়ে যান। এই কারণেই তারা মার্কসের সাথে এত সহজে রবীন্দ্রনাথকে গুলিয়ে ফেলেন ।

তাছাড়া ব্রাহ্মণদের সংস্কৃতি আজ অবধি পশ্চিমবঙ্গকে নেতৃত্ব দিচ্ছে। এটা রাজনীতি করতে এসে কমিউনিস্টরা ঠিকই বুঝেছিলেন। সুতরাং ঐ সংস্কৃতিকে মার্কসবাদের বোতলে না পুরলে রাজনৈতিক ক্ষমতা পাওয়া যাবে না। নতুন পরিস্থিতিতে সেটিও ছিল কমিউনিস্টদের রবীন্দ্রপূজার অন্যতম কারণ। বিশ্বের বিভিন্ন জায়গার কমিউনিস্ট আন্দোলনের সাথে বঙ্গীয় কমিউনিস্টদের এই হচ্ছে মৌলিক তফাৎ। এই কারণেই বাঙলা ভাষা-ভাষীদের ভিতর কোনো কমিউনিস্ট বিপ্লব হয় নি। পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্টরা দীর্ঘদিন ক্ষমতায় ছিল এটা সত্য। কিন্তু ব্যারিস্টার জ্যোতি বসু কিংবা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যরা যতখানি কমিউনিস্ট কিংবা সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদী ছিলেন, রাজনৈতিকভাবে তার চেয়ে বেশি ছিলেন ভারতীয় জাতীয়তাবাদী। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের কাঠামোর মধ্যে থেকেই তারা রাজনীতি করেছেন এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ভারতীয় জাতীয়তাবাদকেই চূড়ান্ত হিসেবে মান্য করেছেন। এই কারণে টাটা-বিড়লার স্বার্থের সাথে শ্রমজীবী মজুরদের স্বার্থকে তারা একই আয়নায় দেখতে কখনো দ্বিধা করেন নি। এটাকে বলা যায় Hinduised বা Indianised Marxism। এই কারণেই পশ্চিম বঙ্গের কমিউনিস্ট নেতা জ্যোতিবসু দ্বিধাহীনভাবে বলতে পারেন পাঁচশো বছরের মধ্যেও দু' বাংলা এক হবে না।[১০৮] উল্লেখ্য এই জ্যোতিবসুই ১৯৪৭ সালে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদে কংগ্রেস সদস্যদের সাথে বাংলা ভাগের পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন।

---

[১০৮]. বুলবন ওসমান, সাবধান, ওরা সজনে ফুল হয়ে আসছে গো, পশ্চিম থেকে পূর্ববঙ্গ : দেশ বদলের স্মৃতি, (সম্পাদনা, রাহুল রায়), কলকাতা: গাঙচিল, ২০১৫

পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্ট রাজনীতির সাথে পূর্ববঙ্গের কমিউনিস্ট রাজনীতির মৌলিক কোনো তফাৎ ছিল না। পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানভুক্ত হলেও এর নেতৃত্বে প্রথম দিকে মূলত হিন্দুরাই থাকেন— খোকা রায়, মণি সিংহ, পূর্ণেন্দু দস্তিদার, অমূল্য লাহিড়ী, সত্যেন সেন, জিতেন ঘোষ, জ্ঞান চক্রবর্তী প্রমুখ। এদের অনেকেই সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। সুতরাং কমিউনিস্ট পার্টি করলেও এদের মনন ও সংস্কৃতি ভাবনা কলকাতাকেন্দ্রিক উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণদের অনুরূপই ছিল এবং ঐ চোখ দিয়েই তারা পূর্ববঙ্গের সংস্কৃতি ও রাজনীতিকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করতেন। পাকিস্তান হবার বহুদিন পরও কমিউনিস্ট পার্টির উভয় বাংলার মিলিত একটি প্রাদেশিক কমিটি ছিল এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ছিল একটি আঞ্চলিক কমিটি। পূর্ববঙ্গ কমিউনিস্ট পার্টির মূল রাজনীতি নিয়ন্ত্রিত হতো কলকাতা থেকেই। কমিউনিস্টদের এই কলকাতাকেন্দ্রিক মুগ্ধতা তাদেরকে ভারতমুখী করে তোলে এবং তাদের এদেশীয় রাজনীতি অখণ্ড ভারতীয় রাজনীতির স্বার্থকেই রক্ষা করে।

পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট পার্টিতে অনেক মুসলমান পরিবারের ছেলেরা এসেছেন। মুনীর চৌধুরী, সরদার ফজলুল করিম, আবদুল মতিন, মাহবুব জামাল জাহেদী, শহীদুল্লাহ কায়সার প্রমুখ। এরা নিজেদের যোগ্যতায় যথেষ্ট খ্যাতিমান হয়েছেন। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি করলেও ঐতিহাসিক কারণেই এরা সাংস্কৃতিক চিন্তার গঠনের দিক দিয়ে ঐ কলকাতাকেন্দ্রিক সংস্কৃতির শিকলে বাধা পড়েছেন এবং বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এমন এক বাঙালি সংস্কৃতির বয়ান হাজির করেছেন যা ইসলামকে বাঙালির দুশমন হিসেবে হাজির করে এবং বিভাগপূর্ব কংগ্রেসের অখণ্ড ভারতীয় জাতীয়তার তত্ত্বকে মিত্র হিসেবে গণ্য করে। এরাই বাঙালি সংস্কৃতির আড়ালে রবীন্দ্রনাথ ও একধরনের হিন্দুয়ানীকে এদেশে সেকুলার এলিটিজমের আকারে প্রতিষ্ঠা করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। একই কারণে এদেশের কমিউনিস্টরা বরাবর এদেশের গণমানুষের মধ্যে প্রবহমান মুসলিম জাতীয়তাবাদকে প্রতিক্রিয়াশীল হিসেবে চিহ্নিত করে ভারত বিভাগকে মনে করে রীতিমতো গুনাহ। এই বিশেষ চিন্তার গঠনের কারণে পূর্ববাংলার কমিউনিস্টরা প্রলেতারিয়েত সংস্কৃতির চর্চা না করে কলকাতাকেন্দ্রিক ব্রাহ্মণদের সংস্কৃতি চর্চা করেছেন। সত্যেন সেনের হাতে গড়া উদিচীর শিল্পীরা যখন বুর্জোয়া কবি রবীন্দ্রনাথের গান ঠোঁটে তুলে নেন তখন প্রলেতারিয়েত সংস্কৃতি হাহাকার করে মরে আর মার্কসবাদের সাথে করা হয় বড় রকমের তামাশা।

সামন্ত পরিবারের মেয়ে ইলা মিত্র মুসলিম লিগ সরকারের বিরুদ্ধে সাঁওতাল বিদ্রোহের বীজ ঢুকিয়ে বলেন এটা শোষিতের লড়াই। কিন্তু ওপার বাংলায় অবস্থানকারী সাঁওতালদের মধ্যে তিনি এরকম কোনো বিদ্রোহের বীজ খুঁজে পান না। যেন ওপারে কোনো শোষক-শোষিতের লড়াই নেই, শ্রেণি সংগ্রাম নেই। কারণ ওখানে ইলা মিত্রের কাছে সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদ নয়, ভারতীয় জাতীয়তাবাদই শেষ কথা। একই কারণে কমিউনিস্টরা

এপার বাংলায় ভাষা আন্দোলনে নেমে পড়েন এবং উর্দুর বিরোধিতা করেন। কিন্তু ওপার বাংলায় তারা হিন্দির বশ্যতা মেনে নেন এবং ভাষা আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন না। ১৯৬০-এর দশকে যখন পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে রাজনীতি জমে ওঠে তখন কমিউনিস্টরা তাদের বিশেষ সাংস্কৃতিক চৈতন্যের কারণেই সামন্ত ও বুর্জোয়া রবীন্দ্রনাথেরই পক্ষ নেন। এসময় বাম বুদ্ধিজীবী মুনীর চৌধুরী এদেশের মুসলিম জাতীয়তাবাদ বিরোধী রবীন্দ্রগুণমুগ্ধ বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে একটি বিবৃতি লিখে প্রচার করেন এবং এ বিবৃতির পক্ষে সে সময় ১৯ জন কবি, শিল্পী, শিক্ষাবিদ স্বাক্ষর করেন। মুনীর চৌধুরী এখানে রবীন্দ্রনাথকে বাঙালি মুসলমানের সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে দাবি করেন।[109]

মুনীর চৌধুরীর এ দাবী কমিউনিস্ট পার্টির অফিসিয়াল পলিসি বলা চলে। গোড়ায় মুনীর চৌধুরী রবীন্দ্রবিরোধীই ছিলেন। পরে অন্যান্যদের মতো তার মতের পরিবর্তন হয়। রবীন্দ্রনাথকে বাঙালি মুসলমানের সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ বলতে হলে তার প্রাচীন ভারতের আদর্শ, উপনিষদিক সংস্কৃতি, তপোবন, হিন্দি 'রাষ্ট্রভাষা চিন্তা থেকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদে আস্থা প্রভৃতিকেও অবিচ্ছেদ্য হিসেবে গণ্য করতে হয়। মুনীর চৌধুরীরা জেনেশুনেই এ দাবি করেছিলেন। তাদের এ রাজনীতিটা ছিল কমিউনিজমের মুখোশের অন্তরালে ভারতীয় রাজনীতির স্বার্থরক্ষা করা। এদেশে এই সিলসিলা আজও কমিউনিস্টরা বহন করে চলেছেন। বাম বুদ্ধিজীবী সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, আহমদ রফিক থেকে হায়দার আকবর খান রনো কেউই ঐ চিন্তাভাবনার ব্যতিক্রম নন। চীন-ভারত সম্পর্কের সূত্রে এদেশের চীনপন্থী কমিউনিস্টরা কখনো কখনো ভারত বিরোধিতার কথা বললেও সাংস্কৃতিকভাবে তারা ভারতবিমুখ নন। এক্ষেত্রে রবীন্দ্র বন্দনায় তাই চীনপন্থী-রুশপন্থী কমিউনিস্টদের কেউ পিছিয়ে নেই।

বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্তের একাংশ আজ রবীন্দ্রনাথের মাথা দিয়ে চিন্তা করে, নিজের মাথা দিয়ে কিছু ভাবতে চায় না। বাঙালি মুসলমানের আজকের, সংকটের শুরু এখান থেকেই। তার জাতি পরিচয়, আত্মপরিচয়ের সংকটের গোড়াও এখানে। রবীন্দ্রনাথকে অকৃত্রিমভাবে অধ্যয়ন এক জিনিস আর হাল আমলে বাঙালি মুসলমান ভদ্রলোকশ্রেণির বিশ্বভারতী বা ছায়ানটের প্রেসক্রিপশনের রবীন্দ্রনাথ আরেক জিনিস। বড় গোল টিপসহ শাড়ি আর পাঞ্জাবি পরে হারমোনিয়াম সামনে দুলে না উঠলে রবীন্দ্রনাথকেও পাওয়া যায় না, অন্যদিকে 'খাঁটি' বাঙালিত্বের চর্চাও হয় না।

বাংলাদেশের বাম রাজনীতি যেহেতু এক সময়ের অনুশীলন সমিতির থেকে ধাওয়া খাওয়া ব্রাহ্মণদের হাতে গড়ে উঠেছিল তাই এরা কালচারাল হিন্দুইজমকে বাদ দিতে পারে নি। বাম রাজনীতির কালচারাল প্রজেক্টগুলো এদেশে বরাবর রবীন্দ্রনাথের আড়ালে এক ধরনের

[১০৯]. গোলাম মুরশিদ, রবীন্দ্র বিশ্বে পূর্ববঙ্গ, পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রচর্চা। ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮১

কালচারাল হিন্দুইজমকে নার্সিং করেছে। এই বামরা কালচারাল হিন্দুইজমকে বাংলাদেশের মানুষের ডমিনেন্ট কালচারের (মুসলিম কালচার) বিরুদ্ধে অসাম্প্রদায়িকতার প্রেসক্রিপশন অনুসারে জাতীয় কালচার হিসেবে খাড়া করার নিরবধি চেষ্টা করে চলেছে এবং মুসলমানকে মুসলমানিত্ব ছেড়ে কালচারাল হিন্দুত্ব গ্রহণের নাম প্রগতিশীলতা, অসাম্প্রদায়িক চেতনা এই বয়ানটি খাড়া করেছে। পহেলা বৈশাখ, একুশে ফেব্রুয়ারি, রবীন্দ্র জয়ন্তী প্রভৃতি অনুষ্ঠানাদিতে এই কালচারাল হিন্দুইজমকে আজ আমরা প্রকাণ্ড আকারে দেখতে পাই। এর পিছনে বাংলাদেশের বামপন্থীদের অবদানই মুখ্য।

বাংলাদেশের বামপন্থীদের কালচারাল প্রজেক্টের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে বাঙালি মুসলমানের সংস্কৃতির রবীন্দ্রায়ন। এর মতলব হচ্ছে বাঙালি মুসলমানের সংস্কৃতিকে নিউট্রালাইজ করে সেই শূন্যস্থানকে কালচারাল হিন্দুইজম দিয়ে ভরিয়ে তোলা।

এদেশে হিন্দু ও মুসলমানের সংস্কৃতি যে এক জিনিস নয় এটা রবীন্দ্রনাথও জানতেন। ১৯৪৭ সালে বাংলা ভাগের আগে রবীন্দ্রের স্নেহধন্য বাঙালি মুসলমান ড. মুহাম্মদ কুদরত-ই-খোদার ১৯৩৬ সালে করা জিজ্ঞাসার জবাবে কবি বলেছিলেন :

> হিন্দু-মুসলিম বন্ধুত্ব অসম্ভব। হিন্দু সমাজকে আমি যতটা জানি, তুমি ততোটা জান না। উদ্বিগ্ন কুদরত-ই-খোদা যখন জিজ্ঞাসা করেন : তাহলে সমাধান কি? রবীন্দ্রনাথ বলেন : স্বাধীনতা তখনই আসবে, যখন পুরো দেশ হিন্দু না হয় মুসলমান হবে।[১১০]

রবীন্দ্রনাথ যা চান নি তা এদেশের বামপন্থী রবীন্দ্রানুরাগীরা কেন চান? এটা সত্য হিন্দু-মুসলমানের কালচারাল সিনথেসিসের কথা অনেক সময় আমরা শুনেছি। এসব কথা শুনতে যত মধুর, বাস্তব ইতিহাস ততোটা মধুর নয়। হিন্দু- মুসলমানের দ্বন্দ্ব একটা ঐতিহাসিক সত্য এবং তার পরিণতি দেশ ভাগ। এদেশের বামপন্থীরা এই ইতিহাসের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন এবং সাম্প্রদায়িকতার যারা স্রষ্টা তাদেরকে সাম্প্রদায়িক না বলে সংখ্যাগুরুর সংস্কৃতিকে সাম্প্রদায়িক বয়ানের আকারে হাজির করেছেন। মতলব একটাই। সংখ্যাগুরুর সংস্কৃতিকে নিউট্রালাইজ করতে পারলে তার জাতীয় চেতনা দুর্বল হয়ে যাবে এবং ব্রাহ্মণ্যবাদের আধিপত্যকে পাকাপাকি করা সহজ হবে। এজন্যই রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এ দেশের বামপন্থীদের এত অনুরাগ।

একুশ শতকের প্রারম্ভে ভারতীয় আধিপত্যবাদ যখন বাংলাদেশকে চারদিক থেকে অক্টোপাসের মতো ঘিরে ফেলেছে তখনো এদেশের কমিউনিস্টরা ভারতীয় রাজনীতির সর খেয়ে চলেছেন এবং রবীন্দ্রনাথকে ঐ রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছেন।

---

১১০. মুহাম্মদ কুদরত-ই-খোদা, 'কবি স্মৃতি', ভুইয়া ইকবাল, রবীন্দ্রনাথ ও মুসলিম সমাজ। ঢাকা : প্রথমা প্রকাশন, ২০১২।

তপোবন বিশ্ববিদ্যালয়

তপোবন শব্দটার মানে হচ্ছে মুনি-ঋষিদের আশ্রম কিংবা যে বনে মুনি-ঋষিরা তপস্যার জন্য বসবাস করেন। তপোবনে সাধারণত সংসারত্যাগী হিন্দু সন্ন্যাসীরা সাধনা ও শাস্ত্র চর্চার জন্য অবস্থান করেন। আশ্রম কথাটার মানেও হচ্ছে সংসারত্যাগী সাধু-সন্ন্যাসীদের বাসস্থান। রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতের হিন্দু ঋষিদের আদর্শে তার ধ্যানের শান্তি নিকেতন গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। সেই অর্থে শান্তি নিকেতনকেও বলা চলে এক ধরনের তপোবন বা আশ্রম। শান্তি নিকেতন নামটা দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আজ যে শান্তি নিকেতনের কথা শুনে আমরা আপ্লুত হই সেটা পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার বোলপুরে অবস্থিত। দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন রাজা রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত একেশ্বরবাদী ব্রাহ্ম ধর্মের অনুসারী ও নেতা। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন গভীরভাবে ধর্মনিষ্ঠ ও আধ্যাত্মিক প্রকৃতির মানুষ। জমিদারী ছেড়ে আধ্যাত্মিক সাধনার উদ্দেশ্যে তিনি মাঝে মাঝে হিমালয়ে সন্ন্যাসীদের মতো নির্জনবাসে চলে যেতেন। আজ যেখানে শান্তি নিকেতন, সেখানে ছিল বিরাট দুটি ছাতিম গাছ আর আদিগন্ত মাঠ। এমনি আসা-যাওয়ার পথে ছাতিম গাছের ছায়া দেবেন্দ্রনাথকে পুলকিত করে। তিনি এখানে একটি আশ্রম গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেন। এই আশ্রম পত্তন করে এবং ছাতিম গাছের চারদিকে আরো অনেক গাছ রোপণ করে সাধনার জন্য তিনি এখানে মাঝে মাঝে আসতেন। শান্তি নিকেতন নাম দিয়েছিলেন এজন্য যে, তিনি এখানে এসে আধ্যাত্মিক শান্তি খুঁজে পেতেন।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, এখানে ছাতিম তলায় দেবেন্দ্রনাথ সূর্য ওঠার আগে এবং সূর্যাস্তের সময় ধ্যান করতে বসতেন এবং ভগবদ্গীতা ও উপনিষদের শ্লোক পাঠ করতেন। এখনও শান্তি নিকেতনের ছাতিম গাছের তলায় দেবেন্দ্রনাথের উপাসনার বেদির উপরের ফলকে লেখা আছে তার বাণী 'তিনি আমার প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, আত্মার শান্তি।' দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে ছোট বয়সেই রবীন্দ্রনাথ এসব জায়গায় ঘুরতে এসেছিলেন। তাই বলা চলে, বাল্যকাল থেকে প্রাচীন ভারতবর্ষের তপোবনের একটা আদর্শের ছাপ রবীন্দ্রনাথের মনের ওপর পড়েছিল। ১৮৬৩ সালে দেবেন্দ্রনাথ এই শান্তি নিকেতন আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে ছিল উপাসনা মন্দির, লাইব্রেরি ও অতিথিদের থাকার ব্যবস্থা। এই আশ্রমের রূপ ছিল পুরোপুরি আধ্যাত্মিক ও ধর্মভাবের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

শান্তি নিকেতনের এই জনশূন্য প্রান্তরে ১৯০১ সালে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহে গড়ে ওঠে শান্তি নিকেতন বিদ্যালয়। দেবেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের ওপর এই বিদ্যালয় গড়ে তোলার ভার দেন। দেবেন্দ্রনাথও বুঝতে পেরেছিলেন তার মিস্টিক ও ধর্মভাবটি রবীন্দ্রনাথই কিছুটা পেয়েছেন। এই বিদ্যালয় গড়ার জন্য রবীন্দ্রনাথ পূর্ববঙ্গের জমিদারী ছেড়ে বীরভূমের রুক্ষ কঠিন প্রান্তরে

এসে উপস্থিত হন। শান্তি নিকেতনের মাটি ছিল লাল। এটিকে পটভূমি রেখেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন তার বিখ্যাত গান— গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙ্গা মাটির পথ, আমার মন ভুলায়রে।

শান্তি নিকেতন বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ছিল ব্রহ্মচর্য আদর্শে বালকদের জীবনযাপন ও শিক্ষালাভ। এজন্য এই বিদ্যালয়কে বলা হতো শান্তি নিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম ব্রহ্মচর্য হচ্ছে হিন্দু শাস্ত্রমতে ভোগবাসনা বর্জিত জীবনযাপন। এই বিদ্যালয় ছিল আবাসিক। এর ছাত্রদের পুরোপুরি হিন্দু সমাজের আচার পালন করতে হতো । যা কিছু হিন্দু সমাজ বিরোধী তা এ বিদ্যালয়ে নিষিদ্ধ ছিল। প্রাচীন ভারতের সন্ন্যাসীদের আদর্শ যেমন— বিলাস ত্যাগ, আত্মসংযম, নিয়মনিষ্ঠা, বর্ণাশ্রম প্রভৃতি বিষয়ের ওপর এখানে জোর দেয়া হতো। তেমনি শিক্ষকদের প্রতি নির্বিচার ভক্তির কথা বলা হতো। শান্তি নিকেতনে এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগ ও ভূমিকা নিয়ে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন :

> শান্তি নিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হলে রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীদের যে উপদেশ দেন তাহাও তাঁহার এই সময়ের সামাজিক ও ধর্মীয় মতের সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনি। রবীন্দ্রনাথ মানবদিগকে ব্রহ্মচর্যে দীক্ষিত করিয়া প্রাচীন ভারতের গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ পরিষ্কারভাবে তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন, "আজ থেকে তোমাদের ব্রহ্মব্রত। এক ব্রহ্ম তোমাদের অন্তরে-বাহিরে সর্বদা সকল স্থানেই আছেন। ... প্রত্যহ অন্তত একবার তাঁকে চিন্তা করিবে। তাঁকে চিন্তা করিবার মন্ত্র আমাদের বেদে আছে। এই মন্ত্র আমাদের ঋষিরা, দ্বিজেরা প্রত্যহ উচ্চারণ করে জগদীশ্বরের সম্মুখে দণ্ডায়মান হতেন। সেই মন্ত্র, হে সৌম্য, তুমিও আমার সঙ্গে সঙ্গে একবার উচ্চারণ করো।" ইহার পর তিনি গায়ত্রী মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিলেন। পাঠক লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, ধর্ম সাধনার জন্য গায়ত্রী মন্ত্রের উপর কবির শ্রদ্ধা অপরিসীম; এ বিষয়ে তাহাকে রামমোহন রায় ও মহর্ষির আধ্যাত্মিক সাধনার উত্তরাধিকারী বলা যাইতে পারে। মন্ত্রের শক্তি ও সাধনায় তিনি চিরদিন শ্রদ্ধাবান। তিনি বহুবার বলিয়াছিলেন যে জীবনের চরম সংগ্রামের মুহূর্তে এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্ত্রগুলির ধ্যানে মানবমনকে অসীম বল দান করে।[১১১]

আশ্রম বিদ্যালয়ের শিক্ষককে বলা হতো গুরু। রবীন্দ্রনাথকে যে গুরুদেব বলা হয় তা-ও কিন্তু ওই প্রাচীন ভারতের আদর্শের অনুকরণ। শান্তি নিকেতন বিদ্যালয়ে কবি এই গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। জ্ঞানার্জন বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক হবে পুরোপুরি আধ্যাত্মিক। তিনি ছাত্রদের জন্য ব্রাহ্মণ শিক্ষকদের পদস্পর্শপূর্বক প্রণাম বাধ্যতামূলক করেছিলেন। অব্রাহ্মণ শিক্ষকদের জন্য এ ব্যবস্থা রাখেন নি। এর ভেতরেও আছে কবির সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি । জাতপাতের বিচার থেকে এই আশ্রম কিন্তু মুক্তি পায় নি এই

---

[১১১]. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র জীবনী, ২য় খণ্ড। কলকাতা : বিশ্বভারতী, বাংলা ১৪২০

আশ্রম বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালীতে আমরা পুরোপুরি হিন্দু ধর্মের পরিবেশ পাই। নীরবতা পালনের ব্যবস্থা, প্রার্থনার নির্ধারিত স্থান, ধ্যানের নির্ধারিত স্থান এবং গায়ত্রী মন্ত্র পাঠ তারই আয়োজন । রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতীয় রীতি অনুসারে পরিবেশের সঙ্গে আধ্যাত্মিক শিক্ষার যোগসূত্র ঘটানোর কথা বলতেন। এ কারণে এখানে গাছতলায় ক্লাশ হতো। এখনও সে রীতি প্রচলিত আছে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, তিনি জামতলায় বসে ছাত্রদের রামায়ণ-মহাভারত থেকে পাঠ করে শোনাতেন। প্রথমদিকে এ বিদ্যালয়ে সংস্কৃত জানা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরাই শিক্ষকের কাজ করতেন। তারা ব্রাহ্ম ধর্মগ্রন্থ থেকে উপনিষদের শ্লোক ব্যাখ্যা করে পড়াতেন। বিধুশেখর শাস্ত্রী ছিলেন এখানে সংস্কৃতের পণ্ডিত। তিনি প্রাচীন টোল চতুষ্পাঠীর শিক্ষা প্রণালীকে কিছুটা সংস্কার করে এবং একে পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করে নতুন একটা শিক্ষা প্রণালী শান্তি নিকেতন বিদ্যালয়ে প্রচলন করার জন্য রবীন্দ্রনাথের অনুমতি চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাতে সায় দিয়েছিলেন। শান্তি নিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষা প্রণালীকে বলা যাবে না কোনোভাবেই আধুনিক ও সেকুলার । আচার্য যদুনাথ সরকার ও শিবনারায়ণ রায় শান্তি নিকেতন বিদ্যালয় ও পরবর্তীকালের বিশ্বভারতীকে টোল ও চতুষ্পাঠীর বেশি মনে করতেন না।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মৃত্যুর আগে ডিড করে গিয়েছিলেন এই বলে যে এই প্রতিষ্ঠান শুধু ব্রাহ্মধর্ম প্রচার ও প্রসারের পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্টি হয়েছে। নিজের গড়া প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন :

শান্তি নিকেতনে আমি একটি বিদ্যালয় খুলিবার চেষ্টা করিতেছি। সেখানে ঠিক প্রাচীন কালের গুরুগৃহবাসের মতো সমস্ত নিয়ম। বিলাসিতার নাম গন্ধ থাকিবে না— ধনী-দরিদ্র (ঘরের ছাত্রদের) সকলেরই কঠিন ব্রহ্মচর্যে দীক্ষিত হইতে হইবে। উপযুক্ত শিক্ষক কোনোমতেই খুঁজিয়া পাইতেছিনা। এখনকার কালের বিদ্যা ও তখনকার কালের প্রকৃতি একত্রে পাওয়া যায় না। স্বার্থচেষ্টা এবং আড়ম্বর হইতে কোনো মহৎ কার্যকে বিচ্যুত করিতে গেলে কাহারও মুখরোচক হয় না। এতদিনকার ইংরেজি বিদ্যায় আমাদের কাহারও যথার্থ কর্মযোগী করিতে পারিল না কেন? ব্রহ্মচর্য্য না শিখিলে আমরা প্রকৃত হিন্দু হইতে পারিবনা। অসংযত ছেলেবেলা হইতে প্রবৃত্তি এবং বিলাসিতা আমাদিগকে ভ্রষ্ট করিতেছে— দারিদ্রকে সহজে গ্রহণ করিতে পারিতেছিনা বলিয়াই সকল প্রকার দৈন্যে আমাদিগকে পরাভূত করিতেছে ...[১১২]

রবীন্দ্রনাথ ১৯১২ সালে শান্তি নিকেতনের কাছে সুরুলগ্রামে শ্রী নিকেতনের কাজ শুরু করেন। তিনি বিশ্বভারতীর সূচনা করেন ১৯১৮-তে এবং তার আনুষ্ঠানিক স্থাপনা হয় ১৯২১-

[১১২].১৯০১ সালের আগস্টে স্যার জগদীশ চন্দ্র বসুকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শান্তি নিকেতন বিদ্যালয়ের শিক্ষাদর্শ : পত্র ও প্রবন্ধ সংকলন । কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৩৮৯, পত্রসংখ্যা-১, পৃ: ৩

এ। শ্রী নিকেতনের উদ্দেশ্য ছিল গ্রামচর্চা ও পল্লী সংগঠন। বিশ্বভারতীর উদ্দেশ্য ছিল প্রাচীন ভারতীয় আর্য আদর্শ ও সভ্যতাকে বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত করে দেয়া। বিশ্বভারতীকে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এর প্রকৃতি প্রচলিত বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো ছিল না। কবির জীবিতকালে বিশ্বভারতী থেকে ডিগ্রি দেয়া হতো না। বিশ্বভারতীর শিক্ষাকে তিনি ডিগ্রির শিক্ষা হতে দিতে চান নি । প্রয়োজনের খাতিরে শান্তি নিকেতন-শ্রী নিকেতনে পাঠান্তে ছাত্রছাত্রীরা কেউ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিয়ে ডিগ্রি নিত । এই ব্যবস্থা কবি করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন কর্ণধার স্যার আশুতোষ মুখার্জির সহায়তায়।

শান্তি নিকেতন আশ্রম থেকে শুরু করে শান্তি নিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম, তারপর শ্রী নিকেতন ও বিশ্বভারতী— কবির প্রাচীন ভারতীয় ভাবাদর্শের একটি ধারাবাহিক পরম্পরা মাত্র। এসব প্রতিষ্ঠানের ভেতর দিয়ে কবি প্রাচীন ভারতের হিন্দু আদর্শকে কীভাবে আধুনিক জীবনে সফল করে তোলা যায় তার কার্যকরী দিকগুলো নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছিলেন। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভেতর দিয়ে তিনি যে জীবনধারা সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন তার পেছনে কবির ধর্মভাব একটা বড় ভূমিকা পালন করেছিল। রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরে আপ্লুত মানুষ ছিলেন। ধর্মভাব ছাড়া থাকতে পারতেন না। তিনি তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই ঈশ্বর ভাবটি পুরোপুরি ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন।

আমাদের দেশে রবীন্দ্রচর্চার চেয়ে রবীন্দ্রপূজার পরিমাণই বেশি। এই পূজা আবার অধিকাংশই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যমণ্ডিত। এসব রবীন্দ্রপূজারীর দল আমাদের এখানে সেকুলার, আধুনিকমনস্ক ও প্রগতিশীল বলেও পরিচিত। সেকুলারিজম ও প্রগতির সঙ্গে কবির এই ঈশ্বরভাবের যোগসূত্রটা কোথায় তা বোঝা বেশ মুশকিল। এখানে আরেকদল রবীন্দ্রপূজারী আছেন যারা নাকি বামপন্থী হিসেবে পরিচিত। কোথায় কাল মার্কসের শ্রেণি সংগ্রাম ও প্রোলেতারিয়েত কালচার, আর কোথায় রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরভাবনা— এ এক চরম বৈপিরীত্য ও বিভ্রান্তি ছাড়া কিছু নয়। মাঝে মাঝে মনে হয়, আমাদের দেশের কমিউনিস্টরা যত না প্রোলেতারিয়েত তার চেয়ে অনেক বেশি 'বাবু'।

আগেই বলেছি, রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী কাজ শুরু করে ১৯২১ সালে। কবি ততদিনে নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। তার আন্তর্জাতিক খ্যাতি তখন প্রতিষ্ঠিত । আন্তর্জাতিকতার খাতিরে হোক কিংবা নোবেল প্রাইজের মান রক্ষার জন্য হোক, কবি এ সময় তার শান্তি নিকেতন-বিশ্বভারতীকে উদারীকরণ করার চেষ্টা করেন এবং টোল-চতুষ্পাঠীর সঙ্কীর্ণতাকে তিনি কিছুটা ঢাকার চেষ্টা করেন । তিনি এখানে বিভিন্ন ধর্মের ছেলেমেয়েদের পড়ার অনুমতি দেন। দেশ-বিদেশ থেকে কয়েকজন পণ্ডিতকে ডেকে আনেন এখানে পড়ানোর জন্য। এদের মধ্যে এলমহার্স্ট, এন্ড্রুজ, লেসনি, লেভি, তুচ্চে, উইনটারনিটজের পাণ্ডিত্যের কথা আমরা

শুনেছি। মওলানা জিয়াউদ্দীন ছিলেন আরবি-ফারসির শিক্ষক। তার মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ একটা সুন্দর কবিতা লিখেছিলেন। তবে এতকিছুর পরও শান্তি নিকেতনের মৌলিক যে ভাব— তপোবন, তার থেকে এটি কখনোই বিচ্যুত হয় নি।

রবীন্দ্রনাথের মনে যা-ই থাক, শান্তি নিকেতন কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রভাব থেকে পুরোপুরি মুক্ত হতে পারে নি। বাঙলা সাহিত্যের এক অনন্যসাধারণ কবি জসীম উদ্দীনকে কোনোভাবেই সাম্প্রদায়িক বলা চলে না। কবির সৃষ্টিতে লোকায়ত বাংলার যে অনির্বচনীয় রূপ ফুটে উঠেছে তার সমতুল্য আর কাউকে সেখানে দাঁড় করানো সম্ভব নয়। অথচ এই জসীম উদ্দীনও শান্তি নিকেতনে রেহাই পান নি। উগ্রবাদী হিন্দুরা তাকে একবার শান্তি নিকেতন থেকে বের করে দিয়েছিল, যার বর্ণনা কবির ভাষায় দেয়া যাক :

- এমন সময় একদিন এক অঘটন ঘটিল। হিন্দু মহাসভার এক বক্তা আসিয়া শান্তিনিকেতনে ম্যাজিক লণ্ঠন সহযোগে এক বক্তৃতা দিলেন। এখানকার নিত্য একঘেয়ে জীবনে ম্যাজিক লণ্ঠনের ছবি দেখা মস্ত বড় আকর্ষণের ব্যাপার। ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, শিক্ষকদের স্ত্রী-পুত্র সকলে আসিয়া একস্থানে জড় হইয়াছে। বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল, 'বাঙলায় নারী নির্যাতন।'
- জ্বালাময়ী বক্তৃতা সহযোগে বক্তা ছবির উপর ছবি দেখাইয়া চলিলেন। লুঙ্গীপরা মুসলমান গুণ্ডারা যুবতী হিন্দু মেয়েটিকে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া যাইতেছে। তাহার চিৎকারে আকাশ-বাতাস বিদীর্ণ হইতেছে। একটি মেয়েকে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া ছালায় ভরিয়া মুসলমান গুণ্ডারা নদীতে ফেলিয়া দিতে যাইতেছে, তেমনি নানারকম হৃদয়- বিদারক দৃশ্য। তারপর তিনি রামায়ণের ছবি দেখাইলেন। সীতাকে রাবণ হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। তারপর রাম-লক্ষণ ধনুর্বাণ লইয়া কি করিয়া রাবণকে সবংশে নিধন করিতেছেন। দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণের দৃশ্য দেখাইয়া তারপর দেখাইলেন কি করিয়া ভীম-অর্জুন- নকুল-সহদেব দুর্য্যোধনকে নিধন করিয়াছিলেন। এই সব দেখাইয়া বক্তা তার শ্রোতৃমণ্ডলীকে আহ্বান করিলেন, "হিন্দুগণ! প্রস্তুত হও। যেমন করিয়া ভীম-অর্জুন-নকুল দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণের প্রতিশোধ লইয়াছিলেন, যেমন করিয়া রাম-লক্ষণ সীতা হরণের পর রাবণকে সবংশে নিধন করিয়াছিলেন তেমনি করিয়া আসুন আমরা মুসলমানদিগকে সবংশে নিধন করি।"
- বক্তৃতা শেষ হইল। শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক, শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী সকলেই যার যার মত চলিয়া গেলেন। তাহারা কি মনোবৃত্তি লইয়া চলিয়া গেলেন তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। কেহই এই বক্তৃতার কোন প্রতিবাদ করিলেন না। আমার সমস্ত

অন্তর বেদনায় রি রি করিতে লাগিল। আজ রবীন্দ্রনাথ সুদূর আমেরিকায়। তিনি থাকিলে কখনো এরূপ বক্তৃতার অনুমতি দিতেন না।

- নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে সারা রাত আমার ঘুম হইল না। নিজেকে মনে মনে কেবলই ধিক্কার দিতেছিলাম । আমি কেন সেই সভায় বক্তার এই সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির প্রতিবাদ করিলাম না। আমি উপস্থিত থাকিতে আমার সম্প্রদায়কে কেন এইভাবে এক তরফা আক্রমণ করিতে দিলাম?

- প্রতিদিন ভোরে গ্রন্থাগারের সামনে এখানকার ছাত্র-ছাত্রীরা এবং শিক্ষকেরা মিলিত হইয়া প্রার্থনা করেন । এই প্রার্থনার শেষে কয়েকজন শিক্ষক ও অধ্যাপকের সঙ্গে মিলিত হইলাম। তাঁহারা প্রত্যেকে বিগত রাত্রের বক্তৃতার বিষয় আলোচনা করিতেছিলেন। একজন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেখুন, আপনাদের সম্প্রদায় যে এইভাবে হিন্দু মেয়েদের উপর অত্যাচার করছে, আপনার মত উদারপ্রাণ মুসলমানের কাছে আমরা এর প্রতিবাদের আশা করি।" আমি বলিলাম, "রবীন্দ্রনাথের এই পবিত্র ভূমিতে হিন্দু মহাসভার বক্তা যে ভাবে মিথ্যা নারী-নির্যাতনের নামে আমার সম্প্রদায়কে একতরফা আক্রমণ করে গেলেন, আমার মনে খুবই আশা ছিল আপনাদের মত উদারমনা শিক্ষকদের মধ্যে কেউ ইহার প্রতিবাদ করেন।"

- আমার কথা বলা মাত্র যেন মৌমাছির চাকে ঢিল পড়িল। একজন বলিলেন, "আপনার কাছে এরূপ উত্তর আশা করিনি।" আমি বলিলাম, "কি উত্তর আশা করেছিলেন? আপনাদের তথাকথিত জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের মত বলব যে, বক্তার বক্তৃতা সবই সত্য । আপনারা আশা করেছিলেন আমি স্বীকার করব আমার আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব আমার সমাজের আপামর সাধারণ সবাই হিন্দু রমণীকে বলাৎকার করবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকে? আপনারা আশা করেছিলেন আমার সমাজকে এই ভাবে হেয় করে আমি আপনাদের কাছে উদারমনা বলে পরিচিত হব?"

- আর একজন বলিলেন, "তবে কি আপনি বলতে চান কালকে যে সকল ঘটনার কাহিনী বক্তা ছায়াচিত্র-যোগে দেখালেন তা সবই মিথ্যে?" আমি উত্তর করিলাম, "সব মিথ্যে কিনা বলতে পারব না। পৃথিবীতে এমন দেশ নেই যেখানে গুণ্ডা বদমাশ নেই। কিন্তু একজন মুসলমান গুণ্ডা একজন হিন্দু মেয়েকে হরণ করে নিয়ে গেছে এজন্য গোটা মুসলিম সমাজকে দায়ী করার কোন যুক্তি আছে বলতে পারেন? কাল কি শুনলেন বক্তার মুখে? রাম-লক্ষণ যেমন সীতা হরণের জন্য রাবণকে সবংশে নিধন করেছিল, দ্রৌপদী হরণের জন্য ভীম-অর্জুন যেমন দুর্য্যোধনকে নিধন করেছিল তেমনি মুসলিম ধ্বংসের জন্য বক্তা আপনাদের কাছে আবেদন জানালেন।

এই যদি সমস্ত হিন্দু সমাজের মনোবৃত্তি হয় তবে কোন্ আকর্ষণের জোরে আমরা আপনাদের সঙ্গে এক হয়ে থাকব? আপনাদের হিন্দু সমাজে গুণ্ডা নেই? বদমাশ নেই? কলকাতার অসংখ্য পতিতালয়ে যারা দেহ ব্যবসার জন্য আসে তাদের এখানে কারা নিয়ে আসে? মুসলমানরা না হিন্দুরা?"

- একজন প্রশ্ন করিলেন, "আচ্ছা, এই মুসলমান গুণ্ডাদের বিরুদ্ধে কোন মুসলমানই কেন প্রতিবাদ করে না?"
- আমি বলিলাম, "করে, নিশ্চয়ই করে। আমাদের পূর্ববঙ্গে হিন্দুর পাড়ার সঙ্গে মুসলমানের পাড়া। স্ত্রী পুত্র দেশে রেখে বহু হিন্দু বিদেশে চাকুরী করতে যায়। মুসলমানেরা তাদের রক্ষণা-বেক্ষণ করে। জানেন? আমাদের পূর্ববঙ্গে হিন্দুর সংখ্যা অনেক কম। মুসলমানেরা সবাই বদমাশ অথবা বদমাশের সমর্থক এই যদি আপনারা বলতে চান, তবে পূর্ববঙ্গের হিন্দু মেয়েদের শালীনতার উপরে কতটা কটাক্ষপাত করলেন একবার ভেবে দেখেছেন? কাল বক্তা ছবিতে দেখালেন একটি হিন্দু মেয়েকে কেটে কুচি কুচি করে মুসলমান বদমাশ নদীতে ফেলে দিতে যাচ্ছে। আচ্ছা বলুন ত, বলৎকার করার জন্য যে সব মেয়েকে তারা নিয়ে যায়, তাদের ত শাড়ী গহনা দিয়ে আরও যত্ন করে রাখার কথা। কেটে টুকরো টুকরো করে নদীতে ফেলে দেবে কেন? জানেন অনেক হিন্দু মেয়ে মুসলমানের সঙ্গে ভালবাসা করে স্বেচ্ছায় ঘরের বার হয়ে যায়?" দুই তিন ভদ্রলোক রি রি করিয়া উঠিলেন, "বড় আজগুবি কথা শুনালেন ত?"
- আমি ঝোঁকের মাথায় বলিয়া ফেলিলাম, "যদি বিশ্বাস না করতে চান আমার ঘরে আসবেন। হিন্দু মেয়েদের লেখা বিশখানা প্রেমপত্র আপনাদের দেখাতে পারব।" বস্তুতঃ আমার কাছে এরূপ একখানা প্রেমপত্রও ছিল না। আমার কথা শুনিয়া ভদ্রমহোদয়েরা একে একে চলিয়া গেলেন।
- তখনকার শান্তিনিকেতন একটি ছোট পুকুরের মত। একটা ঢিল দিলে চারি পাড়ে যাইয়া ঢেউ আছড়াইয়া পড়ে। এর কান হইতে ওর কানে— ওর কান হইতে তার কানে কথা ছড়াইতে বেশী সময় লাগে না। এখানে শিক্ষক-অধ্যাপকদের প্রচুর অবসর। সারাদিন যেখানে সেখানে ফিস্ ফিস্ আলোচনা চলিল। বন্ধু নিশীকান্ত আর সান্ত্বনার মারফত তার যথাযথ বর্ণনা পাইতে লাগিলাম। স্বয়ং রমানন্দ বাবু এখানকার বড় বড় নেতাদের লইয়া আমার বিষয়ে আলোচনা করিলেন। নন্দলাল বাবু নাকি বলিলেন, আমার প্রতি আর তাঁর মনে কোন স্নেহ-মমতা নেই। শুনিয়া বড়ই দুঃখ হইল। মানুষের স্নেহ- মমতা এতই ক্ষণস্থায়ী যে এতটুকুতেই তা খসিয়া পড়ে।

- একদিন প্রভাতদা আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "জসীম! তোমার বিরুদ্ধে এখানে ভীষণ আলোচনা চলছে। এখানকার কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা তুমি এখান থেকে চলে যাও।"
- বলিলাম, "আমি ত কোন অপরাধ করি নাই। অপরাধ করেছে এখানকার কর্তৃপক্ষ, রবীন্দ্রনাথের এই শান্তির নিকেতনে সাম্প্রদায়িক বক্তৃতা করতে দিয়ে। তাদের যদি সাহস থাকে জোর করে আমাকে এখান হতে তাড়িয়ে দিক। লোকের কাছে প্রকাশ হউক, সাম্প্রদায়িক বক্তৃতার প্রতিবাদ করে আমি এখান হতে বিতাড়িত হয়েছি। এখানকার লোকদের মানসিকতা দেখে এখানে থাকবার আমার তিলমাত্র ইচ্ছা নেই। আর পাঁচ-ছয় দিন পরে বর্ষা মঙ্গলের উৎসব হবে। সেটা দেখে আমি আপনা হ'তেই চলে যাব।"
- এরপর আমার সঙ্গে শান্তিনিকেতনের শিক্ষক-ছাত্র কেহ কথা বলে না। তার জন্য আমার কোন তোয়াক্কাও ছিল না। নিশীকান্ত আর সান্ত্বনা আমার সঙ্গী। তিন বন্ধুতে গল্প করিয়া কবিতা লিখিয়া সময় কাটে। আর সকাল বেলা প্রভাতদার বাসায় যাইয়া আসর জমাই। এখানে আমার আদর-যত্নের এতটুকুও কম হয় না ।
- শেষবর্ষণ অনুষ্ঠান শেষ হইলে কলিকাতা চলিয়া আসিলাম। রাতের পর রাত আমার ঘুম হয় না। আমি নীরবে এই অপমান হজম করিয়া আসিলাম, এই চিন্তা আমাকে তিলে তিলে দাহন করিতে লাগিল ।[১১৩]

জসীম উদ্দীন তার সময়ে যা দেখেছিলেন তার চেয়ে অবস্থার খুব কি একটা পরিবর্তন হয়েছে? স্থূল ও দৃশ্যমান সাম্প্রদায়িকতা সেখানে হয়তো নেই, কিন্তু অন্য এক ধরনের সাম্প্রদায়িকতা এখনো সেখানে বহাল তবিয়তে রয়েছে। ২০১৫ সালের এক পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় সেখানে ৬০০ শিক্ষকের মধ্যে মাত্র ৬ জন মুসলমান। শতকরা হিসাবে ধরলে ১% । কী এক অজানা কারণে এই বৈষম্য, রবীন্দ্রতীর্থের পুরোহিতরা কি তার সদুত্তর দিতে পারবেন! নীরদ চৌধুরী লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত শব্দ বিশ্বের সাথে হিন্দুদের জ্ঞানদেবী সরস্বতীর সমন্বয় করে বিশ্বভারতী নামটা রেখেছিলেন। ভারতী শব্দটার আরেকটা মানে হচ্ছে সরস্বতী, হিন্দুদের ভাষাধিষ্ঠাত্রী দেবী।

রবীন্দ্রনাথ তার শৈশবের শিক্ষা প্রণালী পছন্দ করেন নি । তিনি এটাকে ত্রুটিযুক্ত মনে করতেন। তাই তিনি একটি নতুন শিক্ষা পদ্ধতি গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন।কিন্তু নীরদ চৌধুরী লিখেছেন আদতে এটি কোনো শিক্ষাই ছিল বলে মনে হয় না। কারণ এটি কোনো জাগতিক প্রয়োজন মেটাতে অসমর্থ ছিল। বাস্তবে এটি হয়েছিল নাট্যাঙ্গণ এবং বাঙালি মধ্যবিত্তের অসীম কৌতুহলের বিষয়। নীরদ চৌধুরী শান্তি নিকেতন সম্বন্ধে আরো যা লিখেছেন :

---

[১১৩]. জসীম উদ্দীন, ঠাকুরবাড়ির আঙিনায়। ঢাকা : পলাশ প্রকাশনী, ২০১১।

- It was a curious assortment, materially, of European bric- a-brac and Hindu archaistic tinsel. In its functioning it was almost a vaudeville. Its personal composition was even worse. Besides some serious scholars from Europe there came to it all types of eccentrics and adventurers, and some were absolutely feeble minded enthusiasts in the specialized sense of being obsessed with some unpractical idea. Even Tagore at times lost patience with them. As to the Bengalis who went there, as a class they were men who wanted to achieve importance by being epiphytes on Tagore. As there was very little money going in Santiniketan that had to be compensated for by an artificial idea of personal importance.
- To make the atmosphere more unhealthy, there were fierce jealousies and rivalries in the Santiniketan community, each member striving to be his favorite and to have his ear. Another tawdry element was introduced by the yearning Tagore developed in his old age for 'female companionship' in the manner of Peter Pan. This was a sad falling off from his tragic sufferings from not finding romantic love. Thus it happened that he would talk to or correspond with a number of Bengali women and promote them by turns to the status of his Egeria. But these young women at their best were very Bengali blue stockings and at their worst very Bengali precieuses ridicules. They did not shed any glamour on Tagore's old age.[১১৪]

ভারত স্বাধীন হওয়ার পর এ বিশ্ববিদ্যালয়কে সরকার নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। এখান থেকে ডিগ্রিও দেয়া শুরু হয়। তবে বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে এটা কতখানি আধুনিক ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে, এরকম একটা প্রশ্ন এখনও রয়ে গেছে। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ডিসিপ্লিনের ওপর এখানকার পড়াশোনার খ্যাতি আদৌ নেই। এটা মূলত ললিতকলার বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক একটা স্রেফ সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে টিকে আছে। সঙ্গীত, নৃত্য, চিত্রকলা, নাটক,

[১১৪]. Nirad C. Chaudhuri, Autobiography of an Unknown Indian, Part II. Bombay : Jaico Publishing House, 2008

চলচ্চিত্র প্রভৃতি বিষয়ের ওপর এখানে মূলত ডিগ্রি দেয়া হয়। রবীন্দ্রনাথের নামের গুণেই বিশ্বভারতীর খ্যাতি। বিশ্বভারতীর নিজের সামর্থ্য হয়। নি কখনও খ্যাতিমান হয়ে ওঠার।

বাংলাদেশ সরকারের সিদ্ধান্ত অনুসারে শান্তি নিকেতনের আদলে শাহজাদপুরে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ধরে নেয়া যায়, শান্তি নিকেতনের মতো এটা একটা ব্রহ্মচর্যাশ্রম হবে এবং চিন্তা ও মর্মের দিক দিয়ে এটি শান্তি নিকেতনের আদর্শই প্রচার করবে। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী শব্দটার ব্যাখ্যা করেছিলেন— বিশ্বের জন্য ভারতের বাণী। সেই বাণীকে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কবি ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন চারদিকে। তাহলে এই বিশ্ববিদ্যালয়টিও কি তপোবনের আদর্শ প্রচারের একটা মাধ্যম হতে চলেছে? তবে শান্তি নিকেতন, তপোবন বা বিশ্বভারতী যাই হোক না কেন, এর মৌল চেতনার সঙ্গে বাংলাদেশের গরিষ্ঠ সংখ্যক মানুষের ভাবপ্রবাহের কোনো সম্পর্ক নেই। রবীন্দ্রনাথ আজ একটা মিথে পরিণত হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ যে একজন মানুষ ছিলেন, মানুষ হিসেবে তার ব্যর্থতা থাকতে পারে এবং তার প্রতিষ্ঠিত শিক্ষায়তনগুলো যে ত্রুটিমুক্ত নয়— এসব কথা মুক্তমন নিয়ে বিবেচনা করার শক্তিটিও এখন আমাদের বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আমাদের প্রয়োজনেই কবি ও মানুষ রবীন্দ্রনাথের যথাযথ মূল্যায়ন প্রয়োজন। তার সুদীর্ঘ আশি বছরের জীবনে কোনো ত্রুটি নেই এটা কোনো কথা হতে পারে না।

যে শাহজাদপুরে শান্তি নিকেতনের আদলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেখানে ছিল ঠাকুর পরিবারের জমিদারী। জমিদার হিসেবে ঠাকুর পরিবার ছিল অত্যাচারী। প্রজাদের উপর জুলুম-নির্যাতনে এদের কোনো জুড়ি ছিল না। এরা গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছেন। বুট পরে প্রজাকে লাথি মেরেছেন মহর্ষি বলে পরিচিত রবীন্দ্রনাথের পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পূর্ববঙ্গের জমিদারীগুলোতে ঠাকুর পরিবারের প্রজা হিতৈষণার কোনো নামগন্ধ নেই। তারা স্কুল করেন নি, দীঘি কাটেন নি, দান- দক্ষিণারও তেমন কোনো নজির নেই। অমিতাভ চৌধুরী লিখেছেন— দফায় দফায় খাজনা বৃদ্ধি ও জোর-জবরদস্তি করে তা আদায়ের প্রতিবাদে শিলাইদহে ইসমাইল মোল্লার নেতৃত্বে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে প্রজা বিদ্রোহ ঘটেছিল।[১১৫] শাহজাদপুরেও ঠাকুর পরিবারের জমিদারীতে প্রজাবিদ্রোহ হয়েছিল।[১১৬] শাহজাদপুরের জমিদারীতে খাজনার হার পার্শ্ববর্তী জমিদারীর চেয়ে অনেক বেশি ছিল। এই জমিদারী নামমাত্র মূল্যে নিলামে খরিদ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের দাদা প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। দ্বারকানাথের পরে এই জমিদারী দেখাশোনা করেছেন রবীন্দ্রনাথের পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সবশেষে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রজাদের কাছ থেকে উচ্চহারে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ে ঠাকুর জমিদাররা অবাঙালি সিপাই-সান্ত্রী পুষতো এবং এদের দিয়ে প্রজাদের উপর নির্মম

---

১১৫. অমিতাভ চৌধুরী, জমিদার রবীন্দ্রনাথ। শারদীয় দেশ, বাংলা ১৩৮২

১১৬. স্বপন বসু, গণ অসন্তোষ ও উনিশ শতকের বাঙ্গালী সমাজ। কলকাতা : পুস্তক বিপণী, ১৯৮৭।

অত্যাচার চালাতো। এই নির্যাতনের বিরুদ্ধে ১৮৭৩ সালে এক ভয়ানক প্রজাবিদ্রোহ ঘটে। এই বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন কৃষক নেতা ঈষানচন্দ্র রায়, গঙ্গাচরণ পাল, ক্ষুদি মোল্লা, রহিম প্রামাণিক প্রমুখ। এই প্রজাবিদ্রোহ দমনে রবীন্দ্রনাথের পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সব রকমের নিষ্ঠুর পথ অবলম্বন করেন। ঠাকুর জমিদারদের এই অত্যাচার দেখে কুষ্টিয়ার মানবতাবাদী সাংবাদিক কাঙাল হরিনাথ মজুমদার সিরাজগঞ্জে আসেন এবং সরজমিনে প্রত্যক্ষ করেন। ঠাকুর জমিদারদের সম্পর্কে তার মতামত ছিল এরকম:

- দ্বারকানাথ ঠাকুরের পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর জমিদারীতে কর্তৃত্ব করিতে থাকিলেন। ইংরেজী কৌশল (পোলিশি) জমিদার দিকের অস্থি মস্তিষ্কে যতই প্রবেশ করিতে লাগিল নাএবগণের স্বাধীনতা ক্রমেই নষ্ট হইল। তাঁহারা ছায়াবাজীর পুতুল হইয়া থাকিলেন। সূত্র কূটকৌশলপরায়ণ কলিকাতার বাবুদিগের হস্তে থাকিল। প্রজাগণ অত্যাচারিত হইয়া ক্রমে আর্তনাদ করিতে লাগিল। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে পর্য্যন্ত মহর্ষি নাম গ্রহণ করেন নাই, সে পর্য্যন্ত প্রজাগণ তাহাকে দুঃখ নিবেদন করিয়া কিছু কিছু ফল পাইয়াছে। কিন্তু তিনি মহর্ষি নাম পরিগ্রহ করিলে, তাহার পর প্রজার হাহাকার তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিতে অবসর পায় নাই। দুরবস্থা দেখিতে নিমীলিত চক্ষু উন্মিলিত হয় নাই। সুতরাং ব্রহ্মপরায়ণতা, ধার্ম্মিকতা ও দেশহিতৈষিতা চিহ্নসরূপ গীত কবিতা রচনা করিয়া বাহিরে যতই কেন সাধুতা প্রদর্শন না করুন, অন্যায় শোষণ ও তজ্জন্য অত্যাচারে প্রজার শরীরে আর রক্ত থাকিল না। যতই কেন অত্যাচারিত না হউক, এতই দুর্ব্বল যে, কাহারও মাথা তুলিবার সাধ্য থাকিল না। তাহারা পূর্ব্বে চিৎকার করিত, এক্ষণে ক্ষীণস্বরে হাহাকার করিয় বক্ষস্থল কেবল সিক্ত করিতে লাগিল। এদিকে জমিদারের অট্টালিকা কোথাও বিলাসসুখের হাস্যধ্বনিতে ও কোথায় ব্রাহ্মধর্ম্মের শ্রুতিস্তোত্র পাঠে ধ্বনিত হইল।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি কটাক্ষ করে হরিনাথ মজুমদার লিখেছেন :

- ধর্ম্মমন্দিরে ধর্ম্মালোচনা আর বাহিরে আসিয়া মনুষ্য শরীরে পাদুকা- প্রহার, এ কথা যে আর গোপন করিতে পারিনা।[১১৭]

রবীন্দ্রনাথ যখন শাহজাদপুরের জমিদারী দেখাশোনা করতে আসেন তখন বিদ্রোহের তাপ অনেক কমে গেছে। কিন্তু প্রজা নির্যাতন বহালই ছিল। খাজনাও একইভাবে আদায় করা হতো।

শাহজাদপুরে ঠাকুর বাবুরা প্রজাদের জন্য কোনো ভালো কাজ করেছেন এরকম কোনো প্রমাণাদি পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথের প্রজাহিতৈষণারও কোনো রেকর্ড নেই। বাঙালি

[১১৭]. উদ্ধৃত : আখতার উদ্দিন মানিক, পাবনা-সিরাজগঞ্জ প্রজাবিদ্রোহ ১৮৭৩। ঢাকা :সমতা, ২০০৫।

জাতীয়তাবাদী রাজনীতির প্রয়োজনে এখন যেভাবে রবীন্দ্রনাথের প্রজাহিতৈষণার গালগল্প প্রচার করা হয় তার সাথে ইতিহাসের কোনো সম্পর্ক নেই।

ঠাকুর পরিবার খাজনা বাদে প্রজাদের কাছ থেকে বিভিন্ন অসিলায় নির্মমভাবে অর্থ আদায় করতো যা ছিল সম্পূর্ণ বেআইনী।[১১৮] রবীন্দ্রনাথ এই বেআইনী অর্থ আদায়ে মোটেও কার্পণ্য করেন নি। বিশেষ করে তার পরিবারের বিস্তর অপকর্মের বিরুদ্ধে তিনি টু শব্দটি করেন নি। তার বিলাসবহুল বিদেশ যাত্রার খরচ উঠানো হতো এভাবে। কবিতা, গান, ছোটোগল্পে রবীন্দ্রনাথের যে পরিচয় আমরা দেখি তার সাথে জমিদার রবীন্দ্রনাথের বিস্তর তফাৎ।

পতিসরে রবীন্দ্রনাথ কৃষিব্যাংক করেছিলেন, সুদে টাকা খাটিয়ে ব্যবসা করার জন্য। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে ব্রিটিশের সবচেয়ে সুবিধাপ্রাপ্ত পরিবারগুলোর একটি ছিল জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার। ১৮-১৯ শতকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে টিকিয়ে রাখতে যারা সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা করেছিলেন, ঠাকুর পরিবার তার একটি। এর বিনিময়ে ব্রিটিশরা তাদের দিয়েছিল Amnities of life আর প্রজা শোষণের একচ্ছত্র অধিকার। শিলাইদহ, শাহজাদপুর, পতিসরের আকাশে-বাতাসে ইসমাইল মোল্লা, ঈষানচন্দ্র, রহিম প্রামাণিকের মতো অগণিত রায়ত, কৃষক আর নিপীড়িত মানুষের হাহাকার ও কান্না মিশে আছে।

শাহজাদপুরে যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা এই নিপীড়িত মানুষের হাহাকারকে নিত্য উপহাস করবে মাত্র। শাহজাদপুরে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরণ হওয়া উচিত ছিল বিপ্লবী কৃষক ইসমাইল মোল্লা, ঈষানচন্দ্র কিংবা রহিম প্রামাণিকের নামে যারা ঠাকুর জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। অথবা কাঙ্গাল হরিনাথের নামে যিনি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জমিদারী অপকর্মের বিরুদ্ধে লেখালেখি করেছিলেন। সিরাজগঞ্জের ইসমাইল হোসেন সিরাজীর নাম আজকাল আমরা আদৌ স্মরণ করি না। এই বিপ্লবী কবি ও রাজনীতিবিদ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আজীবন লড়াই করেছেন। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম তার নামেও হতে পারে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অনুগত একজন জমিদারের নাম ধরে রাখার চেয়ে একজন বিপ্লবীর স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কারণ পূর্ববাংলার চরিত্রের মধ্যে বিদ্রোহ ও বিপ্লব মিশে আছে।

অন্যদিকে শান্তি নিকেতনের আদলে প্রতিষ্ঠিত কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের আড়ালে তপোবন, ব্রহ্মচর্যাশ্রম, টোল বা চতুষ্পাঠীর আমাদের প্রয়োজন নেই। আমাদের এমন একটা বিশ্ববিদ্যালয় দরকার যেখানে আমাদের সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের সঙ্গে একালের জ্ঞান-বিজ্ঞানের যোগ থাকা চাই, যা আমাদের প্রতিদিনের জীবনকে অর্থপূর্ণ করে তুলবে। রবীন্দ্রনাথ এদেশে এখন যত না শিল্প-সংস্কৃতি জগতের বিষয়, তার চেয়ে অনেক বেশি রাজনীতির বিষয়। ষাটের দশক থেকে আমাদের এখানে এই রবীন্দ্র সিনড্রমের শুরু। আড়ালে এদেশে একটি তপোবনীয়

---

[১১৮]. সুপ্রকাশ রায়, ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম। কলিকাতা : বুক ওয়ার্ল্ড, ২০০০।

মানস গড়ে তোলাই এর সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে উদ্যোক্তারা অনেকখানি সফল হয়েছেন এবং তপোবনীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের পক্ষে একটি গণভিত্তি তৈরি হয়েছে। কোনো সন্দেহ নেই, শাহজাদপুরের বিশ্ববিদ্যালয়টি হবে একটা সরকারি পর্যায়ের তপোবন।

দীর্ঘদিন ধরে প্রচার-প্রপাগান্ডা, মিডিয়ার জোরে যে তপোবনীয় মানস তৈরি হয়েছে তা জাতিরাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের জন্য হয়েছে সবচেয়ে আত্মঘাতী। এদেশে এখন অনেকেই আছেন যারা জাতীয় স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে হলেও ভারতীয় আধিপত্য কবুল করতে রাজি। এর কারণ হচ্ছে তপোবনীয় মানসিকতা আমাদের ভেতর এক ধরনের হীনমন্যতা ও দাস মনোবৃত্তির বিকাশ ঘটিয়েছে। এই দাস মানসিকতার কারণে কে মিত্র আর কে মিত্র নয়, এই ভেদজ্ঞানটুকুও আমরা হারিয়ে ফেলেছি। ফলে ভারতীয় আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে আজও কোনো জাতীয় ঐক্য গড়ে ওঠে নি। এদেশে রবীন্দ্র-রাজনীতির এটাই সবচেয়ে বড় সাফল্য। রবীন্দ্র- সাহিত্য নয়, রবীন্দ্র-রাজনীতি রুখে দেয়া আজ সময়ের দাবি।

রবীন্দ্রনাথের ধর্ম

রবীন্দ্রনাথ যে ধর্মে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তার নাম ব্রাহ্ম ধর্ম। এটি সনাতন হিন্দু ধর্মের একটি সংস্কারকৃত রূপ এবং এটি প্রবর্তন করেছিলেন বিখ্যাত রাজা রামমোহন রায়। এরা প্রতিমাপূজা করতেন না এবং এদের বিশ্বাসের মূলতত্ত্ব ছিল নিরাকার ঈশ্বরের সাধনা। এরা মনে করতেন তাদের ধর্মমতই মূল হিন্দু ধর্ম সম্মত— আদর্শ হিন্দুর অনুকরণীয়।

রামমোহন রায় প্রধানত হিন্দু ধর্মীয় গ্রন্থ উপনিষদের মূলতত্ত্ব ঘেঁটে এই নতুন ধর্মের Theological Foundation তৈরি করেন। রবীন্দ্রনাথের পিতা দেবেন্দ্রনাথ এই ধর্মে দীক্ষা নেন এবং নিজের যোগ্যতাবলে কালক্রমে তিনি এই নতুন ধর্মান্দোলনের নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন।

দেবেন্দ্রনাথের পর রবীন্দ্রনাথ এই ধর্মের অন্যতম নেতা ও কাণ্ডারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘদিন এই ধর্মীয় আন্দোলনের মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিণী' পত্রিকা সম্পাদনা করেন এবং ব্রহ্ম মন্দিরে উপাসনার জন্য তিনি অসংখ্য ব্রহ্ম সংগীত রচনা করেন।

খ্রিষ্টান ধর্মনেতাদের বলা হয় Patriarch।তেমনি দেবেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ব্রাহ্ম ধর্মের Patriarch।এদের বাণী ও কাজ ছিল ব্রাহ্ম ধর্মানুসারীদের জন্য অনেকটা Sacrosanct— অবশ্য পালনীয়। এই কারণে রবীন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক হিসেবে এই ধর্মের মত ও বিশ্বাসকে সমর্থন ও প্রচার করার জন্য লেখালেখি শুরু করেন এবং সেদিন তিনি নিঃসঙ্কোচে দাবি করেন ব্রাহ্ম ধর্ম পৃথিবীর ধর্ম।[119]

রবীন্দ্রনাথ হিন্দু না ব্রাহ্ম এ নিয়ে তার জীবদ্দশায় অনেক তর্কবিতর্ক হয়েছে। সনাতনী হিন্দুরা তাকে মনে করতেন অপৌত্তলিক ব্রাহ্ম আর নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মরা তাকে মনে করতেন ষোল আনা হিন্দু। আদমশুমারি চলাকালে এই বিতর্ক যখন তুঙ্গে তখন তিনি নিজের পরিচয় দেন এমনিভাবে :

> আমি হিন্দু সমাজে জন্মিয়াছি এবং ব্রাহ্ম সম্প্রদায়কে গ্রহণ করিয়াছি। আমরা যে ধর্মকে গ্রহণ করিয়াছি তাহা বিশ্বজনীন তথাপি তাহা হিন্দুরই ধর্ম। এই বিশ্বধর্মকে আমরা হিন্দুর চিত্ত দিয়াই চিন্তা করিয়াছি। হিন্দুর চিত্ত দিয়াই গ্রহণ করিয়াছি।[120]

কবি 'আত্মপরিচয়' নামে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে ছাত্র সমাজের আহ্বানে যে ভাষণ পাঠ করেন তাতে তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন যে, 'ব্রাহ্ম ধর্ম তাহার আধ্যাত্মিক প্রেরণা পাইয়াছে হিন্দু শাস্ত্র

---

[১১৯]. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র জীবনী ও রবীন্দ্র সাহিত্য প্রবেশক, ১ম খণ্ড। কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৪২০, পৃষ্ঠা: ২০৭।

[১২০]. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৬৪।

গ্রন্থ হইতে; হিন্দু সংস্কৃতির উপর ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা।"[১২১] এই কারণে কবির জীবনীকার প্রভাতকুমার লিখেছেন, 'তিনি ধর্মে ব্রাহ্ম, সংস্কৃতিতে হিন্দু।'[১২২]

রবীন্দ্রনাথের ধর্মমত নিয়ে যেমন বিতর্ক চলেছিল, তেমনি তার ব্রাহ্মণত্ব নিয়ে বিতর্ক কম হয় নি ।রবীন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষের বাড়ি ছিল যশোর জেলার চেঙ্গুটিয়া নামক স্থানে। তার পূর্বপুরুষেরা খুলনার পীর খান জাহান আলীর অমাত্য- পীর তাহের আলীর সংস্পর্শে এসেছিলেন। পীর তাহের আলী পীর আলী নামেও পরিচিত ছিলেন। পীর আলী রবীন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষদের নিজের অমাত্য হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন বলে এরা পীরালী ব্রাহ্মণ হিসেবে পরিচিত হন এবং হিন্দু সমাজ দ্বারা জাতিচ্যুত হন। এই অপরাধে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার বাংলাদেশে বহুরকমের খ্যাতি অর্জন করা সত্ত্বেও শুদ্ধ ব্রাহ্মণ হিসেবে কখনো মর্যাদা পান নি এবং এদের সাথে আত্মীয়তার সম্বন্ধ গড়ে তুলতেও বাংলাদেশের ব্রাহ্মণরা দ্বিধান্বিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মতো ব্যক্তিকেও তার বিয়ের সময় কনে পেতে বহু কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল।

শৈশব কাল থেকেই রবীন্দ্রনাথের উপর পিতা দেবেন্দ্রনাথের ধর্মীয় ভাবটি স্পষ্ট করে পড়েছিল এবং রবীন্দ্রনাথও দেবেন্দ্রনাথের প্রভাবে একটি ধর্মীয় পরিবেশে বড় হয়ে উঠেছিলেন । যে বয়সে মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠন হয় সেই সময় তার উপর ধর্মের প্রভাব পড়েছিল সবচেয়ে বেশি। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন :

- রবীন্দ্রনাথের উপর ব্রাহ্ম ধর্মগ্রন্থোদ্ধৃত উপনিষদাদি মন্ত্রের ও বিশেষভাবে গায়ত্রী মন্ত্রের প্রভাব অতীব গভীর। রাজা রামমোহন রায়ের ও মহর্ষির জীবনে এই মন্ত্রের কী প্রভাব ছিল তাহা তাঁহাদের জীবনচরিত পাঠকের নিকট অবিদিত নাই। দেবেন্দ্রনাথ প্রতিদিন প্রাতে অভুক্ত অবস্থায় দশবার গায়ত্রী মন্ত্র জপের দ্বারা ব্রহ্মোপাসনা করিতেন। শিষ্য ও পুত্রাদির মধ্যে এই পদ্ধতি প্রচলিত করিবার চেষ্টায় কোনোদিন তিনি শৈথিল্য প্রকাশ করেন নাই। রবীন্দ্রনাথের 'ধর্ম' ও 'শান্তিনিকেতন' উপদেশমালা পাঠে জানা যায় যে, সংস্কৃত মন্ত্র ও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি তাঁহার অনুরাগ যেমন অকৃত্রিম তেমনি গভীর। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং একসময় পর্যন্ত উপনয়নাদি হিন্দু সংস্কারে বিশ্বাসবান ছিলেন; কারণ আমরা দেখিতে পাই তিনি যথাবিধি জ্যেষ্ঠ পুত্রের উপনয়ন সম্পন্ন করেন। শান্তি নিকেতন ব্রহ্ম মন্দির মধ্যে কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহসময়ে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজভূক্ত জামাতাকে উপবীত ধারণের জন্য বৃথাই জিদ করা হইয়াছিল বলিয়া আমরা জানি। রবীন্দ্রনাথ বহুকাল এইসব সামাজিক আচারকে

[১২১]. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৬৫ ।

[১২২].প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৫৩।

স্বয়ং মানিয়া চলিয়াছিলেন। প্রাচীন মন্ত্রের প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা জীবনের শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ন ছিল।[১২৩]

ব্রাহ্ম ধর্মে পৌত্তলিকতা ছিল না। রবীন্দ্রনাথও মোটের উপর ব্যক্তিগতভাবে পৌত্তলিকতামুক্ত ছিলেন। কিন্তু হিন্দু ধর্মীয় সাংস্কৃতিক প্রভাবের কারণে তার রচনায় অনেক ক্ষেত্রে পৌত্তলিকতার ছায়া দৃশ্যমান এবং তিনি কখনো পৌত্তলিকতার সরাসরি বিরোধিতা করেন নি। ঠাকুরবাড়ির আদি ব্রাহ্ম সমাজ কখনো হিন্দু সমাজের বাইরে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে চায় নি। এই কারণে দেবেন্দ্রনাথ তার শিষ্য কেশবচন্দ্র সেনকে পর্যন্ত ধর্মসঙ্গী হিসেবে বর্জন করেন। ফলে কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মদের মধ্যে পৃথক শাখা গড়ে তোলেন। দেবেন্দ্রনাথ যতদিন বেঁচে ছিলেন, ঠাকুরবাড়িতে অসবর্ণ বিয়ে হতে পারে নি। প্রত্যেক সন্তানের উপণয়ন হয়েছে এবং স্থুল পৌত্তলিকতা ছাড়া মোটামুটি সব হিন্দু আচারই মানা হয়েছে। এটিই যে মূল ভারতীয় হিন্দু আদর্শ রবীন্দ্রনাথ তা গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন।

রবীন্দ্রনাথ শান্তি নিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা করে সেখানে জাতিভেদ প্রথা মানতে শুরু করেন। ব্রাহ্মণের অপমানে প্রবন্ধ লিখে প্রতিবাদ করেন। বঙ্গদর্শন কাগজের সম্পাদনা গ্রহণ করে হিন্দু ধর্মের আদর্শ নিয়ে রীতিমতো জেহাদ করেন এবং ঈশ্বর বিশ্বাস ও ভগবদভক্তি মিলিয়ে নৈবেদ্য কাব্য রচনা করেন। এ সময় তার উপর স্বামী বিবেকানন্দ, ভগিনী নিবেদিতা ও ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের একটা প্রভাব পড়েছিল। শান্তি নিকেতনে ব্রহ্ম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে রবীন্দ্রনাথ সেটাকে প্রাচীন ভারতের হিন্দু আদর্শে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেন। প্রভাত বাবু লিখেছেন :

> এই যুগে রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতের রূপকল্পনায় মগ্ন। বৈদিক ভারতের তপোবনের যে অপরূপ চিত্র বাক্যের ইন্দ্রজালে তিনি আঁকিতেছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ কবি কল্পনা। চিরদিনই ভাববিলাসী সাহিত্যিকরা এই আদর্শলোকের স্বপ্ন দেখিয়াছেন; ইহাকেই বলে utopia। রবীন্দ্রনাথের তপোবন সেইরূপ একটি অন্তরের সৃষ্টি। হিন্দুভারতের বর্ণাশ্রম আদর্শ কবিকে এমনি মুগ্ধ করিয়াছিল যে, তিনি আজ প্রাচীন ভারতের সমস্তকেই মহান ও রমণীয় করিয়া দেখিতেছেন। কালিদাস গুপ্ত সাম্রাজ্যের ভারতে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যশক্তির দাম্ভিকতা দেখিয়া অন্তরে অন্তরে পীড়াবোধ করিয়া যেরূপ প্রাচীনতর ভারতের মধ্যে আদর্শের সন্ধানে যাত্রা করিয়াছিলেন ও কাব্যের তুলিকায় তপোবনের স্বপ্নলোক সৃষ্টি করেন, রবীন্দ্রনাথও সেইরূপ মনোলোকে একটি আদর্শ তপোবনের চিত্র দেখিতে আজ তন্ময়। সেই আদর্শ বর্তমান কালোপযোগী করিবার জন্য তাহার আকাঙ্খা। ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপন করিয়া সেইখানে বাস ও শিক্ষাদানের

[১২৩]. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪১।

কল্পনা কবি মনে জাগিল। ভারতের এই আধ্যাত্মিক আদর্শে তপোবনের পরিকল্পনায় তিনি বিভোর।[১২৪]

এই সময় কবি তার এক বন্ধুকে চিঠি লিখে তপোবনের আদর্শ সম্বন্ধে যা বলেছেন তার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি :

- মাঝে মাঝে আমি কল্পনা করি, পূর্বকালে ঋষিরা যেমন তপোবনে কুটির রচনা করিয়া পত্নী, বালক-বালিকা ও শিষ্যদের লইয়া অধ্যয়ন- অধ্যাপনে নিযুক্ত থাকিতেন, তেমনি আমাদের দেশের জ্ঞানপিপাসু জ্ঞানীরা যদি এই প্রান্তরের মধ্যে তপোবন রচনা করেন, তাঁহারা জীবিকাযুদ্ধ ও নগরের সংক্ষোভ হইতে দূরে থাকিয়ে আপন আপন বিশেষ জ্ঞানচর্চায় রত থাকেন, তবে বঙ্গদেশ কৃতার্থ হয়। অবশ্য, অশনবসনের প্রয়োজনকে খর্ব করিয়া জীবনের ভারকে লঘু করিতে হইবে। উপকরণের দাসত্ব হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া সর্বপ্রকার বেষ্টনহীন নির্মল আসনের উপর তপোনিরত মনকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। যেমন শাস্ত্রে কাশীকে বলে পৃথিবীর বাহিরে, তেমনি সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে এই একটুখানি স্থান থাকিবে, যাহা রাজা ও সমাজের সকল প্রকার বন্ধন-পীড়নের বাহিরে। ইংরাজ রাজা হউক বা রুশ রাজা হউক, এই তপোবনের সমাধি কেহ ভঙ্গ করিতে পারিবে না। এখানে আমরা খণ্ডকালের অতীত; আমরা সুদূর ভূতকাল হইতে সুদূর ভবিষ্যৎকাল পর্যন্ত ব্যাপ্ত করিয়া বাস করি; সনাতন যাজ্ঞবল্ক্য এবং অনাগত যুগান্তর আমাদের সমসাময়িক। তপোবনবাসীদের জন্ম-মৃত্যু-বিবাহের অনুষ্ঠান পরম্পরা, এখানকার আমাদের নিভৃতশান্তি ও সরল সৌন্দর্যের চিরন্তন সমারোহে সম্পন্ন হইতে থাকে। আমাদের বালকেরা হোম ধেনু চরাইয়া আসিয়া পড়া লইতে বসে এবং বালিকারা গোদোহন কার্য সারিয়া কুটির প্রাঙ্গণে, গৃহকার্যে, শুচিস্নাত কল্যাণময়ী মাতৃদেবীর সহিত যোগ দেয়।
- ...যদি বৈদিককালে তপোবন থাকে, যদি বৌদ্ধযুগে 'নালন্দা' অসম্ভব না হয়, তবে আমাদের কালেই কি ... মঙ্গলময় উচ্চ আদর্শ মাত্রই 'মিলেনিয়ামের' দূরাশা বলিয়া পরিহসিত হইতে থাকিবে? আমি আমার এই কল্পনাকে নিভৃতে পোষণ করিয়া প্রতিদিন সংকল্প আকারে পরিণত করিয়া তুলিতেছি। ইহাই আমাদের একমাত্র মুক্তি, আমাদের স্বাধীনতা, ইহাই আমাদের সর্বপ্রকার অবমাননা হইতে নিষ্কৃতির একমাত্র উপায়।[১২৫]

---

[১২৪]. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৯।

[১২৫]. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪২।

রবীন্দ্রনাথের চিত্তে সনাতন ধর্মের ভিত্তিতে ভারতবর্ষকে একসূত্রে বাধবার একটা ভাবনা সবসময় কাজ করেছে এবং ঐ ভাবনাই তার চিত্তকে ভরে রেখেছে। তিনি বলেছেন :

- সমস্ত উন্নত সমাজই সমাজস্থ লোকের নিকট প্রাণের দাবি করিয়া থাকে। আপনাকে নিকৃষ্ট বলিয়া স্বীকার করিয়া আরামে জড়ত্ব সুখ ভোগে যে সমাজ আপনার অধিকাংশ লোককে প্রশ্রয় দিয়া থাকে সে সমাজ মরে, এবং না'ও যদি মরে তবে তাহার মরাই ভালো।
- য়ুরোপ কর্মের উত্তেজনায়, প্রবৃত্তির উত্তেজনায় সর্বদাই প্রাণ দিতে প্রস্তুত— আমরা যদি ধর্মের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত না হই তবে সে প্রাণ অপমাণিত হইতে থাকিলে অভিমান প্রকাশ করা আমাদের শোভা পায় না।[১২৬]

রবীন্দ্রনাথ একটা পর্যায়ে ভারতবর্ষের রসাতলে যাওয়া থেকে উদ্ধার পাবার জন্য ব্রাহ্মণদেরকে নেতৃত্ব গ্রহণ করার অনুরোধ করেন এবং লেখেন :

- ভারতবর্ষের সেই ব্রাহ্মণ কোথায় যিনি স্বভাবসিদ্ধ প্রতিভাবলে অতি অনায়াসেই সেই বিপুল জটিলতার মধ্যে ঐক্যের নিগূঢ় সরল পথ নির্দেশ করিয়া দিবেন? সেই ব্রাহ্মণকে ভারতবর্ষ নগর কোলাহল ও স্বার্থ সংগ্রামের বাহিরে তপোবনে ধ্যানাসনে অধ্যাপকের বেদীতে আহ্বান করিতেছে— ব্রাহ্মণকে তাহার সমস্ত অবমাননা হইতে দূরে আকর্ষণ করিয়া ভারতবর্ষ আপনার অবমাননা দূর করিতে চাহিতেছে।[১২৭]

ব্রাহ্মণদের নেতৃত্ব মানে তো theological state সে কথা কি আমরা ভেবে দেখেছি?

রবীন্দ্রনাথের সেকুলার স্তাবকরা দাবি করে থাকেন তিনি যখন গোরা উপন্যাস (১৯১০) লেখেন তখন তার এইসব চিন্তাভাবনার পরিবর্তন হয়। তিনি নাকি হিন্দু বা ব্রাহ্মধর্মের গণ্ডী থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন এবং তখন থেকে ধর্ম মাত্রই তার কাছে গণ্ডীর মতো মনে হয়েছিল। এসব কথা শ্রুতিমধুর হলেও বাস্তবে কী ঘটেছিল সেটাই আমাদের বুঝতে হবে। রবীন্দ্রনাথ ঘোষণা দিয়ে ধর্মত্যাগ করেন নি, নাস্তিকতাকেও গ্রহণ করেন নি। তিনি কোনো ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থার পক্ষেও জোরালোভাবে কিছু বলেন নি। যা হয়েছিল তা হলো গোরা উপন্যাসে তিনি ধর্মমত ও দেশপ্রেমের একটা সমন্বয় করেছেন এবং তিনি তার চিন্তা-ভাবনাকে যথাসম্ভব উদারীকরণের চেষ্টা করেন। কারণ ধর্মীয় আন্দোলনের সাথে রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘদিন যুক্ত থেকে বুঝতে পেরেছিলেন জাত- পাত সংস্কারনির্ভর হিন্দু ধর্মের পক্ষে যুগধর্মের চাহিদা মেটানো সম্ভব নয় এবং এই বৈশিষ্ট্য নিয়ে হিন্দু ধর্ম পৃথিবীর সামনে দাঁড়াতে পারবে না। একসময় তার মনে সংশয় জেগেছিল হিন্দু ধর্মের পক্ষে কি বিশ্বজনীন হওয়া সম্ভব? প্রভাত মুখোপাধ্যায় লিখেছেন :

---

১২৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ব্রাহ্মণ', রবীন্দ্র রচনাবলী, ২য় খণ্ড, কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৪১০।

১২৭. প্রাগুক্ত।

> অতীতকে অস্বীকার না করিয়া, বর্তমানকে অবজ্ঞা না করিয়া, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অবাস্তবতার আকাশকুসুম না রচিয়া— হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু সমাজকে বিশ্বধর্ম ও বিশ্বমানবের পটভূমিতে রাখিতে চাহিলেন। এই আকাঙ্খা হইতে তাঁহার রসবিদগ্ধ চিত্ত ভাবধারার নূতন পথ পাইল।[১২৮]

বস্তুত এই আকাঙ্খারই ফসল গোরা উপন্যাস। রবীন্দ্রনাথের সেকুলার গুনগ্রাহীরা প্রায়শই তার 'মানুষের ধর্ম' শীর্ষক অক্সফোর্ডে দেয়া বক্তৃতার (১৯৩০) নজির তুলে বলেন তিনি নাকি রীতিমতো সেকুলার হয়ে গিয়েছিলেন। এই বক্তৃতাটি অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করলে দেখা যায় এখানে তিনি যে ধর্মের শরীর খাড়া করেছেন তা একান্তই হিন্দু ও ভারতবর্ষীয়। তবে তার রূপটি সনাতন হিন্দু ধর্মের মতো গণ্ডীবদ্ধ নয়। তুলনামূলকভাবে উদার। এই ধর্মের অবয়ব নির্মাণ করতে যেয়ে তিনি অসংখ্য হিন্দু ধর্মীয় শ্লোকের উদ্ধৃতি দিয়েছেন আর দিয়েছেন বাংলাদেশের আউল-বাউলদের গানের উদ্ধৃতি। এটাই প্রমাণ করে— তিনি যে মানুষের ধর্মের কথা বলেছেন তা কিন্তু বিশেষ দেশ, বিশেষ ভাষা, সমাজ, ধর্ম ও সংস্কৃতির মধ্যেই লালিত। সেই অর্থে এটি সাম্প্রদায়িকও বটে। প্রত্যেক ধর্মেরই কালে কালে সংস্কারের প্রয়োজন হয়। অতীতের আবর্জনারাশি ছুঁড়ে ধর্মের মৌলিক আদর্শকে নবযুগের সাথে মিলিয়ে নেয়ার প্রয়োজন হয় । না হলে ধর্ম তার আবেদন হারিয়ে ফেলে । প্রত্যেক ধর্মের মধ্যে এর নজির আছে। এদেশে হিন্দু ধর্মের মধ্যে বৈষ্ণব ও ব্রাহ্ম আন্দোলন তার বড় প্রমাণ। রবীন্দ্রনাথ রাজা রামমোহন রায়কে অনুসরণ করে হিন্দু ধর্মের একটা উদার চেহারা দিতে চেয়েছিলেন। এটাকে যারা সেকুলারিজমের সাথে তুলনা করে ফেলেন তারা না বোঝেন ধর্ম, না বোঝেন সেকুলারিজম । এর পেছনে সস্তা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলই উদ্দেশ্য। প্রভাত মুখোপাধ্যায় লিখেছেন :

> রবীন্দ্রনাথের মানুষের ধর্ম ব্যাখ্যানের মধ্যে আমরা যে ধর্মভূমিকা দেখিতে পাই, তাহা ভারতীয়, তাহা হিন্দু, তাহা ঔপনিষদিক, তাহা ব্রাহ্মধর্মকেন্দ্রিক । তবে হিন্দু ধর্মের মধ্যে যাহা সর্বজনগ্রাহ্য তাহাকেই তিনি বিশ্বধর্মের আসন দান করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষণগুলি প্রধানত হিন্দু পটভূমির উপর রচিত হইলেও তাহা বিশ্বমানবের ধর্মসমস্যা পূরণ করিয়াছে; সেই জন্য কবির ধর্মের নাম Religion of Man— মানুষের ধর্ম। রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য শ্রোতাদের নিকট ভারতের প্রাচীন শাস্ত্রীয় মতবাদের যে ভাষ্য করিলেন, তাহা নহে, তিনি ভারতের জনসমাজের মধ্যে যে আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য রহিয়াছে, তাহারও ব্যাখ্যা করেন।[১২৯]

---

[১২৮]. প্রভাত মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র জীবনী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৫০।

[১২৯]. প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪০৭-৪০৮।

রবীন্দ্রনাথের জন্মের পর যেমন হিন্দু আচারাদি অনুসরণ করা হয়েছিল, মৃত্যুর পরও তার ব্যতিক্রম হয় নি। বন্দে মাতরম বলে জনতা শ্লোগান দিতে দিতে তার লাশ জোড়াসাঁকো থেকে নিমতলা শশ্মান ঘাটে নিয়ে দাহ করেছিল। রবীন্দ্রনাথ কবি ও শিল্পী ছিলেন সত্য। একই সাথে তিনি একজন হিন্দু প্যাট্রিয়ার্ক (Hindu Patriarch) ছিলেন একথা যেন আমরা ভুলে না যাই।

রবীন্দ্রনাথ ও মুসলমান সমাজ

হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের কার্যকারণ খুঁজতে যেয়ে রবীন্দ্রনাথ একবার লিখেছিলেন—'হিন্দু-মুসলমানের সম্বন্ধ লইয়া আমাদের দেশের একটা পাপ আছে।'[১৩০] আমরা জানি হিন্দু-মুসলমানের সম্বন্ধ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ বিস্তর লেখালেখি করেছেন এবং পারস্পরিক সম্বন্ধের মধ্যে যে পাপ আছে তা সংশোধনের পথ তার মতো করে কিছুটা বাতলেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কি জানতেন মুসলিম সমাজের সাথে তার নিজের সম্বন্ধের ক্ষেত্রেও একটা পাপ ছিল? এ কথায় রবীন্দ্রানুরাগীরা বেজায় বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হতে পারেন; কিন্তু বাস্তব সত্য হলো সম্বন্ধের মধ্যে যে একটা বেড়া ছিল সেটা তিনি কখনো অতিক্রম করতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথ হিন্দু ধর্মের ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই হিন্দু সমাজ, জীবন, পূরাণ, ইতিহাস, ঐতিহ্য তার সাহিত্যে বেশিরভাগ স্থান দখল করে আছে। এ কারণেই প্রশ্ন উঠেছে—বাংলাভাষীদের মধ্যে ধর্মের দিক দিয়ে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও তার সুবিশাল সাহিত্যে মুসলিম জীবন তেমন চিত্রিত হয় নি। এর উত্তর হতে পারে সমাজ ও পরিবেশের প্রভাব তার উপরে ভালোমতো পড়েছিল। যে কালে তিনি জন্মেছিলেন সেটা ছিল হিন্দু জাতীয়তাবাদের উন্মেষকাল। তার পরিবারের কীর্তিমান ব্যক্তিরাও এই জাতীয়তাবাদের রস সিঞ্চনে বড় ভূমিকা পালন করেছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এই হিন্দু জাতীয়তাবাদের ঘোর কাটানো পুরোপুরি সম্ভব হয় নি।

অন্যদিকে কবি হিসেবে তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতি পেয়েছিলেন। বিভিন্ন দেশ ও সংস্কৃতির সাথে তার পরিচয় ঘটেছিল। এই আন্তর্জাতিক আদান-প্রদান তার ভিতরে একটা উদারনৈতিক চিন্তাভাবনার স্ফুরণ ঘটিয়েছিল। সারাজীবন তিনি এই হিন্দুত্ব ও উদারনীতির দ্বন্দ্বে পীড়িত হয়েছেন। তার সৃষ্টি এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ। পশ্চিমবঙ্গের প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী শিবনারায়ণের চোখেও এই ব্যাপারটা ধরা পড়েছে :

> তিনি (রবীন্দ্রনাথ) কিন্তু ইসলাম সম্পর্কে কিছুই চর্চা করেননি। সম্পূর্ণ অবহেলা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের সমস্ত লেখা পড়লেও কোথাও দেখা যাবেনা তিনি কোরান দেখেছেন। এতবড় সংখ্যক একটা প্রতিবেশী তাদের যে কি বিশ্বাস সেটা জানার কোন আগ্রহ ছিল না।[১৩১]

যা-ই হোক রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিতে মুসলমান চরিত্র যা এসেছে তার মধ্যে উদারতা ও সংকীর্ণতার দুই রূপই ফুটে উঠেছে। কোথাও তিনি মুসলমান চরিত্রকে হেয় করেছেন, কোথাও করেছেন মহীমান্বিত। এটা তিনি শিল্পী হিসেবে করেছেন না ধর্মীয় ভেদবুদ্ধিতে সাড়া দিয়ে করেছেন তা

---

১৩০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ব্যাধি ও প্রতিকার', রবীন্দ্র রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড, কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৪১০।

১৩১. প্রতিক্ষণ, জুলাই ১৯৯৩, কলকাতা, পৃ: ১৭।

অবশ্যই বিচার্য। তবে এসব চরিত্র খুব ব্যতিক্রম ছাড়া কখনও প্রধান হয়ে ওঠে নি। মুসলিম সমাজ ও জীবনের উল্লেখ করার মতো চিত্র এখানে ধরা পড়ে নি। ফলে বাঙালি মুসলমানের সমাজ জীবনের একটা চিত্র তার সাহিত্যে বরাবর অধরা রয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথ গোরার মতো বিকল্প কোনো মুসলিম চরিত্র আঁকতে পারেন নি । আবার তার সৃষ্ট কোনো কোনো চরিত্র মুসলিম মানসকে আঘাতও দিয়েছে। ১৩১০ সনের 'নবনূর' পত্রিকার মাঘ সংখ্যায় বিখ্যাত মুসলিম সাহিত্যিক কাজী ইমদাদুল হক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দূরাশা' গল্প সম্বন্ধে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে লেখেন :

- 'দূরাশাতে' বাদশাহজাদী বদ্রাত্তনকুমারী (সম্ভ্রান্ত বলা যায় কি? কি জানি!) নিজমুখে তাঁহার প্রেমের গল্প বলিতেছেন। তিনি পিতার সেনাপতি বীর ব্রাহ্মণ কেশবলালের প্রতি অনুরক্তা। বাদশাহজাদী নাকি স্বধর্মের কথা কখনো শুনেন নাই। স্বধর্মসঙ্গীত উপাসনাবিধিও জানিতেন না, কেন না বিলাসিতায় মুসলমান সমাজের ধর্মবন্ধন শিথিল হইয়া গিয়াছিল! (মুসলমান রমণী, বিশেষ রাজকুমারী, যে কোন অবস্থায় হউক না কেন, উপাসনা বিধি জানেন না, এ কল্পনা নিতান্তই original বলিতে হইবে! কবির উপযুক্ত বটে!) ...
- রবিবাবু দেখাইয়াছেন, মুসলমান রমণী হিন্দু রক্তপ্রবাহ শিরায় অনুভব করিয়া গর্ব করা সত্ত্বেও হিন্দু স্বামী লাভ করিতে হইলে তাহার বহু সাধনা আবশ্যক; কেননা; তাহার দেহে যেটুকু হিন্দুর রক্ত আছে, মুসলমান সংস্পর্শে সেটুকুর জাতি গিয়াছে। রবিবাবুর এ কল্পনায় মুসলমান সমাজ খুবই সম্মানিত ও আপ্যায়িত হইয়াছেন, সন্দেহ নাই ! বঙ্গের প্রিয় কবিরও এই কীর্তি, সুতরাং তাঁহাকে ধন্যবাদ।[১৩২]

অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি করেছেন 'কাবুলিওয়ালা' গল্পের রহমতের মতো অসাধারণ চরিত্র যার আবেদন দেশ ও কালের উর্ধ্বে। তারপরেও বলতে হবে জমিদারী সূত্রে তিনি পূর্ব বাংলায় এসেছেন, বাস করেছেন । তার অধিকাংশ প্রজা ছিলেন মুসলমান। এদেরকে তিনি খুব নিকট থেকে দেখেছেন। কিন্তু তার রচনায় বহু কিছু ধরা দিলেও মুসলিম সমাজ বড় একটা উঠে আসে নি । মুসলিম অধ্যুষিত শাহজাদপুরে বসে তিনি পোস্টমাস্টারের মতো অসাধারণ ছোটো গল্প লেখেন। কিন্তু সেখানে তিনি বালিকা রতনের মুসলমান বিকল্প খুঁজে পান নি । এদেশের রবীন্দ্রানুরাগীরা দাবি করেন রবীন্দ্রনাথ যে মুসলমানবান্ধব ছিলেন তার প্রমাণ হচ্ছে 'শাজাহান' কবিতা। এখানে তিনি শাজাহানকে 'ভারত ঈশ্বর শাজাহান' এবং 'তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ' বলে সম্মান দেখিয়েছেন।

---

১৩২. কাজী ইমদাদুল হক, 'বিমলা ও হিন্দু সমাজ', কাজী ইমদাদুল হক রচনাবলী । ঢাকা: কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড, ১৯৬৮ ।

সত্য বটে শাজাহান রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা, শ্রেষ্ঠতম বললেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু এ কবিতায় শিল্পরসিক কবি তাজের সৌন্দর্য বিচার করেছেন আর শাজাহানের প্রেমকে অবিনশ্বর পটভূমিকায় স্থান দিয়েছেন। কবির মনে তাজমহলের সৌন্দর্য ও শাজাহানের প্রেমকে সামনে রেখে যে ভাবোদয় হয়েছে তার রস শাজাহানের মধ্যে আরোপ করে এক বিশেষভাবে তিনি তা অনুভব করতে চেয়েছেন। এখানে শাজাহান উপলক্ষ মাত্র। তাজমহলের সৌন্দর্য ও শাজাহানের প্রেম কবি মনে এক নৈর্বক্তিক আলোড়ন তুলেছে । তিনি এটিকে দেখেছেন জীবন- মৃত্যুর নিত্য স্রোতের পটভূমিকায়। 'শুধু থাক/ এক বিন্দু কপোল তলে শুভ্র সমুজ্জ্বল । এ তাজমহল'— এ প্রেমের কাব্য বাণী দিয়ে কবি এই উৎকৃষ্ট শিল্পকলার সৌন্দর্য উপভোগ করেছেন। কিন্তু এটিকে একটি মুসলিম কীর্তি কিংবা মোঘল ঐশ্বর্যের শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ এই ভাবনা তাকে কখনো আলোড়িত করে নি। উল্টো মোঘল শাসন সম্পর্কে তিনি কখনোই প্রসন্ন ছিলেন বলে মনে হয় না। মোঘল শাসন তার কাছে মনে হয়েছে 'নিশীথ রাতের দুঃস্বপ্ন কাহিনী' মাত্র।[১৩৩] এ কারণেই বোধ হয় তিনি মোঘলদের বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করেছিলেন যেমন শিবাজী ও শিখ গুরু গোবিন্দ— তাদেরকে তিনি তার কবিতায় মাহাত্ম্য আরোপ করেছেন ।

রবীন্দ্রনাথ জীবদ্দশায় অনেক প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখেছেন, পুস্তক সমালোচনা করেছেন । ইসলাম ধর্মীয় বিভিন্ন উৎসবে তিনি দু-একবার বাণীও প্রেরণ করেছেন এবং অনেক মুসলিম লেখক-শিল্পী-কবিদের লেখালেখি, বই-পুস্তক নিয়ে তার মতামতও দিয়েছেন। এসব লেখালেখিতে মুসলমানদের সম্পর্কে তার বিচিত্র মতামত প্রকাশিত হয়েছে। বিশেষ করে ঘৃণা ও স্তুতি কোনোটিতেই তিনি কম পারদর্শিতা দেখান নি। একদিকে কালান্তরের প্রবন্ধগুচ্ছতে তিনি হিন্দু-মুসলমান সমস্যাকে গভীরভাবে বোঝার চেষ্টা করেছেন; অন্যদিকে একই জায়গায় মুসলিম ইতিহাসকে সৃষ্টিবৈচিত্রহীন বলে বিদ্রুপ করেছেন। তিনি লিখেছেন :

> (মুসলমান) রাজ্য সংঘটন করেছে, কিন্তু তার চিত্তের সৃষ্টিবৈচিত্র্য ছিল না ... রাষ্ট্রপ্রণালীতে মুসলমানের প্রভাব প্রবেশ করেছে, চিত্তের মধ্যে তার ক্রিয়া সর্বতোভাবে প্রবল হয়নি।[১৩৪]

মুসলিম ইতিহাস যদি সৃষ্টি বৈচিত্রহীন হয় তবে তাজমহলের সৃষ্টি সম্ভব হলো কী করে! কীভাবে ভারতীয় কাব্য, সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্পকলা, স্থাপত্য অসাধারণ মুসলিম সব অবদানে পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো! কবির অনেক বক্তব্যের সাথে দ্বিমত পোষণ করার সংগত কারণ আছে। অনেক ক্ষেত্রে তার বক্তব্য স্ববিরোধীও বটে । একদিকে কবি 'কোট বা চাপকান' প্রবন্ধে ভারতবর্ষে হিন্দু- মুসলমানের মিলিত ঐতিহ্য নিয়ে গর্ব করেছেন, 'অত্যুক্তি' প্রবন্ধে তিনি মুসলমান সম্রাটদের উদারতার প্রশংসা করেছেন; অন্যদিকে 'কণ্ঠরোধ' প্রবন্ধে তিনি

---

১৩৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ভারতবর্ষের ইতিহাস', রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড।

১৩৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'কালান্তর', রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড ।

মুসলমানদের বলেছেন অবিবেচক, 'ইংরাজ ও ভারতবাসী' প্রবন্ধে তিনি মুসলমান রাজাদের বলেছেন অত্যাচারী।

কখনো কখনো রবীন্দ্রনাথ মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়েও উঠেছেন। 'কংগ্রেস প্রভৃতির চেষ্টায় হিন্দু-মুসলমান ঐক্যপথে অগ্রসর হয় এই আশঙ্কায় ইংরাজ উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে 'ধর্মবিদ্বেষ' জাগিয়ে রেখে 'মুসলমানদের দ্বারা হিন্দুর দর্পচূর্ণ করে 'মুসলমানকে সন্তুষ্ট ও হিন্দুকে অভিভূত' করতে প্রয়াসী ছিল।' কবি সুবিচারের অধিকার দাবি করতে গিয়ে বলেছেন যে 'মুসলমানের জন্য ইংরাজের স্তনে ক্ষীরসঞ্চার এবং হিন্দুর জন্য পিত্তসঞ্চার হয়েছে এবং মুসলমান রাজভক্তিভরে অবনত প্রায় হয়ে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য পথে বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে'।[১৩৫]

রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় লিখেছেন :

> আজ মুসলমানকে আমরা দেখি সংখ্যারূপে; তারা সম্প্রতি আমাদের রাষ্ট্রিক ব্যাপারে ঘটিয়েছে যোগ-বিয়োগের সমস্যা। অর্থাৎ এই সংখ্যা আমাদের পক্ষে গুণের অঙ্কফল না কষে ভাগেরই অঙ্কফল কষছে। দেশে এরা আছে অথচ রাষ্ট্রজাতিগত ঐক্যের হিসাবে এরা না থাকার চেয়েও দারুণতর ...[১৩৬]

তার মানে রবীন্দ্রনাথ মনে করেন মুসলমান তার ন্যায্য পাওনাটুকু পেতে পারে না অথবা তারা ইংরেজ সমীপে দাবি-দাওয়া করতে পারে না— যতই তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হোক। সমকালীন সাম্প্রদায়িক রাজনীতির স্রোতে যে তিনিও ভেসে যেতেন এবং তখন তার মহৎ কথাবার্তাও যে মূল্য হারাতো তা বলাই বাহুল্য। রবীন্দ্রনাথ 'ভারততীর্থের' মতো কবিতা লিখেছেন; 'তপোবন', 'ভক্ত', 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা', 'আত্মপরিচয়', 'হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়' প্রভৃতি প্রবন্ধ লিখেছেন। এখানে তিনি হিন্দু ধর্ম ও প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যে বিশ্বজনীন আদর্শ অনুসন্ধান করেছেন। এর মধ্যে যে জাতীয়তাবাদ বিধৃত হয়েছে তার নাম হিন্দু জাতীয়তাবাদ। রবীন্দ্রনাথ এক সময় মুসলমানদেরকে মুসলমানও বলতে চান নি। কারণ তার থিওরি হচ্ছে, মুসলমান একটি ধর্ম, কিন্তু হিন্দু কোনো বিশেষ ধর্ম নহে। হিন্দু ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি জাতিগত পরিণাম। তাই মুসলমানরা তার কাছে 'হিন্দু মুসলমান'।[১৩৭]

রবীন্দ্রনাথের এই থিওরি আজকের দিনে কতটুকু গ্রহণ করা সম্ভব? আধুনিক জাতিরাষ্ট্র, সেকুলার রাষ্ট্র কোনো কিছু দিয়েই কি একে ব্যাখ্যা করা যায়? রবীন্দ্রনাথ কি তাহলে কোনো ধর্মীয় রাষ্ট্রের কথা বলেছিলেন?

---

[১৩৫]. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সুবিচারের অধিকার', রবীন্দ্র রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড।

[১৩৬]. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'কালান্তর', রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড।

[১৩৭]. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'আত্মপরিচয়', রবীন্দ্র রচনাবলী, নবম খণ্ড।

রবীন্দ্রনাথের জাতি সম্পর্কিত চিন্তাভাবনা আরো স্ববিরোধী ও বিভ্রান্তিতে পূর্ণ। বহু প্রবন্ধে জাতি বলতে রবীন্দ্রনাথ হিন্দুকেই বুঝিয়েছেন এবং ভারতবর্ষ ও হিন্দুত্বকে তিনি সমার্থক করে ফেলেছেন।'রামমোহন রায়', 'ব্রাহ্মণ', 'ভারতবর্ষের ইতিহাস', 'ভারতবর্ষীয় সমাজ', স্বদেশী সমাজ' প্রভৃতি প্রবন্ধে এই ভাবনার প্রতিফলন দেখা যায়। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষীয় জাতিসত্তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন :

> যদি ভারতবর্ষীয় জাতি বলিয়া একটি জাতি দাঁড়াইয়া যায়, তবে তাহা কোনোমতেই মুসলমানকে বাদ দিয়া হইবে না।[১৩৮]

শুধু চিন্তামূলক প্রবন্ধের ক্ষেত্রে নয়, রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিও এমনই কুয়াশায় আচ্ছন্ন। ১৯২৩ সালের 'সুলতান' পত্রিকায় 'রবি বাবুর আতঙ্ক' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছে :

> সম্প্রতি একটি ভয়ঙ্কর রোগ দেখা দিয়েছে। এই রোগের নাম 'মোছলেম আতঙ্ক', ... বিশ্ব পরিচিত নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত মহাকবি, মহাদার্শনিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও এই রোগে গুরুতররূপে আক্রান্ত হইয়াছেন। ... তিনি এক দফা বলিয়াছেন, ভারতে স্বরাজ হইলে এখানে মোছলেম রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে। তারপর তিনি বলিয়াছেন খেলাফতে হিন্দুর যোগদান মারাত্মক ভুল হইয়াছে ...। খেলাফত ও তুরস্কের সাথে হিন্দুর কোন স্বার্থ জড়িত নাই । রবি বাবু কবি, খুব বড় কবি— জগৎ প্রসিদ্ধ কবি তাহা স্বীকার করি । কিন্তু ইহা স্বীকার্য, তিনি রাজনীতিবিদ নহেন, রাজনীতির সহিত তাঁর কোনদিন সম্বন্ধ হয় নাই— ছিল না। তিনি যেমন বড় কবি, তাঁহার কল্পনারাজ্যের সীমানাটাও তেমনি প্রশস্ত। তাই তিনি ভারতে মোছলেম রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দুঃস্বপ্ন দেখিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতেছেন ।[১৩৯]

রবীন্দ্রনাথ খেলাফত আন্দোলন পছন্দ করেন নি এবং তার পক্ষে সেটি পছন্দ না করার হয়তো সংগত কারণ আছে। কিন্তু প্রভাত মুখোপাধ্যায় লিখেছেন হিন্দু মহাসভা গঠনে তিনি পরোক্ষ সমর্থন জানিয়েছিলেন।[১৪০]

মংপু থেকে ১৯৩৯ সালের ২০ জুন রবীন্দ্রনাথ অমিয় চক্রবর্তীকে একটি চিঠি লেখেন যা 'কংগ্রেস' শিরোনামে কালান্তরে সংযোজিত হয়। মুসলিম প্রসঙ্গের একটি উদ্বেগময় দিক এ পত্র নিবন্ধের পুনশ্চ বক্তব্যে লক্ষ করা যায়। হিন্দু- মুসলমানের মধ্যে চাকরির হার বাটোয়ারা নিয়ে হিন্দু সম্প্রদায় ভারত শাসন দরবারে একটি দরখাস্ত পেশ করেছিলেন— মুসলমানদের

---

১৩৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'কোট বা চাপকান', রবীন্দ্র রচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড ।

১৩৯. সোলতান, অষ্টম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা।

১৪০. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক, চতুর্থ খণ্ড। কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৪১৭।

ভাগে বেশি চাকরি হয়েছে এই অভিযোগ জানিয়ে। এই অভিযোগপত্রে রবীন্দ্রনাথ নাম স্বাক্ষর দিয়েছিলেন। অথচ এই রবীন্দ্রনাথই এক সময় (১৯০৮) বলেছিলেন :

- আমরা ইংরেজের ইস্কুলে বেশি মনোযোগের সঙ্গে পড়া মুখস্থ করিয়াছি বলিয়া গবর্মেন্টের চাকরি ও সম্মানের ভাগ মুসলমান ভ্রাতাদের চেয়ে আমাদের অংশে বেশি পড়িয়াছে। ... যে রাজপ্রসাদ এতদিন আমরা ভোগ করিয়া আসিয়াছি আজ প্রচুর পরিমাণে তাহা মুসলমানদের ভাগে পড়ুক, ইহা আমরা যেন সম্পূর্ণ প্রসন্ন মনে প্রার্থনা করি।[১৪১]

১৯০৮-এর রবীন্দ্রনাথ ১৯৩৯-এ এসে কেমন করে বদলে গেলেন। এ প্রসঙ্গে পশ্চিম বঙ্গের একজন লেখক লিখেছেন :

- এখানে উল্লেখযোগ্য যে কবিগুরু যখন মুসলমানদের বেশি দিয়ে সমান করার কথা বলেছিলেন, তখন ছিল ১৯০৮ ও ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দ। তখনও বঙ্গভঙ্গ রদ হয়নি। তা হয়েছিল তার কিছু পরে— এই ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দেই । তখনও মুসলিম-তোষণ ও মুসলমানদের জন্য বোধহয় কিছু অনুরাগের দরকার ছিল। কিন্তু ঐ বছরই যখন বঙ্গভঙ্গ বাতিল হয় আর ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক আরও খারাপ হয়, তখন তিনি মুসলমানদের বেশী পাওয়ার দাবীকে স্বীকার করতে চাননি।[১৪২]

রবীন্দ্রভাবনার এই কুয়াশা তার জীবনব্যাপি প্রবাহিত। এর কার্যকারণ কী? ঊনিশ শতকের কলকাতা কেন্দ্রিক নবজাগরণের বিকাশ ধারায় তিনি ছিলেন পূরোধা। ঔপনিবেশিক কলকাতায় ব্রিটিশের সমর্থনে যে বুর্জোয়া সংস্কৃতির চর্চা হয়েছিল তা ছিল অসম্পূর্ণ। সেদিনের সেই বুর্জোয়া সংস্কৃতি হিন্দু মৌলবাদের সাথে আপোষ করে এগিয়েছে। ঔপনিবেশিক কলকাতায় নবজাগরণের সূত্রে সামন্ততন্ত্র, ধনতন্ত্র ও মৌলবাদের এক অদ্ভূত খিচুড়ী শিল্প-সাহিত্যের মধ্যেও প্রতিফলিত হয়েছে। নান্দনিক ধ্যান-ধারণাগুলো হিন্দু জাতীয়তাবাদের বেড়াজাল ভেঙেচুরে বেরিয়ে আসতে পারে নি। এই আপোষ কখনও বা প্রাচীন ভারতীয় চিন্তাভাবনার সঙ্গে ইউরোপীয় চিন্তাধারার সমন্বয়রূপে দেখা দিয়েছে। রবীন্দ্র সাহিত্যও এ সমন্বয়ের ভিতর দিয়ে গা বাঁচিয়ে চলেছে। এ কারণেই তার লেখালেখিতে স্ববিরোধী, বিপরীতধর্মী কথাবার্তার ছড়াছড়ি অনেক বেশি। তার কোনো স্থির প্রত্যয় না থাকায় তিনি কখনো বাইরের সামাজিক-রাজনৈতিক চাপে হিন্দুত্বের দিকে ঝুঁকেছেন, কখনো বা ইউরোপীয় আধুনিকতার হাওয়ায় দুলেছেন।

---

১৪১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সভাপতির অভিভাষণ; পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনী', রবীন্দ্র রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড।

১৪২. ১৩. সৈয়দ আব্দুল হালিম, বাঙ্গালী মুসলমানের উৎপত্তি ও বাঙ্গালী জাতির বিকাশের ধারা, তৃতীয় খণ্ড, ঢাকা : নবযুগ প্রকাশনী, ২০১৬।

বিশ শতকের গোড়ার দিকে আমাদের দেশের কয়েকজন সেকুলার সাহিত্যব্রতী শিখা আন্দোলন গড়ে তুলে অনাবশ্যকভাবে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে ভাবের আতিশয্য দেখিয়েছিলেন। এদের মধ্যে আবুল ফজল রবীন্দ্রনাথকে বলেছেন মুক্তবুদ্ধির পথিকৃৎ (রবীন্দ্রনাথ ও ধর্ম), কাজী মোতাহার হোসেন তাকে বলেছেন পূর্ণাঙ্গ মানুষ (রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প ও বাংলার সামাজিক জীবন), আর কাজী আবদুল ওদুদতো তাকে আকাশের সূর্য বানিয়ে ছেড়েছেন (আনোয়ারুল কাদীর প্রণীত 'আমাদের দুঃখ')। এরা রবীন্দ্রনাথের সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত না করে তাকে বাঙালি মুসলমান সমাজে প্রায় অন্ধভাবে গ্রহণীয় করে তোলার চেষ্টা করেছেন। এরকম চেষ্টা পরবর্তীকালে মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, মুহম্মদ মজিরউদ্দীন মিয়া, ভুইয়া ইকবাল, আবুল মোমেন প্রমুখের লেখালেখিতে দৃশ্যমান।

এসব রবীন্দ্রানুরাগীদের মতামতের মধ্যে যুক্তিবাদিতা কম, ভাবাবেগই প্রধান। এর ফলে রবীন্দ্রনাথকে সুবিধাবাদীরা ইচ্ছামতো ব্যবহার করেছেন। এখানকার সেকুলার ভাবুকরাতো রবীন্দ্রনাথকে বাঙালি সংস্কৃতির পূরোধা বানিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু তার সৃষ্টিকর্ম সামগ্রিকভাবে সেটি সমর্থন করে না। রবীন্দ্রনাথ বাঙলা ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠতম কবি ছিলেন বলেই তিনি শেষ কথা বলে গেছেন এমন অন্ধবিশ্বাস এক ধরনের মৌলবাদিতা ছাড়া কিছু নয়।

রবীন্দ্রনাথ : পুনর্বিবেচনা

রবীন্দ্রনাথের মানসভূমি প্রস্তুত হয়েছিল জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির অনুদার ও সংকীর্ণ চিন্তা চেতনার পরিবেশে। মূলত ইংরেজের প্রশ্রয় ও প্রণোদনায় ঠাকুর বাড়ির প্রভাব ও প্রতিপত্তির বিকাশ ঘটে। ফলে ঠাকুরবাড়ির সংস্কৃতিতে সেকালের আর দশটা উঠতি হিন্দু পরিবারের মতোই হিন্দুত্বের সাথে কিছুটা ইউরোপীয় হাওয়া লেগেছিল মাত্র। একে আর যাই হোক উদার ও সর্ব- সমন্বয়বাদী কোনো পরিবেশ বলা চলে না। রবীন্দ্রনাথের পিতা দেবেন্দ্রনাথসহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা কমবেশি সবাই ভারতবর্ষ ও বিশুদ্ধ হিন্দুত্ব নিয়ে এক ধরনের অন্ধ মোহ ও অহঙ্কারের চর্চা করেছেন। কখনো কখনো ভারতবর্ষ ও হিন্দুত্বকে সমার্থক হিসেবেও তারা বিবেচনা করতে দ্বিধান্বিত হন নি। এই আকাঙ্ক্ষার মূলে প্রচ্ছন্ন ছিল হিন্দু জাতীয়তাবাদ যা পরিণামে রবীন্দ্রনাথকে শিবাজী উৎসবের মতো উৎকট সাম্প্রদায়িক কবিতা লিখতে অনুপ্রাণিত করেছিল, প্ররোচিত করেছিল ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করতে। এমনকি হিন্দু মেলা কিংবা মুসলিম বিরোধী রাজনীতিতে তার সংশ্রব লক্ষ করবার মতো। তার মন- মানস পরিচর্যার ক্ষেত্রে ঠাকুরবাড়ির এই প্রভাব যেমন সক্রিয় হয়েছিল তেমনি উনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দু জাতীয়তাবাদের যে উন্মেষ আমরা লক্ষ করি তা-ও রবীন্দ্র মানস গঠনে ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করে।

কুষ্টিয়ার শিলাইদহ, পাবনার শাহজাদপুর ও রাজশাহীর পতিসরে ঠাকুর পরিবারের জমিদারি ছিল। এ জমিদারির অধিকাংশ প্রজাই ছিলেন দরিদ্র কৃষক এবং তারা প্রায় সবাই মুসলমান। ১৮৯১ সালে রবীন্দ্রনাথ পূর্ব বঙ্গে আসেন জমিদারি তদারক করতে এবং এভাবেই মুসলমান সম্প্রদায়ের সাথে তার সরাসরি পরিচয় ঘটে। পূর্ব বাংলার গ্রামীণ পরিবেশে এসেও তার কবিমন গজদন্ত মিনার থেকে নেমে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছুতে পারে নি। হয়তো পূর্ব বাংলার নিসর্গ তার সৌন্দর্যরসিক মনকে কিছুটা নাড়া দিয়ে থাকলেও এখানকার সমাজ, জীবনধারা ও মূল্যবোধ কোনো কিছুতেই তিনি আকর্ষণ বোধ করেন নি। পূর্ববঙ্গ ও তার অধিবাসীদেরকে তিনি কবি ও শিল্পীর কৌতুহলের চেয়ে জমিদারের শ্রেণি চেতনা ও ঐতিহ্য সূত্রে প্রাপ্ত ঠাকুর বাড়ির সংকীর্ণ মূল্যবোধ দিয়েই দেখবার চেষ্টা করেছেন মাত্র। এ কারণেই তার দীর্ঘ বিস্তৃত জীবনের সৃষ্টি ও রচনাবলীতে বাংলার অধিকাংশ মানুষের কথা ও কাহিনী প্রায় অনালোকিত রয়ে গেছে। যতটুকু বা রবীন্দ্র দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিল তাতেও অনাদর, অবহেলার চিহ্ন স্পষ্ট। তার চোখের সামনে যে বহুকালের অন্ধকার জমাট বেঁধে ছিল পদ্মা প্রবাহ বিধৌত পূর্ব বঙ্গের উদার প্রকৃতি আর এখানকার অধিবাসীদের অসাম্প্রদায়িক প্রযুক্ত চেতনাও তা অপসারণ করতে পারে নি বলেই মনে হয়। আর এ কারণেই রবীন্দ্রনাথের জীবনদৃষ্টি জমিদারি মাত্রা ছাড়িয়ে পুরোপুরি এক কবির অমৃতলোকে বিহার করতে পারে নি।

নিজের জমিদারি এলাকায় যে রবীন্দ্রনাথকে আমরা দেখি তা একজন শোষক জমিদারের নাম ভূমিকায় বড্ড বেশি মানায়।

রবীন্দ্রনাথ তার জমিদারিতে গরু কুরবানি নিষিদ্ধ করেছিলেন, বলপূর্বক মুসলিম প্রজাদের উপর খাজনা বৃদ্ধি করেছিলেন, প্রজা বিদ্রোহের ভয়ে তাদের শায়েস্তা করবার জন্য মুসলিম প্রজাদের গ্রামে হিন্দু নমশুদ্র প্রজাপত্তনের চেষ্টাও লক্ষণীয়। এগুলো আর যাই হোক কোনো মানবিক, উদার, অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। একালে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে রাজনৈতিক মতলববাজ ও সুবিধাবাদী গোষ্ঠীর উচ্ছ্বাসের অন্ত নেই। ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি সংস্কৃতির পক্ষে তাকে একটি জীবন্ত সত্তায় রূপায়িত করতে এই সুবিধাবাদী গোষ্ঠীর ক্লান্তিহীন চেষ্টা অন্তত ইতিহাস ও ঐতিহাসিকতার ধোপে টেকে না। রবীন্দ্রনাথ যে সাংস্কৃতিক চেতনার ধারা বহন করতেন তা কোনো উদার, অসাম্প্রদায়িক সংস্কৃতি ছিল না; তা ছিল হিন্দুত্বের চাদরে মোড়া বাঙালি সংস্কৃতি ।

এ কারণেই উদার, অসাম্প্রদায়িক পূর্ববঙ্গের পরিবেশ থেকে বিদায় নেয়ার পরও তার মানস ভাবনায় খুব একটা পরিবর্তন লক্ষ করা যায় না। তিনি ১৯০১ সালের ডিসেম্বরে শান্তি নিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। লক্ষণীয়— পূর্ব বঙ্গের জমিদারি রবীন্দ্রনাথকে দিয়েছিল আর্থিক সমৃদ্ধি ও সামাজিক প্রতিপত্তি । যে পূর্ব বঙ্গে তিনি দীর্ঘদিন অবস্থান করলেন, সেখানকার দরিদ্র মুসলমানদের জন্য কোনো বিদ্যালয় বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরির কথা তিনি আদৌ ভাবেন নি। শান্তি নিকেতনে যে বিদ্যালয় তিনি স্থাপন করলেন তার নাম থেকে এটির প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য আন্দাজ করা যায়। তার সাথে আর যাই হোক, পূর্ববাংলার দরিদ্র চাষি মুসলমানদের সংশ্রব থাকার কথা নয়। সত্যেন্দ্রনাথ রায় লিখেছেন:

> ১৯০১ সালের ডিসেম্বরে শান্তি নিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হল । নাম থেকে এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য, এর প্রতিষ্ঠাতা বা প্রতিষ্ঠাতাদের লক্ষ্য, এর প্রতিষ্ঠাতা বা প্রতিষ্ঠাতাদের আদর্শ এবং এই বিদ্যালয়ের চরিত্র সহজেই আন্দাজ করা যায়। আদর্শ হল প্রাচীন ভারতের তপোবন। শিক্ষকেরা গুরু, ছাত্ররা ঋষিকুমার । তপোবন যে ঐতিহাসিক সত্য শুধু অতীতে নয়, চিরকালের সত্য, এ আদর্শ যে মোটেই কালাতিক্রান্ত নয়, অবিলম্বে এ কালের জীর্ণ ভারতবর্ষকে উদ্বিগ্ন করে এক মহাজীবনের আবির্ভাব হবে সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মনে বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না। তপোবন বিদ্যালয়ের কাঠামো যে সর্বভারতীয় হওয়া সম্ভব নয়, বাস্তব পরিস্থিতিতে সম্ভব নয়, তা রবীন্দ্রনাথের মনে হয়নি, অন্তত তখন মনে হয়নি। ভারতীয়ত্ব আর হিন্দুত্বকে সেদিন তিনি অল্প- বিস্তর গুলিয়ে ফেলেছিলেন। পরে, অনেক পরে তপোবনের ঐতিহাসিক সত্যতার বিষয়ে তিনি নিজেই গভীর সন্দেহ প্রকাশ করেছেন । আপাতত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময়ের কথাই বলি।

- নিয়মাবলীতে বলা হলো, 'ছাত্রগণকে স্বদেশের প্রতি বিশেষরূপ ভক্তি শ্রদ্ধা করা চাই।' অনতিকাল পর দেখা গেল এই সময় রবীন্দ্রনাথের কাছে স্বদেশ আর হিন্দু ধর্ম এক হয়ে গিয়েছে। বিদ্যালয়ের জীবনচর্চায় প্রাচীন ভারত দেখতে দেখতে হিন্দু ভারত হয়ে উঠল। হিন্দু ধর্মের বর্ণাঢ্য ছটামণ্ডলের সম্মোহনক্রমে রবীন্দ্রনাথ একজন অতি নিষ্ঠাবান হিন্দু হয়ে উঠলেন এবং আশ্রম বিদ্যালয়ের সংহিতায় অনুশাসন, বর্ণাশ্রম নির্দিষ্ট ভেদাভেদ, ব্রাহ্মণ্য গরীমা সবই ঢুকে পড়ল। রবীন্দ্রনাথ ঘোষণা করলেন 'অব্রাহ্মণ শিক্ষক ব্রাহ্মণ ছাত্রের প্রণম্য নয়'।[১৪৩]

রবীন্দ্রনাথ যে একনিষ্ঠ হিন্দু ছিলেন, তিনি যে কখনো কোনো সেকুলার শক্তির মুখপত্র হিসেবে কাজ করতে পারেন নি, এমনকি কোনো সামাজিক প্রগতির সহায়ক যুক্তিবাদী কিংবা সামন্ততন্ত্র বিরোধী ভূমিকায় তাকে যুক্ত হতে দেখা যায় নি— এসব কথা অরবিন্দ পোদ্দার, শিবনারায়ণ রায়, নীরদচন্দ্র চৌধুরী, প্রভাতকুমার কিংবা প্রতাপ নারায়ণ বিশ্বাসের মতো প্রগতিবাদী চিন্তক ও লেখকরাও বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আমাদের দেশের একদল বুদ্ধিজীবীর কাছে রবীন্দ্রচর্চার চেয়ে রবীন্দ্র-রাজনীতি অনেক বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে এবং তারা যেনতেন প্রকারেণ রবীন্দ্রনাথকে 'হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি' এবং 'আমাদের সংস্কৃতির অপরিহার্য অংশ' হিসেবে বিবেচনা ও প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য উঠেপড়ে লেগেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে সার্বিক বিবেচনায় হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করেছেন; তার মন, মনন ও সংস্কৃতির ভূগোল জুড়ে উপনিষদের ধর্ম সাধনা পরিব্যপ্ত হয়ে ছিল— এসব কথা আজকাল অনেকেই বলছেন। রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাতকুমার লিখেছেন :

- বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতের তিনজন মনীষী ভারতের তিনটি সাধনাকে ভারতের তিনটি পীঠস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। মহাপুরুষ দয়ানন্দ সরস্বতী অমূর্ত দেবতার জন্য অহিংস যাগযজ্ঞাদির ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। আর্য সমাজের আদর্শ জীবন সফল করিবার জন্য (লালা মুন্সীরাম) স্বামী শ্রদ্ধানন্দ হরিদ্বারে গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিলেন।
- রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতের ঔপনিষদিক ব্রহ্মবাদ ও বর্ণাশ্রমকে ভারতীয় চিত্তের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন; উপনিষদের সাধনার মধ্যে সর্বসাধনার মিলন হইতে পারে। তজ্জন্য তিনি শান্তিনিকেতনে যে বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন তাহা তপোবন ও ব্রহ্মচর্যাশ্রম। ... স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মের ক্রিয়াকম সমান্বত নিখিল সাধন প্রণালীকে গ্রহণ করিয়া বেদান্তের ওপরই মতবাদের প্রতিষ্ঠা করিলেন। 'যত মত তত পথ' বাক্যটি যদি সত্য হয়, তবে হিন্দুধর্মের সকল কিছুকেই সত্য বলিয়া মানিতে হয়। এই সকল কিছুকে মানার নাম সিনথিসিস বা সমন্বয়। এই ধর্ম সমন্বয়ের

[১৪৩]. সত্যেন্দ্রনাথ রায়, রবীন্দ্র মননে হিন্দু ধর্ম, শারদীয় দেশ, ১৪০৫।

> কেন্দ্র হইল বেলুড়মঠ। ... বৈদিক, ঔপনিষদিক ও পৌরাণিক যুগের তিনটি ধারা স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ যথাক্রমে প্রচার ও ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। ইহারা সকলেই বর্ণাশ্রমের সমর্থক, কিন্তু জাতিভেদের বিরোধী । ... এই তিনটি আন্দোলনই হিন্দু ধর্মকেন্দ্রিক।[১৪৪]

এহেন সম্প্রদায় আচ্ছন্ন নিষ্ঠ 'হিন্দু' রবীন্দ্রনাথকে সেকুলার বাঙালি সংস্কৃতির প্রাণপুরুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবার এইসব বুদ্ধিজীবীদের চেষ্টা ও প্রয়াসকে আর যাই হোক, সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত বলা যায় না। এরা রবীন্দ্রনাথের বিশাল সৃষ্টি বিশেষত তার সঙ্গীতের জনগ্রহণযোগ্যতার সুযোগ নিয়ে তাকে ব্যবহার করছেন এবং বাঙালি সংস্কৃতির নামে বৈদিক ও হিন্দু সংস্কৃতির মূল্যবোধগুলো চাপিয়ে দিয়ে এদেশের মানুষকে শিকড় বিচ্ছিন্ন করে তুলতে চাচ্ছেন।

রবীন্দ্রনাথ তার দীর্ঘ জীবনে বাঙালিদের স্বাধিকারের চিন্তা নিয়ে কখনো ব্যতিব্যস্ত হয়েছেন এমন কথা শোনা যায় নি। উল্টো শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' উপন্যাসে ইংরেজ বিরোধিতা ও স্বাধীনতাকামীদের প্রতি প্রচ্ছন্ন অনুরাগ প্রকাশ পাওয়ায় তিনি তাকে তীব্র তিরস্কারে বিদ্ধ করেছিলেন— এসবতো আজ ইতিহাসের কথা। ইংরেজদের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব একটু নিরীক্ষা করা যাক।

১৮৯৩ সালে লেখা 'ইংরাজ ও ভারতবাসী' প্রবন্ধ থেকে শুরু করে ১৯০৮ সালের 'দেশহিত' প্রবন্ধের মূল সুরই ছিল ইংরেজদের সম্পর্কে ভারতবাসীর বিদ্বেষ প্রশমিত করার, ইংরেজদের হৃদয়ে ধর্মভাব জাগানোর, ভারতবাসীর সঙ্গে ইংরেজ রাজার হৃদয়ের সম্পর্ক গড়ে তোলার, ইংরেজ শাসকদের বিরক্ত না করে পল্লীমঙ্গল করার, ইংরেজদের নিয়ে মাতৃ-অভিষেকের ঘট ভরে তোলার। রবীন্দ্রনাথের ইংরেজ প্রীতি ও মোহমুগ্ধতার এরকম অসংখ্য উদাহরণ দেয়া যেতে পারে যা এখানে উল্লেখ করা বাহুল্য। শুধু এটুকু উল্লেখ করলেই তার ইংরেজ নিষ্ঠতার প্রকৃত স্বরূপ বোঝা যাবে বলে মনে করি। এই ইংরেজ নিষ্ঠতার তীব্রতায় রবীন্দ্রনাথ পঞ্চম জর্জের আগমন উপলক্ষে সেকালের ইংরেজ আমলাদের অনুরোধে যে রাজপ্রশস্তিমূলক গানটি লিখেছিলেন সেখানে তিনি ইংরেজকে রীতিমতো ভারতের ভাগ্যবিধাতা হিসেবে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ প্রভুরা কি শুধু ভারতেরই ভাগ্যবিধাতা ছিল না রবীন্দ্রনাথেরও ভাগ্যবিধাতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল সে কথা ভাবুকজনেরা ভাবতে পারেন। এ না হলে কলোনির একজন কবি হয়ে সাম্রাজ্যবাদের নীরব অনুমোদনে নোবেল পুরষ্কারের মতো আন্তর্জাতিক সম্মান ও খ্যাতি লাভের ব্যাপারটি মোটেই চাট্টিখানি ব্যাপার ছিল না। এ কি শুধু কবির সাহিত্য ও সৃষ্টি কর্মের স্বীকৃতি না তার ইংরেজ নিষ্ঠতারও যোগ্য পুরষ্কার— এ বিতর্ক বোধ হয় সহজে শেষ হবার নয়।

---

১৪৪. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র জীবনী। কলকাতা: বিশ্বভারতী।

রবীন্দ্রনাথ যেমন কখনো উপনিবেশিত ভারতে বাঙালিদের স্বাধিকারের প্রশ্ন তোলেন নি, তেমনি তিনি বাঙালিদের রাষ্ট্রভাষা হিসেবেও বাঙলার কথা কস্মিনকালেও ভাবেন নি। দেশভাগের পর কায়েদে আযম জিন্নাহ পাকিস্তানের Lingua Franca হিসেবে উর্দুর সুপারিশ করেছিলেন। রেসকোর্স ময়দানে দেয়া তার ভাষণে রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কিত একটি বক্তব্যের জন্য তিনি আজও বাঙালিদের কাছে আসামির কাঠগড়ায় রীতিমতো বিচারাধীন আসামির মতো দণ্ডের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন । বাঙালি মুসলমানদের জন্য তার অপরিসীম ও অপরিশোধযোগ্য অবদানের কথা বিবেচনায় না এনে তার শুধুমাত্র এই একটি কথার জন্য তাকে আমরা আমাদের ইতিহাস থেকেই তুলে দিয়েছি। সেই বিবেচনায় জিন্নাহর অপরাধতো রবীন্দ্রনাথের তুলনায় অনেক লঘু। তাহলে লঘু পাপের জন্য জিন্নাহর ভাগ্যে এই গুরু শাস্তির আয়োজন কেন? মনে রাখা দরকার, এই শাস্তির আয়োজকতো তারাই যারা আজ কপট রবীন্দ্রপ্রেমিকের বেশে, রবীন্দ্রনাথকে বাঙালি সংস্কৃতি ও জাতীয়তাবাদের অপরিহার্য পুরুষ হিসেবে বন্দিত করতে চাচ্ছেন । একি ইতিহাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা নয়? যে কবি কখনো বাঙালিদের স্বাধিকার-স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রচিন্তা নিয়ে আলোড়িত হন নি, যিনি বাঙালির রাষ্ট্রভাষা হিসেবে হিন্দির কথা বলেছেন, বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি মুসলমানের চিন্তা যাকে মূহুর্তকালও আচ্ছন্ন করে নি— তাকে হিন্দু-মুসলমানের যৌথ কালচারের প্রত্যয় পুরুষ হিসেবে মেনে নেয়া বেশ কঠিন ।

আসলে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে স্বল্পস্থায়ী কিছু মানবিক প্রবণতা কাজ করলেও সে ছিল তার পড়াশোনা থেকে পাওয়া এবং ইউরোপীয় প্রভাবদুষ্ট Bourgeois Liberalism-এর ফল। কিন্তু তার জীবিকার সাথে যুক্ত জমিদারী স্বার্থচিন্তা ও উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সম্প্রদায় আচ্ছন্ন হিন্দুত্বের বোধ তার এই স্বল্পস্থায়ী মানবিক বোধকে নির্জীব করে তুলেছিল। এ কারণেই হয়তো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পক্ষে কবি দাঁড়াতে পারেন নি। এ দেশের অনেক গবেষক ও বুদ্ধিজীবী দেখানোর চেষ্টা করেছেন কবি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেছিলেন এবং সেকালের হিন্দু এলিটদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধিতার মুখে তিনি টু শব্দটি করেন নি। সেদিনের হিন্দু এলিটরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করে গর্হিত অপরাধ করেছিলেন যা রবীন্দ্রনাথের কাছে মৌন সম্মতির প্রশ্রয় পেয়েছিল। কবির এই বিরোধিতাও কি তার মজ্জাগত মুসলমান বিদ্বেষ থেকেই পাওয়া, যা তিনি ঠাকুর পরিবারের অন্যান্য সদস্যের মতোই উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জন করেছিলেন?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় সেকালের হিন্দু এলিট ও বুদ্ধিজীবীরা একযোগে এর বিরোধিতা করেছেন, নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সরকারি উদ্যোগকে তারা কখনোই প্রীতির চোখে নেন নি। সেকালের হিন্দু নেতা ও বুদ্ধিজীবীরা এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করে সরকারের কাছে স্মারকলিপির পর স্মারকলিপি পেশ করেছেন এবং তাদের একটিই যুক্তি

ছিল— পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা যেহেতু অধিকাংশই অশিক্ষিত ও কৃষিজীবী, সুতরাং তাদের জন্য এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে কোনো ফল হবে না। সেদিনের এ ঘটনার বিবরণী ঐতিহাসিকরা যেভাবে দিয়েছেন তা উদ্ধৃত হলো :

- The controversy that started on the proposal for founding a university at Dacca, throws interesting light on the attitude of the Hindus and Muslims. About two hundred prominent Hindus of East Bengal, headed by Babu Ananda Chandra Roy, the leading pleader of Dacca, submitted a memorial to the Viceroy vehemently against the establishment of a university at Dacca. For a long time afterwards, they tauntingly termed this university as Mecca University.[১৪৫]
- ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব যে বিতর্কের সৃষ্টি করলো তাতে হিন্দু ও মুসলমানের ভূমিকা সম্পর্কে মজার তথ্য প্রকাশ পেল । পূর্ববাংলার প্রায় দুইশ গণ্যমান্য হিন্দু ঢাকার প্রখ্যাত উকিল বাবু আনন্দ চন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের তীব্র বিরোধিতা করে ভাইসরয়কে একটি স্মারকলিপি দিয়েছিল। পরে দীর্ঘদিন ধরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে 'মক্কা বিশ্ববিদ্যালয়' বলে বিদ্রুপ করা হতো ।

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারটি ঠিকভাবে নিতে পারেন নি। তিনি তাই লিখেছিলেন :

- আমার নিশ্চয় বিশ্বাস, নিজেদের স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন প্রভৃতি উদযোগ লইয়া মুসলমানেরা যে উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছে তাহার মধ্যে প্রতিযোগিতার ভাব যদি কিছু থাকে তবে সেটা স্থায়ী ও সত্য পদার্থ নহে। ইহার মধ্যে সত্য পদার্থ নিজেদের স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি । মুসলমান নিজের প্রকৃতিতেই মহৎ হইয়া উঠিবে এই ইচ্ছাই মুসলমানের সত্য ইচ্ছা ।
- এইরূপ বিচিত্র স্বাতন্ত্র্যকে প্রবল হইয়া উঠিতে দেখিলে আমাদের মনে প্রথমে একটা ভয় হয়। মনে হয় স্বাতন্ত্র্যের যে যে অংশে আজ বিরুদ্ধতা দেখিতেছি সেইগুলাই প্রশ্রয় পাইয়া অত্যন্ত বাড়িয়া যাইবে, এবং তাহা হইলে মানুষের মধ্যে পরস্পরের প্রতিকূলতা ভয়ংকর উগ্র হইয়া উঠিবে।[১৪৬]

---

[১৪৫]. A History of the Freedom Movement, Vol-IV, Pakistan Historical Society, Karachi.

[১৪৬]. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়, পরিচয়', রবীন্দ্র রচনাবলী, নবম খণ্ড, কলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৪১০।

মুসলমানের স্বাতন্ত্র্য চেতনা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের উদ্বেগের শেষ নেই। কারণ এটা নাকি ভয়ংকর বস্তু। ভয়ংকর এই অর্থে স্বাতন্ত্র্য চেতনা প্রখর হলে তার সম্প্রদায়ের অংশে ভাগ পড়তে পারে। তাই তিনি আগে ভাগেই মুসলমানদের বাগাড়ম্বর ও কথার ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করে সুদপদেশ দেন নিজের গুণে মহীমান্বিত হতে। ভাবটা এমন মহীমান্বিত হবো, কিন্তু ভাগ চাইব না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের এই নান্দনিক বাক্যজাল আমাদেরকে বিস্মিত করে বৈকি।

রবীন্দ্রনাথ নিজে কিন্তু তার স্বাতন্ত্র্য চেতনা বা ধর্মীয় চেতনার উপরে উঠতে পারেন নি, নিজের ভাগকেও ছাড়তে চান নি। কিন্তু উপদেশ দিতেও কসুর করেন নি। তার নিজের লেখা থেকেই ধার করছি :

> আমি হিন্দু সমাজে জন্মিয়াছি এবং ব্রাহ্ম সম্প্রদায়কে গ্রহণ করিয়াছি— ইচ্ছা করিলে আমি অন্য সম্প্রদায়ে যাইতে পারি কিন্তু অন্য সমাজে যাইব কি করিয়া? সে সমাজের ইতিহাস তো আমার নহে। গাছের ফল এক ঝাঁকা হইতে অন্য ঝাঁকায় যাইতে পারে, কিন্তু এক শাখা হইতে অন্য শাখায় ফলিব কী করিয়া?[১৪৭]

তাই আজ যারা ইতিহাসের এ প্রেক্ষাপটগুলো বিশ্লেষণ না করে রবীন্দ্রনাথকে বাঙলাভাষী মুসলমানদের সাংস্কৃতিক সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করতে চান আর কারণে-অকারণে তাকে 'মহান মানবতাবাদী, অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনার ধারক' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে বেসামাল হয়ে পড়েন, তারা যে মূলত বাঙালি সংস্কৃতির নামে মুসলিম বাংলার সাংস্কৃতিক সীমানাকে তাৎপর্যহীন করে তুলতে চান তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু এই চাপিয়ে দেয়া সংস্কৃতি মুসলমানরা মানতে যাবেন কেন?

---

[১৪৭]. ঠাকুর, 'আত্মপরিচয়, পরিচয়', রবীন্দ্র রচনাবলী, নবম খণ্ড, কলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৪১০।

রবীন্দ্রনাথ ও বাঙালি সংস্কৃতি

এক

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালি সংস্কৃতিকে হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির সাথে অভিন্ন করেই দেখা হতো। একালে বাঙালি সংস্কৃতি বলতে কেউ কেউ হিন্দু ও মুসলমানের যৌথ সংস্কৃতির দিকে ইংগিত করলেও উনবিংশ শতাব্দীতে এরকম করে কেউ তেমন একটা ভাবেন নি। রাজা রামমোহন থেকে শুরু করে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রমুখের লেখায় তা অজস্রভাবে ব্যক্ত হয়েছে। সেকালের হিন্দু বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যিকেরা হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতিকেই মূলত বাঙালি সংস্কৃতি হিসেবে জ্ঞান করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন উনিশ শতকী মানুষ। তাই তার মানসগঠন ও পরিপুষ্টিতে সময়ের হাওয়া যে লেগে থাকবে তাতে সন্দেহ নেই। বাঙলাভাষী হিসেবে বাঙালিত্বের চেতনা তাকে দু-একবার দ্বিধান্বিত করলেও মূলত হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতিকেই কখনো বাঙালি সংস্কৃতি আবার কখনো বা ভারত সংস্কৃতির সাথে যোগ করে দেখেছেন। একই কারণে বাঙলা ভাষার কবি হয়েও তার সৃষ্টিতে বাঙলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেয়ার কথা কখনো শোনা যায় নি, তেমনি বাঙলাভাষীদের নিয়ে একটি রাষ্ট্র পরিকল্পনার কথাও তার কাছ থেকে আমরা কখনো পাই নি।

যে কালে রবীন্দ্রনাথের মানসগঠন সম্পন্ন হয়েছিল সে ছিল ইংরেজ শোষণের যুগ। এ যুগে ইংরেজের উৎসাহ ও প্রেরণায় এবং হিন্দু মনীষীদের প্রচেষ্টায় হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির জয় উচ্চারণ করবার আত্মাভিমান প্রবল হয়ে উঠেছিল। একই সাথে হিন্দু সমাজকে রাষ্ট্রীয় জীবনের সমগ্রতায় প্রতিষ্ঠিত করবার আকাঙ্ক্ষাও হিন্দু মনীষীদের সেকালের প্রধান লক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেকালে এই ভারতবর্ষ কেবল হিন্দুদেরই দেশ নয়; এর উপর অন্যান্য জাতি সম্প্রদায়েরও একটি অধিকার থাকতে পারে এ কথা এই শিক্ষিত হিন্দু সমাজের মনে আদৌ উদয় হয় নি। এই সংকীর্ণ স্বাদেশিকতার প্রেরণা রবীন্দ্রনাথকে আলোড়িত করেছিল অবশ্যই। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তার রবীন্দ্র জীবনীতে লিখেছেন :

> রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় রাষ্ট্র ও ধর্ম সম্বন্ধে যে মত পোষণ করিতেন তাহার সহিত রবীন্দ্রনাথের দেশ বিষয়ক মতামতের মিল খুঁজিয়া পাওয়া যায়। ব্রহ্মবান্ধব হিন্দু ন্যাশনালিজম ও হিন্দু সমাজকে ভারতীয় সংস্কৃতিরূপে দেখিতে চাহিয়াছিলেন; তাহার কাছে হিন্দুত্ব শব্দের দ্বারা হিন্দু ন্যাশনালিটি ও হিন্দু কালচার উভয়ই সূচিত হইত। বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধ হইতেছে ব্রহ্মবান্ধবের 'হিন্দু জাতির একনিষ্ঠতা'।[১৪৮]

[১৪৮]. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র-জীবনী, কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৪২০।

অন্যত্র প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন:

- রবীন্দ্রনাথ ... ছিলেন আদি ব্রাহ্মসমাজের সংস্কার বিরোধী মনোভাবের উত্তরাধিকারী। সমসাময়িক সাহিত্যে ব্রহ্মবান্ধব, রামেন্দ্রসুন্দর, রবীন্দ্রনাথ যেসব প্রবন্ধ লিখিতেছিলেন ও নানা বক্তৃতায় ও উপদেশে বিবেকানন্দ যে মত প্রচার করিতেছিলেন তাহার মধ্যে কেবল হিন্দুত্বের জয় উচ্চারণ করিবার আত্মাভিমানই প্রবল ছিল না, হিন্দু সমাজকে রাষ্ট্রীয় জীবনের সুষ্ঠু সমগ্রতার মধ্যে দেখিবার প্রেরণাও ছিল প্রচুর। বলাবাহুল্য, হিন্দু জাতীয়তাবোধের উদ্বোধন ও প্রচারকদের প্রচেষ্টায় ইংরেজি শিক্ষিত সমাজ আত্মসম্মান ও আত্মশক্তি অর্জনে সক্ষম হইয়াছিল। কিন্তু তাহা সমাজের অসংখ্য মূঢ় মুখে ভাষাদান ও অন্তরে শক্তিদান করিতে পারে নাই । আজ অর্ধশতাব্দী পরে যখন সেই বর্ণাশ্রম আন্দোলনের ফলাফল সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করিতে বসি, তখন হিন্দু সমাজের যে বাস্তব দৃশ্য ফুটিয়া উঠে তাহাতে বর্ণাশ্রম ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার কোনই সম্ভাবনা খুঁজিয়া পাইনা, তপোবনও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এই ভাবুকের দল চাহিয়াছিলেন re-orientation of nationalism with Hindu bias re- orientation of Hinduism with national bias. জাতীয়তাবোধ ধর্মকে অথবা ধর্ম জাতীয়তাবোধকে আশ্রয় করিলে তাহার পরিণাম কি হইতে পারে তাহা অধুনাতন ভারত ইতিহাসে সুস্পষ্ট।[১৪৯]

লক্ষ করার মতো বিষয় হলো হিন্দু সমাজের এই জাতি বা রাষ্ট্র সম্পর্কিত ধারণা বলয়ের মধ্যে মুসলমানদের আদৌ কোনো স্থান নেই। সংগত কারণেই রবীন্দ্রনাথকে তাই আমরা বিভিন্ন সময় নিছক হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির ভাষ্যকার রূপেই দেখতে পাই । এখানে রবীন্দ্রনাথ হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতীক। এখানে রবীন্দ্রনাথ একজন নিষ্ঠাবান বেদানুসারী ব্রাহ্মণ। অধুনা বাঙালি সংস্কৃতি বলতে যে সেকুলার সংস্কৃতির কথা বলা হয়ে থাকে তার সাথে রবীন্দ্রনাথের এই ধর্মাশ্রিত সংস্কৃতির সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া বেশ কঠিন বৈকি ।

ব্যক্তিগত জীবনে ও আচরণে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বর্ণাশ্রম ভিত্তিক মনুসংহিতার হিন্দু সমাজের একাগ্র সমর্থক। বেদ ও উপনিষদে তার আনুগত্য ছিল অপরিসীম। উপরন্তু প্রাচীন ভারতের হিন্দুত্বের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করবার জন্য তিনি আজীবন সাধনা করে গেছেন। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির আধারে নিহিত হিন্দুর আদর্শবাদ তার মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল অবশ্যই। পরবর্তীকালে প্রাচীন ভারতের শিক্ষাদর্শের পুনরুজ্জীবন ঘটাতেই রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রাজনৈতিক বিশ্বাসের দিক দিয়েও রবীন্দ্রনাথের সেকুলার পরিচয় স্পষ্ট নয়। বিশ শতকের প্রথম দিকে ভারতের রাজনীতিতে যখন হিন্দু- মুসলমানের

[১৪৯]. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র-জীবনী, কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৪২০।

সমস্যা প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছিল তখন মুসলমানদের সম্পর্কে তার অনুদার দৃষ্টিভঙ্গি আমাদেরকে অবশ্যই ভাবায়। ভারতের মতো একটি বহু ভাষাভাষী ও বহু সংস্কৃতির দেশে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক সহাবস্থানও তার কতটুকু কাঙ্ক্ষিত ছিল তা পরিষ্কার করে বলা কঠিন। হিন্দু মেলার সংগঠনে রবীন্দ্রনাথ একসময় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিলেন। এই হিন্দুমেলা সে যুগের হিন্দুত্বের গণ্ডী প্রসারিত করতে চেয়েছিল, এর মধ্যে একটি সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার আভাসও স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। শুধু তাই নয়, হিন্দু মহাসভার মতো স্বীকৃত সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের সাথেও রবীন্দ্রনাথের সাহচর্য সুবিদিত। এমনকি বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের ধর্মান্তরিত করবার জন্য ঠাকুর পরিবার যে শুদ্ধি আন্দোলন শুরু করেছিলেন তাতেও রবীন্দ্রনাথের সম্মতি ছিল। মোটকথা রাজনীতিতে একসময় মুসলমানদের প্রতিটি দাবির বিরোধিতা করাই হয়ে উঠেছিল রবীন্দ্রনাথের প্রথম কাজ।

অনেকেই বলে থাকেন কালান্তরের যুগে এসে রবীন্দ্রনাথের এই পরিচয় অনেকটা ম্লান হয়ে এসেছিল। এখানে একটি জিনিস ভাববার বিষয় হচ্ছে রাজনীতিতে বাংলার মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হয়েই রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মুসলমানদের অধিকারের ব্যাপারটা নিয়ে একসময় অতিমাত্রায় সচেতন হয়ে ওঠেন। সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের ভিত্তিতে ব্রিটিশ সরকার যে নির্বাচনী ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিল তাতে বাংলায় মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ ছিল নিশ্চিত। কেবলমাত্র এহেন পরিস্থিতিতে বাংলার রাজনীতিতে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতার কথা রবীন্দ্রনাথ ভেবে থাকবেন।

কালান্তর রচনার আগে রবীন্দ্রনাথ বহুকাল পূর্ববঙ্গে জমিদারির দায়িত্ব নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন। তার অধিকাংশ প্রজাই ছিলেন মুসলমান। তার নিত্যদিনের জীবনযাপনের সঙ্গী হিসেবে একসময় এই হতদরিদ্র মুসলমান প্রজারা তার কাছাকাছি এসেছিলেন। এদের প্রতিদিনের জীবনকেও তিনি অত্যন্ত নিকট থেকেই দেখেছিলেন। কিন্তু এদের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য তিনি তেমন কিছুই করেন নি বা ভাবেন নি। এই রবীন্দ্র নিস্পৃহতা বা উদাসীনতা যাই বলি না কেন তা তার উনিশ শতকী সংকীর্ণতার বহিঃপ্রকাশ। কালান্তরের যুগে রবীন্দ্রনাথ যেটুকু পাল্টেছিলেন তা কতটুকু বিবেকী প্রয়োজনে আর কতটুকু জনগ্রহণযোগ্যতা বাড়াবার তাগিদে তা আজ অবশ্যই ভাবুকজনেরা ভেবে দেখতে পারেন।

দুই

উপরে বর্ণিত বাঙালি সংস্কৃতির অনুদার চেহারা রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিতেও ভালোমতো প্রত্যক্ষ করা যায়। এদেশের রবীন্দ্রপূজারীরা বলে থাকেন আধুনিক যে বাঙালি সংস্কৃতি, এর ভাষা সাহিত্য-সংগীত-নৃত্য-চারুকলা তার প্রায় পুরোটাই রবীন্দ্রনাথের হাতে তৈরি। একজন লেখকের ভাষ্য উদ্ধার করছি :

- বস্তুত বাঙালির সর্বোচ্চ মানবিক বিকাশের উপযোগী চিন্তার ও সংবেদনশীলতার খোরাক জোগাতে পারেন রবীন্দ্রনাথ। তাই ধর্ম নির্বিশেষে আমরা বাঙালির মুক্তির সঠিক পথ রচনা ও সে পথে তাকে পরিচালিত করার পাশাপাশি এ সময়ের বড় দায়িত্ব হবে রবীন্দ্রনাথই যে বাঙালির বিকল্পহীন জাতীয় নায়ক, সে ধারণাটি প্রতিষ্ঠা করা।[১৫০]

এই বিবৃতিতে আবেগ আছে কিন্তু যুক্তির ভার নেই বললেই চলে। যা আধুনিক বাঙালি সংস্কৃতি বলে চালানো হয় তার জন্ম ঊনবিংশ শতাব্দীর কলকাতাকেন্দ্রিক হিন্দু রেনেসাঁর জঠরে। রবীন্দ্রনাথ এই বর্ণবাদী রেনেসাঁর ফসল। এই রেনেসাঁ সকল বাংলা ভাষা-ভাষীর প্রাণকে স্পর্শ করে নি, কিংবা গণমানুষের জাগরণে ভূমিকা রাখে নি । এই রেনেসাঁ বর্ণবাদী হিন্দুদের সৃষ্টি এবং তাদের জীবনধারার মধ্যেই প্রবাহিত। রবীন্দ্রনাথ এই বর্ণবাদী হিন্দু সংস্কৃতির সংস্কার করেছিলেন সৃষ্টিশীলতা ও নান্দনিকতার তুলি দিয়ে মাত্র । কলকাতা কেন্দ্রিক এই বর্ণহিন্দুর সংস্কৃতি তাই কোনোভাবেই সেকুলার নয়। রবীন্দ্রনাথ সৃষ্ট যে সংস্কৃতির মডেলটি আমাদের সেকুলার ভাবুক ও বুদ্ধিজীবীরা হাজির করেন সেটিও কোনোভাবে সেকুলার নয়। রবীন্দ্রনাথের মতো একজন উপনিষদগত প্রাণ, ঈশ্বরে আপ্লুত মানুষকে সেকুলার মডেলে হাজির করার মধ্যে একটি রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক তাৎপর্য হয়তো গভীরভাবে আছে। কিন্তু এতে আমাদের সেকুলার পুরুষদের চিত্তবৃত্তির দৈন্যতাই প্রকাশ পায় মাত্র এবং সেকুলারিজম ব্যাপারটিও অনেকক্ষেত্রে অকিঞ্চিতকর ও অবাঞ্ছিত হয়ে ওঠে।

রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির ইংরেজি তরজমার ভূমিকায় ডব্লিউ বি ইয়েটস রবীন্দ্র সংস্কৃতিকে প্রাচীন হিন্দু ধর্মীয় ঐতিহ্যের ফসল বলে ইংগিত করেছিলেন যেখানে কবিতা ও ধর্ম এক। শুধু তাই নয়, এই ভূমিকায় তিনি রবীন্দ্র পরিবারের উপর ধর্মীয় ঐতিহ্যের প্রভাবের কথাও বলার চেষ্টা করেছেন যেখানে গায়ত্রী মন্ত্র, ধ্যান, প্রকৃতি ও ঈশ্বর একাকার হয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথের পূজার গানগুলো ব্রাহ্মসমাজের ধর্মীয় প্রার্থনায় গীত হতো, যাকে ইয়েটস চার্চের ডিভাইন সার্ভিসের (Divine Service) সাথে তুলনা করেছেন।[১৫১]

শিল্পী রোদেনস্টাইনের বাসায় রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে প্রথম যখন বৃটেনের সারস্বত সমাজের সামনে ইয়েটস তার গীতাঞ্জলি থেকে পড়ে শুনিয়েছিলেন তখন থমাস স্টারজ মুর (ইনি সুইডিস একাডেমির কাছে রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজের পক্ষে সুপারিশ করেছিলেন) বলেছিলেন রবীন্দ্রের শিল্পচর্চার বিষয় হচ্ছে ঈশ্বরপ্রেম। অন্যদিকে স্টারজ মুরের সাথে সুর মিলিয়ে ইয়েটসও বলেছিলেন :

---

[১৫০]. আবুল মোমেন, রবীন্দ্রনাথ, মুসলিম মানস ও বাংলাদেশের অভিযাত্রা। ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, ২০১১।

[১৫১]. W. B. Yeats, Introduction, Gitanjali : Song offerings, Sept. 1912 ।

- Ah, you see, he is absorbed in God.[১৫২]

রবীন্দ্রের এই ঈশ্বরপ্রেম নিশ্চয় মুসলমানের তৌহিদের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত আল্লাহ নয়, কিংবা খ্রিষ্টানদের Trinity-এর বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত God-ও নয়। এটি উপনিষদের ঈশ্বর, যাকে তিনি শিল্পের ভাষায় পূজা নিবেদন করেছেন। এজরা পাউন্ডও রবীন্দ্র সাহিত্যে প্রবহমান আধ্যাত্মিকতা ও ঈশ্বরপ্রেমের কথা জোরেশোরে বলেছেন :

- It brings a quiet proclamation of the fellowship between man and the God's; between man and the nature।[১৫৩]

যাই হোক, রবীন্দ্রনাথের কয়েক হাজার বছরের আর্য হিন্দু ধর্মীয় ঐতিহ্যের প্রতি অঙ্গীকার নিয়ে কোনো সংশয় থাকার কথা নয়। এ কথাটি তার বিদেশি অনুরাগীরাও খুব ভালো করে বুঝতেন। রুশ ভাষার বিখ্যাত কবি আনা আখমাতোভা, যিনি ১৯৬০-এর দশকে রবীন্দ্রনাথের কবিতা রুশ ভাষায় তরজমা করেছিলেন, তিনিও তার হিন্দু ধর্মীয় ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগের কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন :

- ...that mighty flow of poetry which takes its strength from Hinduism as from the Ganges and is called Rabindranath Tagore.[১৫৪]

আজীবন রবীন্দ্রনাথ তিন হাজার বছরের এই হিন্দু ধর্মীয় সভ্যতার মধ্যে বিহার করেছেন। এ কারণেই রবীন্দ্রনাথের মননে তপোবন, মহাভারত, কালিদাস বারবার ফিরে এসেছে। তিনিও ইতিহাসের ওপারে বারবার ফিরে গিয়েছেন। তিনি নিজেই লিখেছেন :

দূরে বহুদূরে
স্বপ্নলোকে উজ্জয়িণীপূরে
খুঁজিতে গেছিনু কবে শিপ্রা নদী পারে
মোর পূর্ব জনমের প্রথমা প্রিয়ারে।

—স্বপ্ন

যে কথাটা ইয়েটস, পাউন্ড, মুর, আখমাতোভারা সহজেই বুঝতে পেরেছেন; সে কথাটা আমাদের সেকুলার ভাবুকরা বুঝতে চান না কেন? কারণ এটা বুঝতে পারলে তো তাদের রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিল হবে না। রবীন্দ্রনাথকে সেকুলার বানিয়ে এদেশে ভারতীয় রাজনীতির স্বার্থ প্রতিষ্ঠা করা যত সহজ, তার ঔপনিষদিক ভাবাদর্শ দিয়ে এটা হাসিল করা অনেক কঠিন। এটা তারা ভালো করে জানেন বলেই রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে মিথ্যাচারে মেতে উঠেছেন।

---

[১৫২]. উদ্ধৃত: Nirad C. Choudhury, Autobiography of an Unknown Indian, Part-II. Mumbai : Jaco Publishing House, 2008।

[১৫৩]. উদ্ধৃত: অমলেশ ত্রিপাঠী, ইতালীর র‍্যনেশাঁস, বাঙালীর সংস্কৃতি। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, ২০০২।

[১৫৪]. উদ্ধৃত: Amartya Sen, Tagore and His India. Counter Currents. Org ।

রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষায় 'সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন এইটুকু ছাড়া তার ভিতর বাঙালিত্বের উপাদান বলে কিছু নেই। রবীন্দ্রনাথের যে বিশাল সাহিত্য তার মধ্যে আধুনিকতার কিছু উপাদান থাকলেও মূলে তা ভারতীয় আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতিরই শিল্পকৃতি। তার সাহিত্যের ভাবলোক ঐ ভারতীয় ঐতিহ্যের অন্তর্গত ও সংলগ্ন হয়ে বাঙালি সংস্কৃতির একটি বিশেষ রূপ নিয়েছে। যে রূপটি শেষ পর্যন্ত পুরোপুরি সর্বজনীন হতে পারে নি, চরিত্রের দিক দিয়ে কিছুটা বর্ণবাদী রয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথের এই ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রকৃতি বিচার করেছেন পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠী :

- তাছাড়া ভারতীয় শিল্পের ঐতিহ্যকে প্রাচীন অতীত (মধ্যযুগ বা তার পরবর্তী নয়), ধর্ম (মুখ্যত হিন্দু) এবং মরমী আধ্যাত্মবাদ (ঔপনিষদিক ব্রহ্মবাদ)-এর সঙ্গে জড়িয়ে দেখা হয়।[১৫৫]

রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকে তাহলে কীভাবে ব্যাখ্যা করা যায়? তার সৃষ্টির রস ও প্রকাশভঙ্গী বা ফর্মের মধ্যে এক ধরনের আধুনিকতা দৃশ্যমান হলেও এর এসেন্সটি ঔপনিষদিক এবং হিন্দু ধর্মীয় ভাবালুতায় পূর্ণ। আর্টের জগতে যে হিন্দুয়ানী ঢং বা ঘরানা রয়েছে রবীন্দ্রনাথ তার এক প্রকার পূর্ণতা দিয়েছিলেন বলা চলে। রবীন্দ্রসৃষ্ট বাঙালি সংস্কৃতির মডেলটি সম্বন্ধেও একই কথা খাটে। ওটি কখনো হিন্দুয়ানী বৃত্তকে অতিক্রম করতে পারে নি। পারে নি বলেই তা আপামর বাংলাভাষীর কাছে গৃহীত হয় নি। যেটুকু হয়েছে সেটি তার আধুনিক ফর্মের কারণে, এসেন্স-এর কারণে নয়।

তিন

বলা হয়ে থাকে বর্তমান পাঠ বিমুখ সমাজে রবীন্দ্রনাথ নাকি তার গানের মাধ্যমেই বাংলাভাষীদের জীবনে টিকে আছেন। হয়তো কথাটি সত্য। রবীন্দ্রনাথ যে বাঙালি সংস্কৃতির জগত গড়ে তুলেছেন তার মধ্যে গানই প্রধান ও মুখ্য। রবীন্দ্রনাথ নিজেও তার অন্যান্য সৃষ্টির দীর্ঘজীবিতা নিয়ে সংশয়ে থাকলেও গানের ব্যাপারে বেশ আশাবাদী ছিলেন। তার অন্যতম প্রিয় শিষ্যা মৈত্রেয়ী দেবীকে বলেছিলেন— আমায় ভুলতে পার, কিন্তু আমার গান ভুলবে কি করে।[১৫৬]

রবীন্দ্র সংগীতকে আমাদের সেকুলার ভাবুকরা মনে করেন আধুনিক বাঙালি সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ পরিচায়ক।[১৫৭] এই সংগীতের পরিচয় উপরে কিছুটা দিয়েছি, বাকিটা নিচে দিই।

---

১৫৫. অমলেশ ত্রিপাঠী, ইতালীর র‍্যনেশাঁস, বাঙালীর সংস্কৃতি।

১৫৬. মৈত্রেয়ী দেবী, রবীন্দ্রনাথ গৃহে ও বিশ্বে। কলকাতা : প্রাইমা পাবলিকেশন্স

১৫৭. কামালউদ্দিন হোসেন, রবীন্দ্রনাথ ও মোঘল সংস্কৃতি। ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯৮।

রবীন্দ্রনাথ দু-হাজারের মতো গান লিখেছেন। এগুলো গীতবিতানে সংকলিত হয়েছে। এসব গানের মধ্যে পূজা, স্বদেশ, প্রেম, প্রকৃতি পর্যায়ের গান রয়েছে। আর তিনি লিখেছেন গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যের জন্য গান। এর মধ্যে তার পূজা, প্রার্থনা বা ঈশ্বরপ্রেমের গানগুলো সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। তিনি যেমন সরাসরি ঈশ্বরকে নিবেদন করেন, তেমনি কখনো কখনো তার নারীপ্রেম, স্বদেশপ্রেম, প্রকৃতিপ্রেম আর ঈশ্বরপ্রেম একাকার হয়ে যায়। প্রেম, প্রকৃতি ও স্বদেশের ভিতর দিয়েও তিনি ঈশ্বরকে অবলোকন করেন। এটা উপনিষদীয় প্যানথিজম- এর প্রভাব। রবীন্দ্রনাথের প্রায় সব গানের অন্তঃস্থলে এই নীরব আধ্যাত্মিকতা স্রোতস্বিনীর মতো প্রবহমান। প্রেম, প্রকৃতি, ঈশ্বর এই তিনকে রবীন্দ্রনাথ সুরের মধ্যে একাকার করে দিয়েছেন। এর প্রেরণা তিনি পেয়েছিলেন অমলেশ ত্রিপাঠীর মতে, 'উপনিষদ, কালিদাস ও বৈষ্ণব কবিদের কাছে।'[১৫৮]

উপনিষদের দীক্ষা তো তিনি পিতা দেবেন্দ্রনাথের কাছ থেকেই ভালোমতো পেয়েছিলেন। উপনিষদের অদ্বৈতবাদই তার ধর্ম, তিনি যে ব্রাহ্মধর্মের অনুসারী ছিলেন তা-ও ছিল উপনিষদ দিয়ে গড়া। বুদ্ধদেব বসু একটি গুরুত্বপূর্ণ খবর দিয়েছেন আমাদের :

- অন্নদাশংকর লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বর বিশ্বাস করেন কিনা এই প্রশ্ন করে কোনো জবাব পাননি। জবাব পাওয়া যায় তিনি যখন কথা প্রসঙ্গে উপনিষদের কোন শ্লোক আবৃত্তি করেন। তখন তাঁর সমস্ত শরীর স্থির হয়ে যায়, চোখ বুজে আসে, মুখে ফোটে এমন একটা জ্যোতি যার দিকে তাকাতে ভয় করে।[১৫৯]

তার গানের আরেক প্রেরণা প্রাচীন ভারতীয় কবি কালিদাস । মিলন, বিরহ, প্রেম সম্বন্ধে তার ধারণা, প্রকৃতি সম্বন্ধে তার সূক্ষ্ম সৃজনশীলতা কালিদাসের দ্বারা প্রভাবিত। কালিদাসের মেঘদূত, বিশেষ করে যক্ষের কামনা ও বিরহ যন্ত্রণার বাহ্য প্রকাশ রবীন্দ্র মননকে বিভিন্ন সময় আচ্ছন্ন করেছে।

রবীন্দ্র সংগীতের যে মিস্টিক চেতনা তার মধ্যে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাবও স্পষ্ট। বৈষ্ণব ধর্মমত কীর্তন গানের ভিতর দিয়ে অনেকখানি প্রকাশ পেয়েছে । কীর্তন গান আমাদের দেশে হিন্দু ধর্মীয় গান হিসেবেই পরিচিত। রাধা-কৃষ্ণের লীলা এই গানে মিস্টিক ভাবনার প্রতীক হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্র সংগীতে এই ভাবনার বিস্ফোরণ দেখা যায়। গীতাঞ্জলি এই ভাবনার উচ্চতম প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথ যখন লেখেন, 'আমি তোমার প্রেমে হব সবার কলঙ্কভাগী/ আমি সকল দাগে হব দাগী, কলঙ্কভাগী' তখন তাকে একজন আধুনিক বৈষ্ণব পদকর্তা কিংবা কীর্তন গানের রচয়িতা বলেই মনে হয়। অমিতাভ চৌধুরী জানিয়েছেন চৈতন্য চরিতামৃত ছিল

---

১৫৮. অমলেশ ত্রিপাঠী, ইতালীর র‍্যনেশাঁস, বাঙালীর সংস্কৃতি।

১৫৯. বুদ্ধদেব বসু, সব পেয়েছির দেশে। কলকাতা : বিকল্প,১৯৯৮

রবীন্দ্রের প্রিয় গ্রন্থ।[১৬০]সত্য বলতে কী রবীন্দ্রনাথ কীর্তন গানকে নতুনত্ব দিয়েছেন। সুকুমার সেন লিখেছেন :

> রবীন্দ্রনাথ কীর্তন গানকে নূতন ও অভূতপূর্ব প্রাণ-ঐশ্বর্যে মণ্ডিত করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের গানে কীর্তন সুরের সৃষ্টি-ঐশ্বর্য ভারতীয় সংগীত পদ্ধতির ইতিহাসে নূতন পাতা খুলিয়াছে। তাঁহার কীর্তন গানের নির্মাণেও তিনি অভিনবত্ব দেখাইয়াছেন, পদের সঙ্গে আখরের মিলন ঘটাইয়া।[১৬১]

রবীন্দ্রনাথের সংগীত জীবনে বাউল গানেরও একটা প্রভাব আছে। রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে বসবাসকালে বাউল গান দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তার উপর বাউল প্রভাবের জন্য তাকে 'রবি বাউল' বলা হতো।[১৬২]

রবীন্দ্রনাথের লেখা বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতে আছে বাউল গানের প্রভাব। বাউল গান মূলত বাংলাদেশের লোকজ পল্লী গান। এর শিকড় প্রাক-মুসলিম আমলের বাংলা; যেখানে বৌদ্ধদের সহজিয়া গানের বিকাশ। এই গান পরবর্তীকালে বৈষ্ণব ধর্ম ও সুফি মতবাদ দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হয়ে বাউল গানে রূপ পেয়েছে। গবেষক আহমদ শরীফের মত এটাই।[১৬৩]

রবীন্দ্রনাথের গানে পাশ্চাত্যের একটা প্রভাবও পড়েছিল। ব্রাহ্মরা গান গেয়ে তাদের মন্দিরে উপাসনা করতেন। তারা এই পদ্ধতিটি নেন খ্রিষ্টীয় চার্চের গানের মাধ্যমে উপাসনার পদ্ধতি থেকে। এ প্রসঙ্গে এবনে গোলাম সামাদ লিখেছেন :

> রবীন্দ্রনাথ ১৮৮৪ সাল থেকে বহুদিন আদি ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক হিসেবে নিযুক্ত থাকেন। এই সংশ্লিষ্টতার ফলেই তিনি অজস্র ব্রাহ্ম সংগীত রচনা করেন। রচনা করেন খ্রিষ্টীয় গীর্জায় গীত সংগীতের অনুকরণে; যা ব্রাহ্ম সমাজের প্রার্থনাতে পালন করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা । অনেক রবীন্দ্র সংগীতের মধ্যেই ধ্বনিত হয়েছে খ্রিষ্টান গির্জা সংগীতেরই ভাবধারা।[১৬৪]

তবে মোটের উপর রবীন্দ্র সংগীতের ভূবন হিন্দু-ধর্মীয় ঐতিহ্যের ক্যানভাসেই বড় বেশি প্রতিফলিত হয়েছে। কবি নজরুলের মতো হিন্দু-মুসলিম উভয় ধর্মের ঐতিহ্য নিয়ে তিনি তেমন কোনো সংগীত রচনা করেন নি। সেক্ষেত্রে রবীন্দ্র সংগীতকে পুরোপুরি সেকুলার বলা চলে না।

---

১৬০. অমিতাভ চৌধুরী, ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ: অন্যান্য প্রসঙ্গ। কলিকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ, বাংলা ১৪০৫।

১৬১. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড। কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৩

১৬২. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র জীবনী, তৃতীয় খণ্ড ।

১৬৩. আহমদ শরীফ, বিচিত চিন্তা। ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ২০১১

১৬৪. এবনে গোলাম সামাদ, রাজা রামমোহন রায় ও বাংলার সংস্কৃতি, অন্য দিগন্ত, জুলাই ২০১৫।

উপমহাদেশে হিন্দুস্তানী সংগীতের একটা জোয়ার আছে। এটি এদেশে মুসলিম সংস্কৃতির প্রভাবে তৈরি, তা রবীন্দ্রনাথ ভালোমতো জানতেন। কিন্তু সংগীতের ক্ষেত্রে এই ঐতিহ্য তাকে টানে নি। কীর্তন তাকে টানলেও গজল তার মনকে নাড়াতে পারে নি।

চার

রবীন্দ্রনাথ শান্তি নিকেতনে বসে যে বাঙালি সংস্কৃতির মডেলটি তৈরি করেন তার মধ্যে নাটক, প্রহসন, অভিনয় ও নাচের অংশ আছে। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে পারিবারিক পরিবেশে তিনি নাটক দেখেছেন ও অভিনয়ও করেছেন। বিলাতে যেয়ে তিনি অপেরা দেখেছিলেন। শোনা যায় মেয়েদের বক্ষলগ্না হয়ে পার্টিতে নাচতেনও।[১৬৫] এসব তার মনে রেখাপাত করেছিল ও পরবর্তীতে তার সৃষ্টির পটভূমি হিসেবে ভূমিকা রেখেছে। রবীন্দ্রনাথ নিজে একাধিক নাটক, নৃত্যনাট্য লিখেছেন — চিত্রাঙ্গদা, চণ্ডালিকা, শ্যামা, শাপমোচন, বাল্মিকী প্রতিভা, চিরকুমার সভা, তাসের দেশ, নটীর পূজা ফাল্গুণী ইত্যাদি। তিনি লিখেছেন ঋতু ভিত্তিক উৎসবের নাটক শারদোৎসব, প্রভৃতি। এসব নাটকের সাথে কোথাও কোথাও গান ও নাচ যুক্ত করে বৈচিত্র বাড়িয়েছেন। এসব নাটকের বড় অংশই হিন্দু পৌরাণিক কাহিনীকে ভিত্তি করে তিনি লিখেছেন। বলা চলে পৌরাণিক কাহিনীকে তিনি আধুনিক কালের ভাব-ভাষা-ভঙ্গি ও নাচের ভিতর দিয়ে নতুন করে প্রকাশ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ শান্তি নিকেতনে বসে যে নাচের ধারা চালু করেছিলেন তা ঠিক বাদশাহ ও নওয়াবদের মাইফেল নয়। রবীন্দ্রনাথ ১৯১৯ সালে সিলেট সফরে এসে এখানকার মনিপুরী উপজাতিদের রাস নৃত্য দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। রাস নৃত্য মনিপুরীদের রাস উৎসবের অংশ। সেই নৃত্য তিনি শান্তি নিকেতনে নিয়ে আসেন এবং নিজের গানের সঙ্গে মিলিয়ে নেন। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ মনিপুরী নৃত্যের সাথে পরবর্তীকালে কথাকলি, ভরতনাট্যম, ক্যান্ডি, গুজরাটি, বাউল নৃত্যের সিনথেসিস করেন। এমনকি ইন্দোনেশিয়ার বালি ও জাভার নৃত্যকেও নিয়ে আসেন। শান্তিদেব ঘোষকে রবীন্দ্রনাথ এই সিনথেসিসের দায়িত্ব দিয়েছিলেন এবং বিভিন্ন স্থানে এর উপকরণ সংগ্রহের জন্য পাঠিয়েছিলেন। মনে রাখা দরকার, এসব নৃত্য বিভিন্ন ধর্মীয় স্থান ও উৎসবের সাথে যুক্ত ছিল। দেবদাসীদের নাচ থেকে ভরতনাট্যমের বিকাশ এর বড় উদাহরণ। মূলত ভারতের বিভিন্ন স্থানের নাচকে সিনথেসিস করে তিনি শান্তি নিকেতনী ধারার প্রবর্তন করেন এবং সেটিকেই বাঙালি সংস্কৃতির আকারে উপস্থাপন করেন। এটাই হচ্ছে রবীন্দ্র রচিত নৃত্যনাট্য ও তার উদ্যোগে প্রবর্তিত নাচের নেপথ্য ইতিহাস।

এই নাচিয়ে ও নাট্যদল নিয়ে তিনি বিভিন্ন জায়গায় পরিভ্রমণে বের হতেন এবং এদের দিয়ে প্রদর্শনী করে বিভিন্ন প্রভাবশালী ব্যক্তিদের নিকট থেকে শান্তি নিকেতনের জন্য চাঁদা

[১৬৫]. অমিতাভ চৌধুরী, ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ: অন্যান্য প্রসঙ্গ।

তুলতেন। শান্তি নিকেতনে প্রচলিত এই নৃত্যধারাই এখন তথাকথিত বাঙালি সমাজের নৃত্য স্পৃহাকে জাগিয়ে তোলে। বিশেষ করে আমাদের দেশের সেকুলার ভাবুক ও সংস্কৃতি কর্মীদের এই নৃত্যধারা নিয়ে আদিখ্যেতা রীতিমতো করুণা জাগায়। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে রাবীন্দ্রিক নাটক ও নৃত্য মঞ্চসফল হতে পারে নি। কারণ, দর্শকদের কাছাকাছি পৌঁছানোর জন্য যে ভাষা দরকার, যে সাংস্কৃতিক আত্মীয়তা ও যোগ দরকার তা এখানে অনেকটা অনুপস্থিত।

পাঁচ

রবীন্দ্রনাথ শান্তি নিকেতনে বসে বাঙালি সংস্কৃতির মডেল হিসেবে কতকগুলো উৎসব চালু করেছিলেন। এর প্রেরণা তিনি পিতা দেবেন্দ্রনাথের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের নেতা । ব্রাহ্মরা হিন্দু ধর্মকে সংস্কার করে ব্রাহ্মধর্ম চালু করেন এবং এর প্রবর্তক ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজ ভিত্তিক মানুষদের বিনোদনের জন্য কতকগুলো ঋতু ভিত্তিক উৎসব চালু করেন। যেমন— মাঘোৎসব, পৌষ উৎসব, নববর্ষ, ভাদ্রোৎসব প্রভৃতি। ঋতু ভিত্তিক উৎসব হলেও মূলত এগুলো ছিল ব্রাহ্মদের ধর্মীয় উৎসব। দেবেন্দ্রনাথ এসব উৎসবে প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্যের সাথে নতুন চেতনার সংমিশ্রণ করেছিলেন মাত্র । একজন লেখক লিখেছেন :

> প্রকৃতই উত্তরাধিকারী রূপে দু'টি বস্তু তিনি পেয়েছিলেন পিতা দেবেন্দ্রনাথের কাছ থেকে। তা হল প্রাচীন প্রথার সংস্কার ও রক্ষণ এবং বেদ ও উপনিষদের প্রতি তীব্র আকর্ষণ ।[১৬৬]

রবীন্দ্রনাথ তার জীবনস্মৃতিতেও দেবেন্দ্রনাথের বেদ উপনিষদের প্রতি আসক্তির কথা লিখেছেন। একটির স্মৃতিচারণ :

> একবার পিতা আসিলেন আমাদের তিনজনের [রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সোমেন্দ্রনাথ, ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় এবং রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং উপনয়ন দিবার জন্য। বেদান্তবাগীশকে লইয়া তিনি বৈদিক মন্ত্র হইতে উপনয়নের অনুষ্ঠান নিজে সংকলন করিয়া লইলেন। ... যথাসম্ভব প্রাচীন বৈদিক পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া আমাদের উপনয়ন হইল।[১৬৭]

আরেক জায়গায় লিখেছেন, হিমালয় ভ্রমণকালে দেবেন্দ্রনাথ পুত্র রবিকে একেবারে 'পাশে লইয়া দাঁড়াইয়া উপনিষদের মন্ত্রপাঠ দ্বারা আর একবার উপাসনা করতেন।[১৬৮]

---

[১৬৬]. সুকুমার মল্লিক, রবীন্দ্রনাথ ও শান্তি নিকেতন শ্রীনিকেতনের উৎসব। কলকাতা: সুবর্ণরেখা, ২০০৮।

[১৬৭]. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জীবনস্মৃতি

[১৬৮]. প্রাগুক্ত।

সুতরাং দেবেন্দ্রনাথ প্রবর্তিত উৎসব, পারিবারিক অনুষ্ঠানের পরিবেশ এবং বেদ-উপনিষদের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের চিত্তে জীবনের উষালগ্ন থেকেই সুগভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাত মুখোপাধ্যায় মনে করেন :

- রবীন্দ্রনাথের ধর্ম ও শান্তিনিকেতন উপদেশমালা পাঠে জানা যায় যে সংস্কৃত মন্ত্র ও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি তাঁহার অনুরাগ যেমন অকৃত্রিম তেমনি গভীর। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং একসময় পর্যন্ত উপনয়নাদি হিন্দু সংস্কারে বিশ্বাসবান ছিলেন, ... প্রাচীন মন্ত্রের প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা জীবনের শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ন ছিল।[১৬৯]

প্রাচীন ভারতের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক উৎসবাদি ঋতুকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতো। এই উৎসব দেবেন্দ্রনাথ ফিরিয়ে আনেন ব্রাহ্মসমাজের উৎসব হিসেবে। পুত্র রবীন্দ্রনাথ শান্তি নিকেতনে এই উৎসবকে প্রকাণ্ড করে তোলেন। শুধু তাই নয়, রবীন্দ্রনাথ নতুন নতুন উৎসবও চালু করেন।

রবীন্দ্রনাথ বর্ষাকে সামনে রেখে চালু করেন বর্ষামঙ্গল। বর্ষামঙ্গল শব্দটি তিনি ব্যবহার করেন কালিদাসের মেঘদূত কাব্যে বর্ণিত বর্ষা উৎসবের ইংগিত থেকে। ১৯১৩-১৪ সাল থেকে রবীন্দ্রনাথ শান্তি নিকেতনে ঋতু উৎসব চালু করেন। প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা থেকে জানা যায়, কবি ১৯০৮ সালে শান্তি নিকেতন থেকে শিলাইদহে যাত্রার প্রাক্কালে বললেন-

- প্রাচীন সাহিত্যে ঋতুর বর্ণনা নেই? ঋতু-উৎসবের কী রূপ পাওয়া যায়? তাঁকে সেই ঋগ্বেদ-যজুর্বেদ থেকে শ্লোক শোনানো হল, তিনি অত্যন্ত মুগ্ধ হলেন। বললেন— অতি সুন্দর জিনিস। বর্ষার গান তো আমার অনেক আছে, আশ্রমে ঋতু উৎসব হোক না।[১৭০]

তখন এই উৎসব আয়োজনের দায়িত্ব বর্তায় ক্ষিতিমোহন সেন ও বিধুশেখর শাস্ত্রীর উপর। সেন ও শাস্ত্রী মহোদয় ঋগ্বেদ-যজুর্বেদ থেকে বর্ষা ঋতুর নানা শ্লোক ও স্তোত্র উদ্ধার করে ছাত্রদের দ্বারা অভ্যাস করিয়ে উৎসবে পরিবেশনের ব্যবস্থা করলেন। উৎসব ক্ষেত্রে বরুণ দেবতার জন্য যে বেদীটি নির্মিত হয়েছিল তা-ও বৈদিক পদ্ধতিতে হয়েছিল। প্রাচীন হিন্দু ধর্মীয় রীতির অনুসরণে বর্ষা উৎসবের দিনটি পালিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে জরুরি কাজে ব্যস্ত ছিলেন। উৎসবে থাকতে পারেন নি। তবে তার পরিকল্পনায় পুরো ব্যাপারটি ঘটেছিল। অনুষ্ঠানের বিবরণে দেখি :

- রবীন্দ্রনাথ আবার বাল্মীকির 'বর্ষাবন্দনা, অস্থাদ ...' শ্লোকে সুর দিয়ে গিয়েছিলেন। সে গান হল; যজুর্বেদ, বাল্মীকি, কালিদাস, রবীন্দ্রনাথ থেকে পাঠ আর আবৃত্তি হল; রবীন্দ্রনাথের বর্ষার গান হল; অজিত চক্রবর্তী ইংরাজি থেকে বর্ষা-বর্ণনা ও কিছু

---

[১৬৯]. রবীন্দ্র জীবনী: ১ম খণ্ড, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

[১৭০]. সুধীরচন্দ্র কর ও সাধনা কর, শান্তি নিকেতন প্রসঙ্গ।

পড়লেন। ঘরোয়া ছোট- খাটো উৎসব; কিন্তু চমৎকার লাগল সবার। বাইরের কেউ জানে না, সেই ১৩০৮ সালে আধুনিক ভারতে এই আশ্রমে প্রথম প্রাচীন ভারতের ঋতু উৎসবের আনন্দ পরিবেশিত হল।[১৭১]

বর্ষামঙ্গলের মতো শারদোৎসবকেও কবি প্রাচীন ভারতবর্ষ থেকে তুলে এনে আধুনিক জীবনে প্রবেশ করাতে চেয়েছিলেন। বর্ষা উৎসবের সাফল্যে প্রাণিত হয়ে কবি শারদোৎসব চালু করেন। একজন লেখক লিখেছেন :

- বর্ষা উৎসবের মত শারদোৎসবেও বৈদিক রীতি অক্ষুণ্ণ ছিল । যজুর্বেদ থেকে শরতের রূপ বর্ণনা বিষয়ক কয়েকটি শ্লোক সংগ্রহ করেছিলেন বিধুশেখর শাস্ত্রী। ক্ষিতিমোহন সেন পৌরাণিক রীতি অবলম্বন করে প্রকাশ করেছিলেন অনুরূপ রূপসজ্জা। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ 'নান্দী' রচনা করেছিলেন কবিতা ও গানে। 'তুমি নব নব রূপে এস প্রাণে' সঙ্গীত গীত হয়েছিল। এর সঙ্গে ছিল কবির নাটক। এমনই জমাট অনুষ্ঠান শারদোৎসব। অনুষ্ঠানের পরেও তার রেশটুকু যেন থেকে যেত। মাটিতে শিশির সিক্ত ঝরা শিউলি আর আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া সাদা মেঘের অচিন দেশে ভেসে যাওয়া, শান্তি নিকেতনকে যেন পৌঁছে দিত এক ছুটি ছুটির কল্পরাজ্যে।[১৭২]

এর পরে প্রাচীন ভারতের হোলি বা দোল যাত্রার অনুকরণে রবীন্দ্রনাথ চালু করেন বসন্তোৎসব। হোলি বা বসন্তোৎসব প্রাচীন হিন্দু সমাজের শস্যোৎসবের স্মারক। কালক্রমে ভারতবর্ষে এই উৎসব রাধা-কৃষ্ণের অনুষঙ্গে জড়িত হয়ে যৌন উদ্দামতায় রূপান্তরিত হয়; যার মধ্যে নানা রকম অশ্লীল আচার প্রচলিত ছিল। রবীন্দ্রনাথ এটি কিছুটা সংস্কার করে শান্তি নিকেতনে চালু করেন। বসন্ত উৎসবের পটভূমিতে রবীন্দ্রনাথ লেখেন রাজা নাটকটি। এই নাটকে কবি বসন্তের রূপকে তুলে ধরেছেন—

আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে।
তব অবগুণ্ঠিত কুণ্ঠিত জীবনে কোরোনা বিড়ম্বিত তারে
আজি খুলিয়ো হৃদয় দল খুলিয়ো,
আজি ভুলিয়ো আপন পর ভুলিয়ো।

শান্তি নিকেতন আশ্রমে বসন্তোৎসবের আয়োজন একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনায় উঠে এসেছে:

- বসন্তের দিনে আশ্রমবাসীদের বসনে-ভূষণে লাগে বাসন্তী রঙ। গুরুদেব বর্তমান থাকতে আমবাগানে গিয়ে সবাই জড়ো হত। সেখানে ছাত্রীগণ গুরুদেবের চারপাশে পুষ্পপত্রের অর্ঘ্য এনে সাজিয়ে রাখত। গানে-গানে হত বসন্তের উদ্বোধন; কবি

[১৭১]. প্রাগুক্ত

[১৭২]. সুকুমার মল্লিক, রবীন্দ্রনাথ ও শান্তি নিকেতন শ্রীনিকেতনের উৎসব।

কণ্ঠের কবিতা পাঠে এবং সংস্কৃত শ্লোকের আবৃত্তিতে উৎসবটি বাস্তবে রূপ পেত।[১৭৩]

শান্তি নিকেতনের আরেকটি উৎসবের নাম হচ্ছে পৌষোৎসব (৭ পৌষ)। এটি দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণের দিন। এদিন আবার শান্তি নিকেতনে ব্রহ্ম মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হয়। একজন লেখক লিখেছেন : 'শান্তি নিকেতন আশ্রম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব থেকেই ৭ই পৌষ-এর উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। উৎসবের দিনটি উপাসনা সঙ্গীত, শাস্ত্র পাঠ, ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা প্রভৃতি এবং শঙ্খ ও ঘন্টাধ্বনির মধ্যে এক পবিত্র পূজার ভাব ধারণ করে।[১৭৪] পরে এটিকে কেন্দ্র করে পৌষ মেলা চালু হয়।

আগেই বলেছি, ব্রাহ্মধর্মের বিশিষ্ট কয়েকটি উৎসব উদযাপনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাংলা নববর্ষ দিবস পালনেরও প্রবর্তক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তবে, আদি ব্রাহ্মসমাজের উদ্যোগে এর অনুষ্ঠান হয়ে থাকলেও শেষাবধি সেই সমাজের মতো এই বিশেষ অনুষ্ঠান ধারাও নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে কবি তার শান্তি নিকেতনে এ উৎসবকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন যথোচিত শ্রদ্ধায় ও আয়োজনে।[১৭৫]

নববর্ষ শুরু করার আগের দিন শান্তি নিকেতনে বর্ষশেষ উদযাপন হয় চৈত্র মাসের শেষ সন্ধ্যায়। মন্দির সুসজ্জিত হয় আলোকমালায়। অনুষ্ঠানে থাকে উপাসনা, মন্ত্রপাঠ। তারপরে প্রার্থনা আর কবির লেখা থেকে পাঠ ও গান। আশ্রমের ছাত্র- ছাত্রীরা, শিক্ষক ও কর্মীদের সঙ্গে আশ্রমিকগণও আবেগ ও শ্রদ্ধায় এই বর্ষশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন। বর্ষশেষ উৎসবকে কবি বছরের সালতামামি সমীক্ষা ও পর্যালোচনার দিবস এবং নববর্ষ দিবসকে শত সংকল্প গ্রহণের দিবস রূপেই ব্যাখ্যা করেছেন এবং সেই ব্যাখ্যা আমরা গ্রহণ করেছি ।[১৭৬]

এছাড়া রবীন্দ্রনাথ শান্তি নিকেতনে চালু করেছিলেন প্রাচীন ভারতের অনুকরণে নবান্ন, হলকর্ষণ ও বৃক্ষরোপণ উৎসব। তিনি আরো চালু করেন মনীষীদের স্মরণে খ্রিষ্টোৎসব, রামমোহন উৎসব, মহর্ষি স্মরণ ও গান্ধী পূণ্যাহ । কিন্তু রবীন্দ্রনাথ হযরত মোহাম্মদ (স.)-কে স্মরণ করে ফাতেহা-ই-ইয়াজদহম শান্তি নিকেতনে চালু করেন নি। রবীন্দ্রনাথ শান্তি নিকেতনে যে ঋতু ভিত্তিক সাংস্কৃতিক উৎসবগুলো চালু করেছিলেন তার পটভূমি হিন্দু ধর্মীয় আধারেই তৈরি। উপরের বর্ণনা পাঠককে সেটা বুঝতে সহায়তা করবে অবশ্যই ।

বস্তুত রবীন্দ্রনাথ শান্তি নিকেতনকে ঘিরে প্রাচীন ভারতীয় হিন্দু ভাবাদর্শকে সাংস্কৃতিকভাবে একপ্রকার জাগিয়ে তুলেছিলেন। সেদিক দিয়ে বিচার করলে বলতে হবে

---

১৭৩. সুধীরচন্দ্র কর ও সাধনা কর, শান্তি নিকেতন প্রসঙ্গ ।

১৭৪. সুকুমার মল্লিক, রবীন্দ্রনাথ ও শান্তি নিকেতন শ্রীনিকেতনের উৎসব।

১৭৫. সুধীরচন্দ্র কর, শান্তি নিকেতনের শিক্ষা ও সাধনা।

১৭৬. সুকুমার মল্লিক, রবীন্দ্রনাথ ও শান্তি নিকেতন শ্রীনিকেতনের উৎসব ।

শান্তি নিকেতন ছিল রবীন্দ্রনাথের হাতে গড়া একটি হিন্দু সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। আমাদের এখানকার সেকুলার পুরুষরা শান্তি নিকেতন থেকে এই সব ধর্মীয় উৎসবকে বাঙালি সংস্কৃতির আড়ালে নিয়ে এসেছেন এবং জোরেশোরে প্রচার করছেন এটাই নাকি চিরায়ত বাঙালির সংস্কৃতি। আদতে এটি হচ্ছে বাঙালি হিন্দুর সংস্কৃতি। রবীন্দ্রনাথকে যেহেতু কলকাতা কেন্দ্রিক বাঙালি সংস্কৃতির পুরোহিত হিসেবে গণ্য করা হয় তাই তার সংগীত, নাটক, নৃত্য ও উৎসবাদিকেও বাঙালি সংস্কৃতি নামক জাতীয় ধর্মের আনুষ্ঠানিক রূপ বা ফর্ম হিসেবে মর্যাদা দেয়া হয়েছে। বাঙালি সংস্কৃতির আড়ালে ব্রাহ্মণ্যবাদ ও তার এদেশীয় বরকন্দাজরা এই বিশেষ শ্রেণির সংস্কৃতিকে বাঙালি মুসলমানের উপর চাপিয়ে দিতে চান যাতে তাদের ঐতিহাসিক আত্মপরিচয় লুপ্ত হয়ে পড়ে এবং সেই ছিদ্র দিয়ে আধিপত্যবাদী শক্তির ক্ষমতা পাকাপাকি প্রতিষ্ঠিত হয়।

ছয়

বাংলাদেশের একজন প্রগতিশীল লেখক লিখেছেন :

> রাষ্ট্রভাষা বাংলা হলেও আমাদের সর্বোচ্চ শিক্ষিত কটা মানুষের সাহিত্যিক উত্তরাধিকারের বোধ (যদি থেকে থাকে) বাংলা সাহিত্যের পরিসরে তৈরি হয়েছে? শতাধিক মুসলিম কবি সুলতানি আমলে বৈষ্ণব পদ রচনা করেছেন ও গেয়েছেন, কিন্তু মুসলিম লীগ-উত্তর বাঙালি মুসলমান কি কীর্তন গান শোনেন বা শুনে কখনো কি ভাবেন— এ তাঁরই ঐতিহ্যের অংশ। উচ্চতর বাংলা সাহিত্য পড়তে গিয়ে চর্যাপদ যাঁরা পড়েন, তারা একে পাঠ্যক্রমের একটি অংশ হিসেবেই পড়তে বাধ্য হন, কিন্তু নিজেরই উত্তরাধিকার হিসেবে বাড়তি কৌতূহল ও অভিনিবেশে উদ্বুদ্ধ হন কি? রবীন্দ্রনাথও সংশয় ও প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছেন, এখনো হচ্ছেন।[১৭৭]

এই লেখকের হাহাকারের উত্তরে বলতে হয়— বাঙালি মুসলমানকে যদি কীর্তন শুনতে হয় তাহলে বাঙালি হিন্দু কি হামদ-নাত শুনতে প্রস্তুত আছেন? তাহলেই না প্রকৃত অর্থে সমন্বয়বাদী বাঙালি সংস্কৃতির বিকাশ ঘটবে। এদেশে বাঙালি জাতীয়তাবাদের সারথিরা যতই অবিভাজ্য বাঙালি সংস্কৃতির কথা বলেন কিংবা বাংলাভাষীদের মধ্যে বাঙালি হিন্দু ও বাঙালি মুসলমানের পৃথক জাতিসত্তাকে নিন্দা জানান; বাস্তব সত্য হলো— দেশভাগ মুসলিম প্রধান ও হিন্দু প্রধান বাংলা তৈরি করে তাকেই স্বীকৃতি দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের গান তো এই ভাগকে ঠেকাতে পারে নি। যদি কোনো সাংস্কৃতিক তফাৎ না-ই থাকে তবে ইতিহাস এইভাবে কেন পথ করে নিয়েছে? দুই জার্মানি তো একত্রিত হয়ে গেছে। দুই বাংলা এক হওয়ার এরকম সম্ভাবনা আছে কি? এদেশে যারা অবিভাজ্য বাঙালি সংস্কৃতির পক্ষে ওকালতি করেন এবং

[১৭৭]. আবুল মোমেন, রবীন্দ্রনাথ মুসলিম মানস ও বাংলাদেশের অভিযাত্রা।

রবীন্দ্রনাথকে সেই সংস্কৃতির আইকন হিসেবে হাজির করেন তারা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বাঙালি মুসলমানের ধর্ম ইসলামের বিপরীতে এক ভাষিক ও সাংস্কৃতিক বয়ান হাজির করতে গিয়ে ঔপনিবেশিক কলকাতা কেন্দ্রিক উচ্চবর্ণের বাঙালি পরিচয়কে চূড়ান্ত সত্য হিসেবে গ্রহণ করেন। ফলে ইসলামকে বাঙালির দুশমন গণ্য করা বাঙালি সংস্কৃতি ও জাতীয়তাবাদের কাছে একান্তই স্বাভাবিক বলে বিবেচিত হয়। বাঙালি জাতীয়তাবাদের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিচয়ও সেইভাবে নির্ধারিত হয়। এইভাবে বাঙালি জাতীয়তাবাদ এদেশে ইসলাম ও মুসলমানদের বিপরীতে নিজেকে দাঁড় করায়।

এই কারণেই বাঙালি জাতীয়তাবাদীরা বাঙালি মুসলমানের ঐতিহাসিক আত্মপরিচয়, লড়াই ও সংগ্রামকে অস্বীকার করে। ঔপনিবেশিক ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বাঙালি মুসলমানের দীর্ঘ সংগ্রাম, ১৮৫৭ সালের আজাদি আন্দোলন, ফকির বিদ্রোহ, তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা বানিয়ে লড়াই, ফরায়েজি আন্দোলন, নওয়াব আবদুল লতিফ, সৈয়দ আমির আলী, নওয়াব সলিমুল্লাহ, শেরে বাংলা ফজলুল হক প্রমুখের উজ্জ্বল ভূমিকাসহ বাঙালি মুসলমানের রক্তাক্ত ইতিহাস মুছে ফেলে দিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদী বয়ানের নির্মাণ শুরু হয়। এই বয়ান পলাশীর প্রান্তরে নওয়াব সিরাজের পরাজয়কে রেনেসাঁর উত্থান হিসেবে দেখে। বাঙালি মুসলমানকে পায়ের নিচে ফেলে শোষণ করে ইংরেজ ও তার সহযোগী হিন্দু জমিদার, সামন্তগোষ্ঠী ও তার সহযোগীরা কলোনিয়াল কলকাতায় যে বর্ণবাদী বাঙালি সংস্কৃতি নির্মাণ করেছিল তা-ই হচ্ছে একালের বাঙালি জাতীয়তাবাদের মাপকাঠি বাঙালি জাতীয়তাবাদ তার সাম্প্রদায়িক বয়ানের কারণেই বাংলাভাষীদের মধ্যে কোনো জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলতে পারে নি। তাই বাঙালি জাতীয়তাবাদের যে বয়ান আমরা শুনি তার রাজনৈতিক লক্ষ হচ্ছে ইসলাম ও বাঙালি মুসলমানের নিজস্ব ইতিহাস, সংস্কৃতি ও রাজনীতির বিরোধিতা, কলকাতা কেন্দ্রিক বর্ণবাদী হিন্দু সংস্কৃতির নির্বিচার পূজা ও গোলামী এবং ভারতীয় আধিপত্য ও আগ্রাসনের পক্ষে যুক্তিহীন সাফাই গাওয়ার প্রতিযোগিতা।

বলাবাহুল্য, বাঙালি মুসলমান এটা কখনোই মেনে নেয় নি। আজ বাংলাদেশের যে রক্তাক্ত বিভাজন তা সহিংস রাজনীতি ও ফ্যাসিবাদী বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রতিক্রিয়ার পরিণাম মাত্র। রবীন্দ্রনাথের ট্রাজেডি হচ্ছে আমাদের দেশের এই ফ্যাসিবাদী বাঙালি জাতীয়তাবাদী রাজনীতির গলবস্ত্র হিসেবে তিনি ঝুলে আছেন।

রবীন্দ্র রাজনীতি

এক

রবীন্দ্রনাথ একবার লিখেছিলেন— কবিরে পাবে না তাহার জীবনচরিতে। মনে হয় সব কবির ক্ষেত্রেই কমবেশি এ কথাটা খাটে। তবে রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে কথাটা যত বেশি প্রযোজ্য, অন্য কবিদের ক্ষেত্রে অতটা সত্য নয়। সাহিত্যের বিচার প্রধানত রসের বিচার হলেও সাহিত্য স্রষ্টার ব্যক্তিগত অনুভূতি, বিশ্বাস ও জীবনবোধ এগুলোও বিচারের আওতায় চলে আসে। কেন না এগুলো সাহিত্য স্রষ্টার সৃষ্টিকে কতকটা প্রভাবিত করে বৈকি। আমরা রবীন্দ্রনাথ বলতে শুধু গল্পগুচ্ছ, তার পূজো ও প্রেম পর্যায়ের গান কিংবা বলাকার অসাধারণ সব কবিতাকেই বুঝি না— তার রাজনীতি, দর্শন, ধর্মবিশ্বাস ও মূল্যবোধকেও বোঝার চেষ্টা করে থাকি।

২০১১ সালে ভারত ও বাংলাদেশের যৌথ রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে কবি রবীন্দ্রনাথের সার্ধশতজন্মবার্ষিকী উদযাপিত হয়েছে। ঢাকা ও দিল্লিতে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় জমকালো অনুষ্ঠান হয়েছে। এরকম দু-একটি অনুষ্ঠান থেকে বলা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের আদর্শের আলোয় বাংলাদেশের ভবিষ্যত পথ নির্মিত হবে। যদিও রবীন্দ্রনাথের জন্ম ও সৃষ্টির শহর কলকাতায় এই উৎসাহ এতো প্রবলভাবে আমরা দেখতে পাই নি। রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক আদর্শ কিংবা আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারের সঙ্গে বাংলাদেশের মানুষের মনোধারার সম্পর্ক কিরকম তা নিয়ে একটু আলোচনা করা যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ হিন্দু মেলায় অংশগ্রহণ করেছিলেন, শিবাজী উৎসব কবিতা লিখেছিলেন, বন্দে মাতরম গানে সুর দিয়েছিলেন। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় তার উদ্যোগে অরন্ধন, নগ্নপদে পথ পরিক্রমার পর গঙ্গাস্নান, রাখিবন্ধন প্রভৃতি হিন্দু ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান চালু হয়— এগুলো বহুবার আলোচিত হয়েছে। এই রাজনীতিকে মোটা দাগে বলা চলে হিন্দু জাতীয়তাবাদী রাজনীতি। আমাদের সেকুলার ভাবুকরা মুসলিম ইতিহাসের সাথে সম্পর্কিত কোনো কিছুকে বিচার-বিশ্লেষণ ছাড়াই দ্রুততার সাথে সাম্প্রদায়িক হিসেবে প্রত্যয়নপত্র দিয়ে দিলেও কবির এই রাজনীতি সম্পর্কে তারা অবশ্য এক আশ্চর্য নিরবতা রক্ষা করেন। কিছু বলতে চান না।

রবীন্দ্রনাথের সাথে ছোটোখাটো ব্যাপারে মহাত্মা গান্ধীর মতান্তর হলেও শেষ পর্যন্ত তিনি গান্ধীবাদী রাজনীতিতেই আস্থা রাখতেন। গান্ধীকে তিনি রীতিমতো দেবতা, তপস্বী বা অবতারের আসনে স্থাপন করেছিলেন। ভারতের বিশাল নিরন্ন জনগোষ্ঠীর জীবনে গান্ধীর আবির্ভাবকে তিনি পরম ত্রাণকর্তা হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি এক জায়গায় লিখেছেন:

> বহুদিন ধরে আমাদের পোলিটিকাল নেতারা ইংরেজি-পড়া দলের বাইরে ফিরে তাকাননি, কেননা তাঁদের দেশ ছিল ইংরেজি-ইতিহাস পড়া একটি পুঁথিগত দেশ।

সে দেশ ইংরেজি ভাষার বাষ্পরচিত একটা মরীচিকা, তাতে বার্ক গ্লাডস্টোন ম্যাটসীনি গারিবালডির অস্পষ্ট মূর্তি ভেসে বেড়াত। তার মধ্যে প্রকৃত আত্মত্যাগ বা দেশের মানুষের প্রতি যথার্থ দরদ দেখা যায়নি। এমন সময় মহাত্মা গান্ধী এসে দাঁড়ালেন ভারতের বহুকোটি গরীবের দ্বারে— তাদেরই আপন বেশে, এবং তাদের সঙ্গে কথা কইলেন তাদের আপন ভাষায়, এ একটা সত্যকার জিনিস, এর মধ্যে পুঁথির কোনো নজির নেই। এই জন্যেই তাঁকে যে মহাত্মা নাম দেওয়া হয়েছে এ তাঁর সত্য নাম কেননা, ভারতের এত মানুষকে আপনার আত্মীয় করে আর কে দেখেছে। আত্মার মধ্যে যে শক্তির ভাণ্ডার আছে তা খুলে যায় সত্যের স্পর্শ মাত্রে। সত্যকার প্রেম ভারতবাসীর বহুদিনের রুদ্ধ দ্বারে যে মুহূর্তে এসে দাঁড়াল অমনি তা খুলে গেল। কারও মনে আর কার্পণ্য রইল না, অর্থাৎ সত্যের স্পর্শে সত্য জেগে উঠল। সত্যের যে কী শক্তি, মহাত্মার কল্যাণে আজ তা আমরা প্রত্যক্ষ দেখেছি।[১৭৮]

ভারতের দরিদ্রদের দ্বারে গান্ধী যথার্থ দরদ নিয়ে হাজির হয়েছিলেন একথা রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন। শুধু তাই নয় রবীন্দ্রনাথের গান্ধী বন্দনা রীতিমতো বীরপূজায় পরিণত হয়েছে। অন্যত্র তিনি গান্ধী সম্পর্কে লিখেছেন :

- জয় হোক সেই তপস্বীর যিনি এই মুহূর্তে বসে আছেন মৃত্যুকে সামনে নিয়ে, ভগবানকে অন্তরে বসিয়ে, সমস্ত হৃদয়ের প্রেমকে উজ্জ্বল করে জ্বালিয়ে। তোমরা জয়ধ্বনি করো তাঁর, তোমাদের কণ্ঠস্বর পৌঁছক তাঁর আসনের কাছে। বলো, 'তোমাকে গ্রহণ করলেম, তোমার সত্যকে স্বীকার করলেম।[১৭৯]

রবীন্দ্রনাথের সাথে মহাত্মা গান্ধীর একটা চমৎকার সম্পর্ক ছিল । এটা রাজনৈতিক সম্পর্কের অতিরিক্ত আদর্শিক সম্পর্কের দিকেও গড়িয়েছিল। দুজনেই প্রাচীন ভারতীয় হিন্দু আদর্শাবলীর প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন। গান্ধী মনে করতেন আধুনিক কালে রবীন্দ্রনাথ হচ্ছেন ঔপনিষদিক সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠতম প্রতিভূ ।

মহাত্মা গান্ধীর একান্ত সচিব পিয়ারীলাল তার বইতে একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন, যেখানে দেখা যায় বাংলাকে অখণ্ড রাখার শেষ চেষ্টা হিসেবে যুক্ত বাংলার শেষ প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী যখন মহাত্মা গান্ধীর সামনে তার প্রস্তাব তুলে ধরেন তখন তিনি উত্তর দেন :

---

[১৭৮].রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সত্যের আহ্বান, কালান্তর', রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, সুলভ সংস্করণ। কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৪১০।

[১৭৯].রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'মহাত্মাজির পূন্যব্রত, মহাত্মাগান্ধী', রবীন্দ্র রচনাবলী, চতুর্দশ খণ্ড, সুলভ সংস্করণ। কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৪১০।

- খসড়াটিতে প্রতিশ্রুতিমূলক এমন কিছু নেই যাতে শুধুমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠতার দ্বারা কিছু করা যাবে না। সরকারের শাসনকার্য পরিচালনা এবং আইন প্রণয়নের প্রত্যেকটি কাজের পেছনে থাকতে হবে অন্তত পক্ষে হিন্দু সংখ্যালঘিষ্ঠের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সহযোগিতা। এই স্বীকৃতিও তাতে থাকা উচিত যে, বাংলার রয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিধৃত এক অভিন্ন সংস্কৃতি, যার মূল নিহিত আছে উপনিষদসমূহের দর্শনে।[১৮০]

এটা থেকেই বুঝা যায় গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের আদর্শিক নৈকট্য। আধুনিককালে এই আদর্শিক বন্ধনটা উপমহাদেশের প্রেক্ষিতে হিন্দু নেতা ও সমাজপতিরা যতটুকু প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন, মুসলমান নেতারা সেখানে দুঃখজনকভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। এই আদর্শিক বন্ধনের কারণেই রবীন্দ্রনাথ গান্ধীর প্রেরণায় হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা করতে উদ্যোগী হন এবং ভাষার রাজনীতিতে জড়িয়ে বাঙালি সংস্কৃতির আধার হিসেবে পরিচিত শান্তি নিকেতনে হিন্দি ভবন প্রতিষ্ঠা করেন। এ প্রসঙ্গে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন :

- বাংলায় হিন্দী সাহিত্য-সম্পদ সরবরাহের কাজে আধুনিক যুগে ক্ষিতিমোহন পথিকৃৎ। ক্ষিতিমোহন মধ্যযুগীয় সন্তদের সম্বন্ধে অসংখ্য প্রবন্ধ ও 'দাদু' নামে বিরাট গ্রন্থ বাংলায় লিখিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ 'দাদু'র ভূমিকায় লিখিয়াছেন, 'ক্ষিতিবাবুর কল্যাণে ক্রমে হিন্দুস্থানের আরও কোনো কোনো সাধক কবির সঙ্গে আমার কিছু কিছু পরিচয় হলো। এমন ব্যবস্থা হওয়া চাই যাতে ভারতবর্ষের যারা হিন্দী ভাষা জানেনা তারাও যেন এই চিরকালের সাহিত্যে আপন উত্তরাধিকার গৌরব ভোগ করিতে পারে।' ... কবির দাদু প্রবন্ধ লিখিবার তেরো বছর পর শান্তি নিকেতনে হিন্দী ভাষা ও সাহিত্য আলোচনার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইল।[১৮১]

উল্লেখ্য, মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীরা চাঁদা দিয়ে শান্তি নিকেতনের এই হিন্দি ভবন নির্মাণ করে দেন। হিন্দি ভবনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জওয়াহেরলাল নেহরু উপস্থিত হন। এই শান্তি নিকেতনকে কেন্দ্র করেই রবীন্দ্রনাথ হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে তুমুল প্রচারণা চালান। কবির এ কাজে সহযোগিতা করেন ক্ষিতিমোহন সেন ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতো বাঙালি পণ্ডিতরা। হিন্দির ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ প্রভূত উৎসাহ দেখালেও বাংলা ভাষায় প্রচলিত আরবি, ফারসি শব্দের ব্যাপারে তিনি মোটেই আগ্রহ দেখান নি। উনিশশ' ত্রিশের দশকে যখন মুসলমানরা স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে তাদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিত্বের দাবি শুরু করেছে, মুসলমানের লেখা সিলেবাসে স্থান দেয়ার কথা বলছে, বর্ণহিন্দুদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত

---

[১৮০]. Pyrelal, Mahatma Gandhi The Last Phase. Vol III. Ahmedabad: Navajiban Publishing House, 1958.

[১৮১]. রবীন্দ্র জীবনী ও রবীন্দ্র সাহিত্য প্রবেশক, প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়। কলকাতা: বিশ্বভারতী।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক মাধ্যমিক শিক্ষার নিয়ন্ত্রণ মুক্তির চেষ্টা করছে, তখন রবীন্দ্রনাথ কিন্তু খুব চটে যান। এ প্রসঙ্গে রাহমান চৌধুরী লিখেছেন :

> ফজলুল হকের মাধ্যমিক শিক্ষা প্রস্তাবকে আরো অনেকের মতো রবীন্দ্রনাথ মনে করেছিলেন শিক্ষার পবিত্র মন্দিরে সাম্প্রদায়িকতার অনুপ্রবেশ। তিনি তাঁর বাণীতে মুসলমানদের হাত থেকে বাংলা ভাষাকে রক্ষার প্রশ্ন তুলেছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন— পাঠ্যপুস্তক রচনার ভার মুসলমানদের হাতে পড়লে বাংলা ভাষা বিনষ্ট হবে।[১৮২]

একই আদর্শিক বন্ধনের কারণে যখন দেশে অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলন একসাথে চলেছিল তখন রবীন্দ্রনাথ গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনকে মনেপ্রাণে সমর্থন করেন কিন্তু খেলাফত আন্দোলনকে বরদাশত করতে পারেন নি। কারণ, 'কবি দিব্য চক্ষে দেখিলেন, খিলাফত সমর্থনের প্রতিক্রিয়ায় ভারতে সাম্প্রদায়িক বিষবৃক্ষ রোপিত হইল।[১৮৩] খেলাফতকে বিষবৃক্ষ মনে হলেও হিন্দু মহাসভাকে কবির বিষবৃক্ষ মনে হয় নি। মাঝে মাঝে রবীন্দ্রনাথের মুসলিম সমাজকেও কি একটা আস্ত বিষবৃক্ষ মনে হয় নি? ইংরেজদের কাছে ন্যায্য দাবি-দাওয়া নিয়ে যখন কলকাতার মুসলমানরা রাস্তায় নামলেন তখন তার এটা পছন্দ হয় নি। তিনি অত্যন্ত কটু ভাষায় এর নিন্দা জানান :

> কিছুদিন হইল একদল ইতর শ্রেণীর অবিবেচক মুসলমান কলিকাতার রাজপথে লোষ্ট্রখণ্ড হস্তে উপদ্রবের চেষ্টা করিয়াছিল। তাহার মধ্যে বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, লক্ষ্যটা বিশেষরূপে ইংরেজের প্রতি। তাহাদের যথেষ্ট শাস্তিও হইয়াছিল। কেহ বলিল মুসলমানের বস্তিগুলো একেবারে উড়াইয়া পুড়াইয়া দেওয়া যাক।[১৮৪]

ব্যক্তিগতভাবে গান্ধীর প্রতি রবীন্দ্রের শ্রদ্ধা থাকতেই পারে। মুশকিল হচ্ছে এই শ্রদ্ধা তো রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে কাজে লাগতে পারে না। গান্ধীর রাজনীতিকে কখনো বলা যাবে না সেকুলার। নানা ধর্ম ও সংস্কৃতির দেশ ভারতের জন্য তিনি যে রাম রাজত্বের সুপারিশ করেছিলেন তা কার্যত সাম্প্রদায়িকতার পালে হাওয়া দিয়েছিল মাত্র। রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তার মধ্যে গান্ধীর চিন্তা-ভাবনার ছাপ সুস্পষ্টভাবে পড়েছিল। তাহলে আমাদের এখানকার আধুনিক পুরুষরা রবীন্দ্র স্তব করেন কোন আশায়?

বঙ্গভঙ্গের পর রবীন্দ্রনাথ কালান্তরের বিখ্যাত লেখাগুলো লিখেছিলেন। সেই লেখাগুলোতে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার উপর তিনি গভীর আলোকপাত করেছিলেন। সেখানে

---

১৮২. রাহমান চৌধুরী, বাংলায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যপুস্তকে হিন্দু-মুসলিম প্রসঙ্গ এবং দেশভাগ। নতুন গতি (কলকাতা), ঈদসংখ্যা, ২০১৫।

১৮৩. রবীন্দ্র জীবনী ও রবীন্দ্র সাহিত্য প্রবেশক, প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়। কলকাতা: বিশ্বভারতী, ৪র্থ খণ্ড।

১৮৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'কণ্ঠরোধ, রাজা প্রজা', রবীন্দ্র রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড। কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৪১০।

তার মুক্তদৃষ্টি ও মানবিক মনের একটা পরিচয় পাওয়া যায়। অথচ কয়েক দশক পর এই রবীন্দ্রনাথ জীবন সায়াহ্নে এসে পিছিয়ে পড়া মুসলমানদের উন্নতিকল্পে তাদের সুযোগ-সুবিধা দেয়ার ব্যাপারে ভয়ানক রকমের আপত্তি জানান। রবীন্দ্রনাথের জীবনে এরকম বৈপরীত্য প্রচুর। জয়া চ্যাটার্জি তার Bengal Divided বইয়ে লিখেছেন :

> শীলের মতো দার্শনিক, প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মতো বৈজ্ঞানিক, ডা. ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের মতো সাহিত্যিক, ব্রজেন্দ্রনাথ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির মতো নেতাদের স্বাক্ষর করা এক স্মারকে বাংলার ছোটলাটের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দাবি করা হয় যে, যদিও সংখ্যাগতভাবে লঘিষ্ঠ, সংস্কৃতিগতভাবে বাংলার হিন্দুরা অনেক শ্রেষ্ঠ, তারা বাংলার সাক্ষর লোকদের শতকরা ৬৪ ভাগ। অতএব সংখ্যালঘিষ্ঠ হলেও শাসন করার অধিকার একমাত্র তাদেরই।[১৮৫]

রবীন্দ্রনাথ গণতন্ত্রে বিশ্বাস করতেন না। অন্ততপক্ষে বাংলার মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সংখ্যাগরিষ্ঠতার বিচারে তারাই বাংলায় শাসন ক্ষমতায় যাওয়ার ন্যায়ত যোগ্য— এ কথাটি তিনি মানতে পারতেন না। তাই তিনি সমাজে সম্পদ, শিক্ষা, মানমর্যাদা অনুযায়ী হিন্দুদের জন্য অধিকতর প্রতিনিধিত্বের পক্ষে অদ্ভূত যুক্তি দেখিয়েছিলেন। সেসব কথার পরিপ্রেক্ষিতে সেকালে বাঙালি মুসলমানদের পত্রিকা মাসিক মোহাম্মদী মন্তব্য করেছিল :

> মুসলমানেরা সাম্প্রদায়িক, স্বার্থান্বেষী, কলহপ্রিয়, জাতীয়তা-বোধহীন, একথা প্রমাণ করিবার জন্য আমাদের প্রতিবেশী হিন্দু নেতা ও সাংবাদিকেরা বহুদিন হইতে সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করিয়াছেন। তৎসত্ত্বেও আমাদের ধারণা ছিল, তাঁহাদের মধ্যে নিশ্চয়ই এমন দুই একজন লোক আছেন যাঁহারা প্রতিবেশীর দোষান্বেষণের উর্দ্ধে। কিন্তু সম্প্রতি কবি রবীন্দ্রনাথকেও ঐ দলে যোগ দিতে দেখিয়া মনে হইল : "Et tu. Brutas!" (অবশেষে তুমিও এ-দলে, ব্রুটাস) বলিবার বিশেষ ভঙ্গিতে তিনি টাউন হলে বাঁটোয়ারা-বিরোধী বক্তৃতায় বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাঁহার বলিবার কিছুই নাই। কিন্তু বক্তৃতার সর্ব্বত্র মুসলিম-বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা ও পরনিন্দা বিশেষভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তিনি বলিতেছেন ; "শাসন কার্য্যে পরিচালনার যোগ্যতার অপহ্নব করিয়াও গভর্নমেন্ট যে সরকারী চাকুরীতে কর্ম্মচারী নিয়োগে ক্রমাগত বৈষম্য করিয়া চলিয়াছেন, আমরা তাহা নির্ব্বাকভাবে প্রত্যক্ষ করিতেছি।" রবীন্দ্রনাথের এ কথা আমরা কিন্তু "নির্ব্বাকভাবে" মানিয়া লইতে পারিলাম না। কারণ আমরা গত কয়েক বৎসর যাবৎ প্রত্যক্ষ করিয়া আসিতেছি যে, কবির স্ব সমাজের লোকেরা কখনও এ- সকল ব্যাপারে নির্ব্বাক ছিলেন না। মুসলমানদের প্রতি কটাক্ষ করিয়া কবি বলিতেছেন : "প্রভুর খানার

[১৮৫]. জয়া চ্যাটার্জী, বাঙলা ভাগ হল, অনুবাদ আবু জাফর। ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০৩।

> কেবল তাহাই নহে, টেবিলের নীচে নিক্ষিপ্ত খাদ্যটুকরার জন্য যে কোলাহল উত্থিত হইয়াছে, ইহা সমর্থন করায় শুধু যে নীচতা আছে তাহা নয়, উহা চারিত্রিক দৌর্ব্বল্যেরও পরিচায়ক। "একথা রবিবাবুর মুখে নূতন হইলেও হিন্দু সমাজ অনেকদিন হইতেই মুখে আনিতেন না। রবীন্দ্রনাথ যে বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিতে উঠিয়াছিলেন সে কিসের জন্য? নিক্ষিপ্ত খাদ্যটুকরার অধিকাংশটা অপরের নিকট হইতে ছিনাইয়া লইয়া নিজের দখল বহাল রাখিবার জন্য নহে কি? বরং প্রভু যাহাতে আরও খাদ্যটুকরা টেবিলের নীচে নিক্ষেপ করেন তজ্জন্য দেশব্যাপী মহাহুলুস্থূল, ভারত সচিবের নিকট নিবেদন, টাউন হলে বিরাট আয়োজন— আর সর্ব্বশেষে কবিবরের উচ্চৈঃস্বরে বক্তৃতা।[১৮৬]

ভারত বিভাগ, সাম্প্রদায়িকতা, দ্বিজাতিতত্ত্ব প্রভৃতির জন্য আমরা নির্বিচারে জিন্নাহ ও তার মুসলিম লীগকে দায়ী করি। ইতিহাসের এই চিত্রগুলো কি প্রমাণ করে না রবীন্দ্রনাথের মতো মানুষও ভারতবর্ষে দ্বিজাতিতত্ত্ব উৎপাদনের জন্য কম পরিশ্রম করেন নি?

নিত্যপ্রিয় ঘোষ লিখেছেন :

> সংরক্ষণ একটি রাজনৈতিক পদ্ধতি, সেটা কার্যকর করা সম্ভব। ... যদি ধরেই নেওয়া যায় সংরক্ষণ কোনও সফল পদ্ধতি নয়, তাহলে আইন সভায়, রাজনৈতিক দলে নারীদের সংরক্ষণ নিয়ে এত উৎসাহ কেন? পক্ষান্তরে, সংরক্ষণ ব্যাপারে হিন্দুরা পদে পদে আপত্তি না তুললে ১৯০৯ থেকে ১৯৩৭ পর্যন্ত মুসলমানরা হয়ত হিন্দুদের বিশ্বাস করতে পারত। ১৯৩২ থেকে ১৯৩৭ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রবল বিরুদ্ধতা করেছিল বাঙালি হিন্দুরা এবং রবীন্দ্রনাথ সভাতে, বিবৃতিতে, বক্তৃতায় তাদের সমর্থন করেছিলেন। মুসলমান এবং শূদ্রদের সংখ্যাধিক্যে বর্ণ হিন্দুদের প্রভাব লোপ পাবে— এটাইতো আশঙ্কার কারণ? তার অর্থ, শূদ্রদের কথা আপাতত থাক, মুসলমানদের আমরা বিশ্বাস করিনি, সংখ্যাগুরু মুসলমানদের শাসনে হিন্দুদের স্বার্থ রক্ষা হবে না— এটাইতো কারণ? দ্বিজাতিতত্ত্ব কি শুধু আলিগড়ের সৈয়দ আহমদের, ঢাকার নবাবের বা জিন্নার? দ্বিজাতিতত্ত্বে বিশ্বাস কি সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারায় অবিশ্বাসী হিন্দুদের ছিল না?[১৮৭]

শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ একজন অখণ্ড ভারতপন্থী ছিলেন। এ ব্যাপারে কংগ্রেসের রাজনৈতিক চিন্তার সঙ্গে তার তেমন কোনো বিরোধ ছিল না। কংগ্রেস নেতা এম কে গান্ধীকে মহাত্মা খেতাব দিয়েছিলেন তিনি। গান্ধী ও জওয়াহেরলাল তাকে গুরুদেব বলে মান্য করতেন। রবীন্দ্রনাথ নেহরুর মেয়ে ইন্দিরার নাম দিয়েছিলেন প্রিয়দর্শিনী। রবীন্দ্রনাথ কস্মিনকালেও ভাষা

---

১৮৬. আবদুল মতিন সাহিত্যরত্ন বি.এ, রবীন্দ্রনাথ ও সাম্প্রদায়িকতা, মাসিক মোহাম্মদী, ৯ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা; ১৩৪৩, ভাদ্র।

১৮৭. নিত্যপ্রিয় ঘোষ, স্বতন্ত্র বটে, কিন্তু বিরুদ্ধ কি?, দেশ, কলকাতা, ১ মে ১৯৯৯।

ও সংস্কৃতি ভিত্তিক রাষ্ট্রের পক্ষপাতি ছিলেন না। এই কারণে তিনি বাঙালিদের জন্য নিজস্ব কোনো রাষ্ট্র বা ভাষা চান নি। অতএব যারা বাঙালি জাতীয়তাবাদের কথা বলেন তারা তাদের মতে, শ্রেষ্ঠ বাঙালি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো ভারতীয় জাতীয়তাবাদের কথাই বলেন। বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রবক্তরা রবীন্দ্রনাথকে যতই শ্রেষ্ঠ বাঙালির আসনে বসান না কেন রবীন্দ্রনাথ কিন্তু বাঙালি হওয়া ব্যাপারটাকে বড় কিছু মনে করতেন না।তিনি হিন্দু-মুসলমানের তফাৎটা কখনো অস্বীকার করেন নি। তিনি লিখেছেন :

> উল্টো আমাদের দেশে ভারতবর্ষীয়দের মধ্যে রাষ্ট্রীয় ঐক্যলাভের চেষ্টা যখনই প্রবল হইল, অর্থাৎ যখনই নিজের সত্তা সম্বন্ধে আমাদের বিশেষভাবে চেনার উদ্রেক হইল তখনই আমরা ইচ্ছা করিলাম বটে মুসলমানদিগকেও আমাদের সঙ্গে এক করিয়া লই, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য হইতে পারিলাম না। এক করিয়া লইতে পারিলে আমাদের সুবিধা হইতে পারিত বটে, কিন্তু সুবিধা হইলেই যে এক করা যায় তাহা নহে। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে একটি সত্য পার্থক্য আছে তাহা ফাঁকি দিয়া উড়াইয়া দিবার জো নাই। প্রয়োজন সাধনের আগ্রহবশত সেই পার্থক্যকে যদি আমরা না মানি তবে সেও আমাদের প্রয়োজনকে মানিবে না।[১৮৮]

তিনি ভালো করেই জানতেন মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলায় স্বরাজ স্বায়ত্তশাসন মানেই মুসলিম প্রাধান্য। এই ভয়ে বেদান্ত দর্শনের প্রবক্তা রবীন্দ্রনাথ সেদিন বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিসর্জন দিয়ে বৃহত্তর ভারতীয় জাতীয়তাবাদে মিশে যাওয়াকেই উত্তম মনে করেছিলেন।

যারা আমাদের গত পঞ্চাশ বছর ধরে বাঙালি জাতীয়তাবাদ আর ভাষা ও সংস্কৃতি ভিত্তিক রাষ্ট্রের মাহাত্ম্য শেখাচ্ছেন এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদের আইকন হিসেবে এখানে রবীন্দ্রনাথকে প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করছেন, তাদের রাজনৈতিক মতলবটা আসলে কী? রবীন্দ্রনাথের আদর্শ তো হচ্ছে হিন্দি রাষ্ট্রভাষা ভিত্তিক এক অখণ্ড ভারতীয় জাতীয়তাবাদ। তার আদর্শ অনুসরণ মানে হচ্ছে ওই জাতীয়তাবাদের অভ্যন্তরে আমাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের আত্মবিলোপ। জাতি-রাষ্ট্র হিসেবে এই তর্কটা আমাদের জন্য অত্যন্ত জরুরি যে রবীন্দ্রনাথের আদর্শের পথে আমরা হাঁটব কি না। রবীন্দ্রনাথ এদেশে এখন সাহিত্য সংস্কৃতির বিষয়ের চেয়ে ভারতীয় রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার বাহন হয়ে উঠেছেন মাত্র।

রবীন্দ্রনাথের লেখা ও সুর দেয়া গান আমাদের জাতীয় সঙ্গীত। কিন্তু তাই বলে রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের সব মানুষের মন-মননকে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছেন এ কথা বলা চলে না। এদেশে কিছু প্রগতিশীল দাবিদার মানুষ আছেন যারা সংস্কৃতির দিক দিয়ে বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের উত্তরাধিকারকে ত্যাগ করেছেন এবং কলকাতার উনিশ শতকীয় বাবু সংস্কৃতিকে একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাদের কথা অবশ্য আলাদা। তারা মনে করতেই

---

১৮৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়, পরিচয়', রবীন্দ্র রচনাবলী, নবম খণ্ড, কলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৪১০।

পারেন রবীন্দ্রনাথ ছাড়া বাঙালি হওয়া যায় না কিংবা তাকে ছাড়া আমাদের অস্তিত্ব অর্থহীন। কিন্তু বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষই হলেন রবীন্দ্র বলয়ের বাইরে। বাংলাদেশের বাঙলাভাষী মুসলমান আর ভারতের পশ্চিম বঙ্গের বাঙলাভাষী হিন্দুর মনোধারা কি একই খাতে প্রবাহমান? না। এর কারণ উভয়ের আধ্যাত্ম উত্তরাধিকার হচ্ছে ভিন্ন। হিন্দু সমাজে যেখানে জন্মেছেন রাজা রামমোহন রায় সেখানে মুসলমান সমাজে জন্মেছেন হাজি শরিয়তুল্লাহ।

ভাষা অবশ্যই একটি বিরাট সামাজিক বন্ধন। কিন্তু কেবল ভাষা দিয়েই সবক্ষেত্রে জাতিসত্তার ব্যাখ্যা পুরোপুরি হতে পারে না। অস্ট্রিয়ার লোক জার্মান ভাষায় কথা বললেও জার্মানির সঙ্গে একত্রিত হতে চায় নি। এর কারণ, অধিকাংশ অস্ট্রিয়ান হলো ক্যাথলিক খ্রিষ্টান। জার্মানরা প্রোটেস্ট্যান্ট। ধর্ম এখানে সৃষ্টি করেছে পৃথক থাকার ইচ্ছা। আজকের বাংলাদেশের উদ্ভবকে ব্যাখ্যা করতে হলে যেমন আসে ভাষার কথা, তেমনই আসে ধর্মের কথা। সাবেক পাকিস্তান ভেঙে পড়েছে বলেই আজকের বাংলাদেশ পশ্চিম বঙ্গের সঙ্গে একত্রিত হয়ে ভারতভুক্ত হয়ে যায় নি। কারণ ধর্মের তফাৎ। প্রতিটি জাতি ইতিহাসের ধারায় গড়ে ওঠা জনসমাজ ছাড়া অন্য কিছু নয়। ইতিহাসের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের ভেতর দিয়েই তৈরি হয় এর মানসিক সত্তা। অন্য কথায় জাতি মন। তাই এখন উঠেছে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের কথা।

পশ্চিমবঙ্গের মানুষ কিন্তু বাঙালি জাতীয়তাবাদ ত্যাগ করেছে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের স্বার্থে। তারা বাঙলা ত্যাগ করেছে হিন্দির স্বার্থে। মূল কলকাতায় অবাঙালির সংখ্যা বাঙলাভাষীর চেয়ে বেশি। সেখানে রবীন্দ্রনাথকে এখন অনেকেই চেনেন না। দিল্লির কর্তাব্যক্তিরা বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রসার চান ঢাকায়, কলকাতায় নয়। কেন? এর উত্তর হচ্ছে কলকাতার বাঙালি জাতীয়তাবাদ দিল্লির স্বার্থের জন্য বিপজ্জনক, ঢাকার বাঙালি জাতীয়তাবাদ দিল্লির স্বার্থানুকূল। পরিতাপের বিষয়, আমাদের এখানে যারা বাঙালি জাতীয়তাবাদের নিশান উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছেন তারা বোধ হয় এখনও এক ইউটোপিয়ার পেছনেই ছুটছেন। বাস্তব অর্থে এখানে বাঙালি জাতীয়তাবাদ, ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ছদ্মরূপ মাত্র। রবীন্দ্র মিথের আড়ালে চলছে ভারতীয় আধিপত্যবাদ প্রতিষ্ঠার নব নব কারসাজি। মানুষ হিসেবেই রবীন্দ্রনাথের সফলতা-ব্যর্থতা বিচার করা চাই। রবীন্দ্রনাথকে মিথ বা অবতার করে তুলবার কোনো প্রয়োজন দেখি না । তাকে অনাবশ্যকভাবে খাটো করে দেখবারও কোনো প্রয়োজন নেই। রবীন্দ্রনাথকে রবীন্দ্রনাথের মতোই দেখতে হবে।

বিখ্যাত রুশ সাহিত্যিক লেভ তলস্তয় পৈতৃক জমিদারি লাভের পর যে কাজটি করেছিলেন তা হলো তার জমিদারি থেকে ভূমিদাস প্রথার উচ্ছেদ। এর জন্য তাকে স্বীকার করতে হয়েছিল প্রচুর আর্থিক ক্ষতি। রবীন্দ্রনাথ তার পতিসরে জমিদারি লাভের পর যে কাজটি প্রথম করেছিলেন তা হলো তার প্রজাদের ওপর খাজনার হার বৃদ্ধি । রবীন্দ্রনাথ বাঙলা ভাষার অমর শিল্পী হলেও তলস্তয়ের সঙ্গে যখন তার তুলনা করি তখন তলস্তয়ের প্রতি আমাদের

শ্রদ্ধা জাগে বেশি। কারণ নিজের ক্ষতি স্বীকার করেও তলস্তয় তার আদর্শ ও কাজের মধ্যে সাযুজ্য রেখেছেন। রবীন্দ্রনাথ পারেন নি বা চান নি। যদিও তিনি লিখেছিলেন : 'ওই মহামানব আসে, মর্ত্যধূলির ঘাসে ঘাসে।' রবীন্দ্রনাথকে আমরা ইতিহাসের রবীন্দ্রনাথ হিসেবে পেতে চাই। কিংবদন্তির আড়ালে তাকে পূজা করতে চাই না।

দুই

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জাতীয়তাবাদ বলতে স্পষ্টতই হিন্দু জাতীয়তাবাদকে বুঝাতেন। এটি যেমন তিনি স্থূল রাজনীতির ভিতর দিয়ে প্রচার করেছেন তেমনি তিনি সাহিত্য, শিল্প ও নান্দনিকতার আকারেও আমাদের সামনে হাজির করেছেন। জাতীয়তাবাদের নান্দনিক প্রকাশভঙ্গীটি প্রায়শই দেশপ্রেম বলে একটি বিভ্রম তৈরি করে। দেশপ্রেম অবশ্যই, তবে তা হিন্দু জাতীয়তাবাদস্নাত দেশপ্রেম। ১৮৯৭ সালের ১৫ এপ্রিল মহারাষ্ট্রের বিখ্যাত হিন্দুত্ববাদী নেতা বালগঙ্গাধর তিলক শিবাজী উৎসব চালু করেন। হিন্দু জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করাই ছিল শিবাজী উৎসবের উদ্দেশ্য। মহারাষ্ট্রের অনুকরণে সখারাম গণেশ দেউস্করের প্রচেষ্টায় কলকাতায় শিবাজী উৎসব চালু হয়। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির প্রভাবশালী সদস্যরা এই উৎসব প্রচলনে এক বিরাট ভূমিকা পালন করেন। এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ভাগ্নী সরলা দেবীর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সখারাম দেউস্করের সাথে রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গতা ছিল সে কথা রবীন্দ্র গবেষক প্রশান্ত পাল আমাদের জানিয়েছেন :

- সাধনার যুগ থেকে সখারামের সাথে রবীন্দ্রনাথের যোগসূত্র গড়ে উঠেছিল, নানা উপলক্ষে তিনি আর্থিক সাহায্যও পেয়েছেন, ক্যাশ বহিতে তার উল্লেখ পাওয়া যায়।[১৮৯]

এতে এটাও প্রমাণিত হয় যে শিবাজী উৎসব বাংলাদেশে জনপ্রিয় করার জন্য রবীন্দ্র পরিবার টাকা-পয়সাও বিনিয়োগ করেছিল। এই মারাঠি সখারাম বাংলায় শিবাজী উৎসব চালুর প্রাক্কালে 'শিবাজী দীক্ষা' নামে একটি পুস্তিকা লেখেন যার ভূমিকা লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবিতায় লেখা এই ভূমিকাটির নাম 'শিবাজী উৎসব' । কবিতাটি ১৩১১-এর আশ্বিনে 'বঙ্গদর্শনে' ছাপা হয়েছে । হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের স্বার্থে রবীন্দ্রনাথ 'শিবাজী উৎসব' কবিতা কেন লিখতে গিয়েছিলেন? কারণ, শিবাজী মুসলমান মোঘল বাদশাহদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। তাই তাকে হিন্দু শৌর্যের প্রতীক হিসেবে হিন্দু জাতীয়তাবাদের পক্ষে দাঁড় করানোর প্রয়োজন হয়েছিল। শিবাজী উৎসব কবিতা রবীন্দ্রনাথ যখন লেখেন তখন তার বয়স তেতাল্লিশ। তখন তিনি পুরোপুরি বুঝদার। বুঝে শুনে সচেতনভাবেই রবীন্দ্রনাথ এ কবিতা

---

১৮৯. প্রশান্ত কুমার পাল, রবি জীবনী, পঞ্চম খণ্ড, (১৩০৮-১৩১৪)। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৯৯।

লিখেছিলেন। কবিতাটি তিনি তার কবিতা সংকলন 'সঞ্চয়িতায়' স্থান দিয়েছিলেন। সঞ্চয়িতাতে রাখবার যুক্তিটি ওই সংকলনের ভূমিকাতে রবীন্দ্রনাথের উক্তিতেই পাওয়া যায়— কবিতা যে লেখে কবিতাগুলির অন্তরের ইতিহাস তার কাছে সুস্পষ্ট। বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় রবীন্দ্রনাথের মনে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার চিন্তা ভালোমতো সক্রিয় ছিল। এ প্রসঙ্গে নেপাল মজুমদার লিখেছেন:

> ভারতের জাতীয় ঐক্য বৈদিক ধর্মের ভিত্তিতেই গড়িয়া উঠিবে এটাই কবির তৎকালীন ধারণা। এই এক ধর্মরাজ্যে যে মুসলমান ও ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায়ের গৌরববোধ করিবার কিংবা মিলিত হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই রবীন্দ্রনাথ সে কথা তখনও বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্রের যুগ হইতে যে হিন্দু জাতীয়তাবাদ আস্তে আস্তে আমাদের দেশে পরিপুষ্ট হইতেছিল, ক্রমশই তাহা উগ্রপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলনের উপর ভয়ানক প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ তখনও পর্যন্ত সে প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারেন নাই।[১৯০]

রবীন্দ্রনাথ শিবাজী উৎসব কবিতায় লিখেছিলেন :

ধ্বজা করি উড়াইব বৈরাগীর উত্তরী বসন—
দরিদ্র্যের বল।
'এক ধর্মরাজ্য হবে এ ভারত'
এ মহাবচন করিব সম্বল ॥
মারাঠির সাথে আজি, হে বাঙালি এক সঙ্গে চলো
মহোৎসবে সাজি।
আজি এক সভাতলে ভারতের পশ্চিম-পূরব
দক্ষিণে ও বামে
একত্রে করুক ভোগ এক সাথে একটি গৌরব
এক পূণ্য নামে।

বাংলা ভাষার কবি হয়েও রবীন্দ্রনাথ এখানে ভাষা ও অঞ্চলভিত্তিক কোনো বিভাজন মানেন নি। মারাঠির সাথে কোন বাঙালিকে এক কণ্ঠে 'জয়তু শিবাজী' বলে এক গৌরব ভোগ করার মহোৎসবে ডাক দিচ্ছেন কবি? বাংলাভাষী মুসলমানের পক্ষে কি এই মহোৎসবে শরিক হওয়া সম্ভব? জবাব নিষ্প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের এই চিন্তাভাবনাকে Pan Hinduism বা নিখিল হিন্দুত্ববাদ বললে অতিশয়োক্তি হয় কি?

---

[১৯০]. নেপাল মজুমদার, ভারতে জাতীয়তা, আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ, প্রথম খণ্ড, কলকাতা : দেজ পাবলিশিং, ১৯৯১।

শিবাজী উৎসবের প্রবর্তক বালগঙ্গাধর তিলকের সাথে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তিলকের লক্ষ ছিল হিন্দু স্বরাজ। এই লক্ষধারী রাজনীতিকের সাথে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে যুক্ত করেছিলেন একই মনোভাব ও চিন্তার কারণে অবশ্যই। রবীন্দ্রনাথ তার 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি' গ্রন্থে এর কিছুটা আভাষ দিয়েছেন :

- তখন লোকমান্য টিলক বেঁচে ছিলেন। তিনি তার কোনো দূতের যোগে আমাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দেবেন বলে পাঠিয়েছিলেন, আমাকে য়ুরোপ যেতে হবে। সে সময়ে নন-কো-অপারেশন আরম্ভ হয়নি বটে, কিন্তু পোলিটিক্যাল আন্দোলনের তুফান বইছে। আমি বললুম, 'রাষ্ট্রিক আন্দোলনের কাজে যোগ দিয়ে আমি য়ুরোপে যেতে পারবনা।' তিনি বলে পাঠালেন, আমি রাষ্ট্রিক চর্চায় থাকি, এ তার অভিপ্রায় বিরুদ্ধ ভারতবর্ষের যে বাণী আমি প্রচার করতে পারি, সেই বাণী বহন করাই আমার পক্ষে সত্য কাজ এবং সেই সত্য কাজের দ্বারাই আমি ভারতের সত্য সেবা করতে পারি। আমি জানতুম, জনসাধারণ টিলককে পোলিটিক্যাল নেতা রূপেই বরণ করেছিল এবং সেই কাজেই টাকা দিয়েছিল। এইজন্য আমি তাঁর পঞ্চাশ হাজার টাকা গ্রহণ করতে পারিনি। তারপরে বোম্বাই শহরে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। তিনি আমাকে পুনশ্চ বললেন, 'রাষ্ট্রনীতিক ব্যাপার থেকে নিজেকে পৃথক রাখলে তবেই আপনি নিজের কাজ সুতরাং দেশের কাজ করতে পারবেন; এর চেয়ে বড় আর কিছু আপনার কাছে প্রত্যাশাই করিনি আমি বুঝতে পারলুম, টিলক যে গীতার ভাষ্য করেছিলেন সে কাজের অধিকার তাঁর ছিল; সেই অধিকার মহৎ অধিকার।[১৯১]

উল্লেখ্য ব্রিটিশরা টিলককে কারারুদ্ধ করলে তার মামলা পরিচালনার জন্য রবীন্দ্রনাথ চাঁদা পর্যন্ত তুলেছিলেন।

একইভাবে হিন্দু মহাসভার নেতা পণ্ডিত মদন মোহন মালব্যের সাথে রবীন্দ্রের অন্তরঙ্গতা ছিল এবং তার সাথে নির্দ্বিধায় একাত্ম হয়ে সভা-সমিতি করেছেন। উৎকট সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান হিন্দু মহাসভার সাথেও রবীন্দ্রনাথের সম্পৃক্তি ছিল। ১৯২৩ সালে সাপ্তাহিক বিজলী পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি সাক্ষাতকার দিয়েছিলেন। এই সাক্ষাতকারটি নিয়েছিলেন সাংবাদিক মৃণাল কান্তি বসু। এটি কয়েক কিস্তিতে বিজলীতে প্রকাশিত হয়েছিল। সেই সাক্ষাতকারে রবীন্দ্রনাথ তার অবস্থানকে স্পষ্ট করে দিয়েছেন এমনিভাবে :

- হিন্দু মহাসভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় রবীন্দ্রনাথ বল্লেন, 'কেবলমাত্র রাজনৈতিক আন্দোলনের চেয়ে এই আন্দোলন তিনি অধিক প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন। হিন্দু যদি বাঁচতে চায়, যদি মানব সমাজে অধঃপতিত অবস্থায় চিরদিন থাকতে না চায়, তাহলে তাকে সঙ্ঘবদ্ধ হতেই হবে।'

---

[১৯১].রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি', রবীন্দ্র রচনাবলী। কলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৪১০।

- কবি বল্লেন যে, ‘মোপলা বিদ্রোহের অব্যবহিত পরেই তিনি মালাবার অঞ্চলে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি দেখে এসেছেন চব্বিশ লাখ হিন্দু মুসলমানের ভয়ে মারাত্মক রকমে অভিভূত। হিন্দু আজ এত দুর্বল। এমনি অসহায়ভাবে মুসলমানদের দয়ার উপর বেঁচে আছে।’
- তিনি বল্লেন যে, ‘হিন্দু মহাসভায় পণ্ডিত মালব্যজী মুসলমান গুণ্ডাদের হাত থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য হিন্দুদের শারীরিক শক্তি অর্জন করা আবশ্যক বলেছেন।’
- রবি বাবু বল্লেন যে, ‘গায়ের জোর, সাধারণভাবে বলতে গেলে সকলেরই থাকা উচিত এবং তা অর্জন করার চেষ্টা মানুষ মাত্রেরই করা উচিত। শুধু মুসলমানের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কেন, সর্বপ্রকার আততায়ীর বিরুদ্ধে লড়তে পারার শক্তি মানব মাত্রেরই থাকা উচিত। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে এই— শুধু গায়ে বল থাকলে বা তা অর্জনের চেষ্টা করলেই সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া যায় না, অর্থাৎ Organization গড়ে ওঠে না।’
- ‘পাঞ্জাবে বা যুক্ত প্রদেশে হিন্দুর গায়ের শক্তি মুসলমানের চেয়ে কম নয়। ওরাও ছাতু-টাতু খায়। কিন্তু হিন্দু পড়ে মার খায়, তার কারণ হিন্দুদের সংহতি নেই। ...’
- ‘গান্ধীজী ও মালব্যজীর ভুল এই হয়েছে যে, তাঁরা মনে করেন— উচ্চবর্ণের নিম্নবর্ণের সম্বন্ধে Untouchabililty অর্থাৎ Physical Untouchabiliy বা দৈহিক অস্পৃশ্যতা দোষ দূর করতে হবে। অর্থাৎ ডাল-পালা কিছুটা ছাঁটকাট কল্লেই সব ঠিক হয়ে যাবে— হিন্দুরা সঙ্ঘবদ্ধ বা Organised হতে পারবে।' কবি বল্লেন, ‘আমি তা মনে করিনে। হিন্দুদের দুর্বলতার কারণ আরো Fundamental বা মূলগত। হিন্দু সমাজ মানুষের সঙ্গে মানুষের ভেদ করে রেখেছে, যার কোনো যুক্তিযুক্ত কারণ দেওয়া যায় না।' কবি বল্লেন যে, ‘হিন্দু মহাসভা যদি হিন্দু সমাজের কীটস্বরূপ Physical ও Moral Untouchability দূর কত্তে পাত্তেন তা হলে মুসলমানরা চটে গেলেও কাজের মতো একটা কাজ হতো।[১৯২]

রবীন্দ্রনাথ যে কাজের মতো কাজ হবে বলে ইংগিত দিয়েছেন তা কিন্তু ফেলনা যায় নি। আজকে ভারতীয় হিন্দু সম্প্রদায় বর্ণ, ভাষা, অঞ্চল নির্বিশেষে একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক জাতি হিসেবে বিশ্বসভায় হাজির হয়েছে তাতে তাত্ত্বিক হিসেবে, চিন্তানায়ক হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান অবশ্যই অগ্রগণ্য । শিবাজী উৎসবের মতো বাংলাদেশে শুদ্ধি আন্দোলনও শুরু হয়েছিল জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির উদ্যোগে। এর মূল উদ্যোক্তা ছিল উৎকট সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান হিন্দু মহাসভা, রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘ প্রভৃতি। এদের দায়িত্ব আজ কাঁধে তুলে নিয়েছে বিজেপি। এদের উদ্দেশ্য ছিল তামাম ভারতবর্ষের মুসলমানদের

[১৯২]. সাপ্তাহিক বিজলী (কলকাতা), ৩১ আগস্ট ও ৭ সেপ্টেম্বর, ১৯২৩।

হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে আনা। অবাক করার বিষয় হলো 'মানুষের ধর্মের' কবি, 'সভ্যতার সংকটের কবি' রবীন্দ্রনাথও এ প্রতিষ্ঠানটির সাথে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিলেন। এটির নেতৃত্ব দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ আইসিএস সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রশান্তকুমার পাল তার রবি জীবনীতে ফেব্রুয়ারি ১৯১১, শুক্রবারের একটি গুরুত্বপূর্ণ খবর এভাবে উল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন পঞ্চাশ। প্রশান্ত পালের ভাষ্য উদ্ধার করছি :

- বাংলার মুসলমানদের বৃহদংশই ছিল ধর্মান্তরিত নিম্নশ্রেণীর হিন্দু। বর্ণ হিন্দুদের গোঁড়ামির আতিশয্যে এই তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা অমর্যাদাকর জীবনযাপনে বাধ্য ও শোষিত হচ্ছিল। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার মোকাবিলা করতে গিয়ে নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি পড়ল এই সমস্যার দিকে, ৩ ফেব্রুয়ারী (শুক্রবার ২০ মাঘ) বেঙ্গলীতে এ বিষয়ে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয় :
- A meeting will be held on Saturday next the 4th instant at 4:30 p.m. at the Overtoun hall, college street to discuss the condition of the depressed classes of Bengal and to concert measures for their amelioration.
- সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঐ মিটিং-এ সভাপতিত্ব করেন। ভূপেন্দ্রনাথ বসু, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, বিনয়েন্দ্রনাথ সেন প্রমুখ বক্তৃতা করেন । সত্যেন্দ্রনাথকে সভাপতি করে একটি কমিটি গঠিত হয়। তাতে ভূপেন্দ্রনাথ বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী ও ব্রজগোপাল নিয়োগী সহ-সভাপতি, হেমচন্দ্র সরকার সম্পাদক, উপেন্দ্রনাথ বল সহ-সম্পাদক, রবীন্দ্রনাথ, সারদাচরণ মিত্র, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, বি. দে. প্রভৃতি ১৩ জন সদস্য ছিলেন। এই কমিটির কৃতিত্ব খুবই সীমাবদ্ধ কিন্তু ত্রিশের দশকে ভারতীয় রাজনীতিতে যে সমস্যা অত্যন্ত গুরুত্ব লাভ করেছিল সে বিষয়ে প্রাথমিক সচেতনতার নিদর্শন হিসেবে এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে।[১৯৩]

নিখিল ভারত কংগ্রেসের সাথেও রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ ছিল। দলটির প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই তিনি এর সাথে যুক্ত হয়েছিলেন। ঠাকুর পরিবারের সদস্যরাও এর সাথে জড়িত ছিলেন। কংগ্রেসের সাথে রবীন্দ্রনাথের এই সম্পর্ক কখনোই ক্ষুণ্ন হয় নি । শেষ পর্যন্ত সক্রিয় রাজনীতিতে তিনি অংশ নেন নি সত্য, কিন্তু কংগ্রেসের সাথে তার সম্পর্কের ধরণ ছিল অনেকটা ভাবগত ও মননগত । কংগ্রেসের তাবড় তাবড় নেতারা, যেমন— মহাত্মা গান্ধী ও জওয়াহেরলাল জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সাথে বহু শলাপরামর্শ করেছেন। এরা বহুবার শান্তি নিকেতনে এসে রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন এবং তাকে রীতিমতো 'গুরুদেব' হিসেবেই জানতেন। উল্লেখ্য, রবীন্দ্রনাথ কখনো মওলানা মোহাম্মদ

১৯৩. প্রশান্ত কুমার পাল, রবি জীবনী, ষষ্ঠ খণ্ড ।

আলী ও কায়েদে আযম জিন্নাহর মতো সর্বভারতীয় মুসলিম নেতাদের শান্তি নিকেতনে দাওয়াত দেন নি বা তাদের সাথে ভারতের সাম্প্রদায়িক সমস্যা নিয়ে কখনো আলোচনা করেন নি।

রবীন্দ্রনাথ ১৮৯৬ সালের ২৬ ডিসেম্বর মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে স্বরচিত গান গেয়েছিলেন। স্বদেশী সংগীত বলে কথিত সেই গান ছিল আসলে বাংলার মাতৃমূর্তির প্রশংসা সম্বলিত পৌত্তলিকতাশ্রয়ী গান— আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে/ এবার তোরা মা বলিয়ে ডাক, ইত্যাদি । দেশকে মা বলে পূজা করার যে রীতি বঙ্কিমচন্দ্র চালু করেছিলেন এবং বন্দে মাতরম সঙ্গীতের ভিতর দিয়ে ভারতীয় হিন্দু মনকে একেবারে নাড়িয়ে দিয়েছিলেন তার প্রভাব রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও পড়েছিল। রবীন্দ্রনাথই প্রথম বন্দে মাতরম গানে সুর দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সামনে গেয়েছিলেন। সেই সুরেই তিনি ১৮৯৬ সালে কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে গানটি গেয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেন। রবীন্দ্রনাথ যে বঙ্কিমচন্দ্রের সার্থক উত্তরাধিকারী ছিলেন তার প্রমাণ হচ্ছে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন চলাকালে তার স্বদেশ বিষয়ক সঙ্গীতমালা। বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে যেমন করে স্বদেশ হিন্দু দেবীর মূর্তির আকারে প্রকাশিত হয়েছিল এবং বঙ্কিম সেই দেশমাতৃকার বন্দনা করেছেন, রবীন্দ্রনাথের গানেও সেরকম মাতৃরূপে দেশবন্দনার রূপটি ভালোমতো দেখতে পাওয়া যায়। এটি হিন্দু ধর্মীয় ঐতিহ্যের অন্তর ফুঁড়ে উত্থিত হয়েছে। মুসলমানের কাছে অবশ্য এই মাতৃবন্দনার রূপটি স্রেফ পৌত্তলিকতার নামান্তর। বঙ্কিমচন্দ্রের এই বন্দে মাতরম সঙ্গীত ভারতবর্ষে বিস্তর রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক হানাহানির কারণ ঘটিয়েছে। এটা রবীন্দ্রনাথ জানতেন। তারপরেও বন্দে মাতরম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের তখনকার (১৯১৬) মতামত ছিল এরকম :

> আমাদের বন্দে মাতরম মন্ত্র বাংলাদেশের বন্দনার মন্ত্র নয়— এ হচ্ছে বিশ্বমাতার বন্দনা— সেই বন্দনার গান আজ যদি আমরা প্রথম উচ্চারণ করি তবে আগামী ভাবী যুগে একে একে সমস্ত দেশে এই মন্ত্র ধ্বনিত হয়ে উঠবে।[১৯৪]

জীবনসায়াহ্নে এসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই গানের সাম্প্রদায়িক চরিত্র সম্পর্কে কিছুটা সচেতন হন বলে মনে হয় এবং এটা যে বহুধর্মের দেশ ভারতের জাতীয় সংগীত হবার অনুপযুক্ত তা তিনি কিছুটা হলেও উপলব্ধি করার চেষ্টা করেন। এই কারণেই তিনি কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে গানটির পৌত্তলিকতাশ্রয়ী অংশটুকু ছেটে জাতীয় সংগীত করার পরামর্শ দেন। রবীন্দ্রনাথের ব্যবস্থায় মুসলমান নেতৃবৃন্দ জওয়াব দেন— যতই কাটছাট করা হোক না কেন, গানটি যে সাম্প্রদায়িক পটভূমিতে লেখা তা তো মিথ্যে নয়। আসলে তখন পানি অনেক গড়িয়ে গেছে। সেই পরামর্শ কাজে লাগে নি এবং ভারতবর্ষও তার ইতিহাসের আরোপিত অমোঘ নিয়তির দিকে ছুটতে শুরু করেছে।

---

১৯৪. উদ্ধৃত: জগদীশ ভট্টাচার্য, বন্দে মাতরম। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০৬।